আতিক

কালেক্টেড ফরেন স্টোরিজ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড | ডি. এইচ লরেন্স | এডগার অ্যালান পো | গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ | মার্ক টোয়েন | চিনুয়া আচেবে | জেমস্ জয়েস | জেমস আর্থার বাল্ডউইন | পিয়ের ভিট্টরিও তনদেল্লি | পাওলা ক্যাপ্রিওলো | ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা | মারিও বেনেদেত্তি | পিটার ক্যারি | এদুয়ার্দো গালিয়ানো | কিংসলে আমিস | এলিনর ক্যাটন | লি রুই | তাওফিক আল হাকিম | আলবার্তো মোরাভিয়া | হারুকি মুরাকামি |

কালেক্টেড ফরেন স্টোরিজ

BANGLA NEWS 24 .com

সূচিপত্র

দীর্ঘ বেদন | হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড | অনুবাদ: মহিউল ইসলাম মিঠু ১

এ্যারাবি | জেমস্ জয়েস | অনুবাদ: নূর-ই-ফাতিমা মোশাররফ জাহান ১২

বাজিমাৎ | ডি. এইচ্ লরেন্স | অনুবাদ: নূর-ই-ফাতিমা মোশাররফ জাহান ২১

সনির ব্লুজ | জেমস আর্থার বাল্ডউইন | অনুবাদ: সোহরাব সুমন ৪৪

লিও'র পৃথিবী | পিয়ের ভিট্টরিও তনদেল্লি | অনুবাদ : সোহরাব সুমন ৮৭

ব্যারন স্কারপিয়ার ডায়রি থেকে | পাওলা ক্যাপ্রিওলো | অনুবাদ : সোহরাব সুমন ৯৯

নীলকণ্ঠ পাখি | ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা | অনুবাদ: কল্যাণী রমা ১০৮

যে হৃদয় হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিল | এডগার অ্যালান পো | অনুবাদ : মনজুর শামস ১১৭

বিশ্বের সুদর্শনতম ডুবে মরা পুরুষ | গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ | অনুবাদ: মনজুর শামস ১২৫

ক্যালাভেরাসের বিখ্যাত লম্ফপটু ব্যাঙ | মার্ক টোয়েন | অনুবাদ: মনজুর শামস ১৩৩

স্বপ্নে দেখেছে সে কারাগারে বন্দি | মারিও বেনেদেত্তি | অনুবাদ : ফজল হাসান ১৪৩

সুখি হৃদয়ের গল্প | পিটার ক্যারি | অনুবাদ: ফজল হাসান ১৪৯

জুলিয়াস সিজার ও অন্যান্য | এদুয়ার্দো গালিয়ানো | অনুবাদ : ফজল হাসান ১৫৬

মেসনের জীবন | কিংসলে আমিস | অনুবাদ: ফজল হাসান ১৬৫

মৃতদের আবাসভূমি | এলিনর ক্যাটন | অনুবাদ: ফজল হাসান ১৭২

নকল বিয়ে | লি রুই | অনুবাদ: ফজল হাসান ১৮৩

অতিপ্রাকৃত | চিনুয়া আচেবে | অনুবাদ: ফজল হাসান ১৯৪

ভোটার | চিনুয়া আচেবে | অনুবাদ: বিদ্যুত খোশনবীশ ২০১

অলৌকিক মুক্তিপণ | তাওফিক আল হাকিম | | অনুবাদ: তাসনীম আলম ২১১

অলঙ্কার | আলবার্তো মোরাভিয়া | অনুবাদ: রায়হান রাইন ২১৮

আয়না | হারুকি মুরাকামি | অনুবাদ: ফারাহ্ মাহমুদ ২২৫

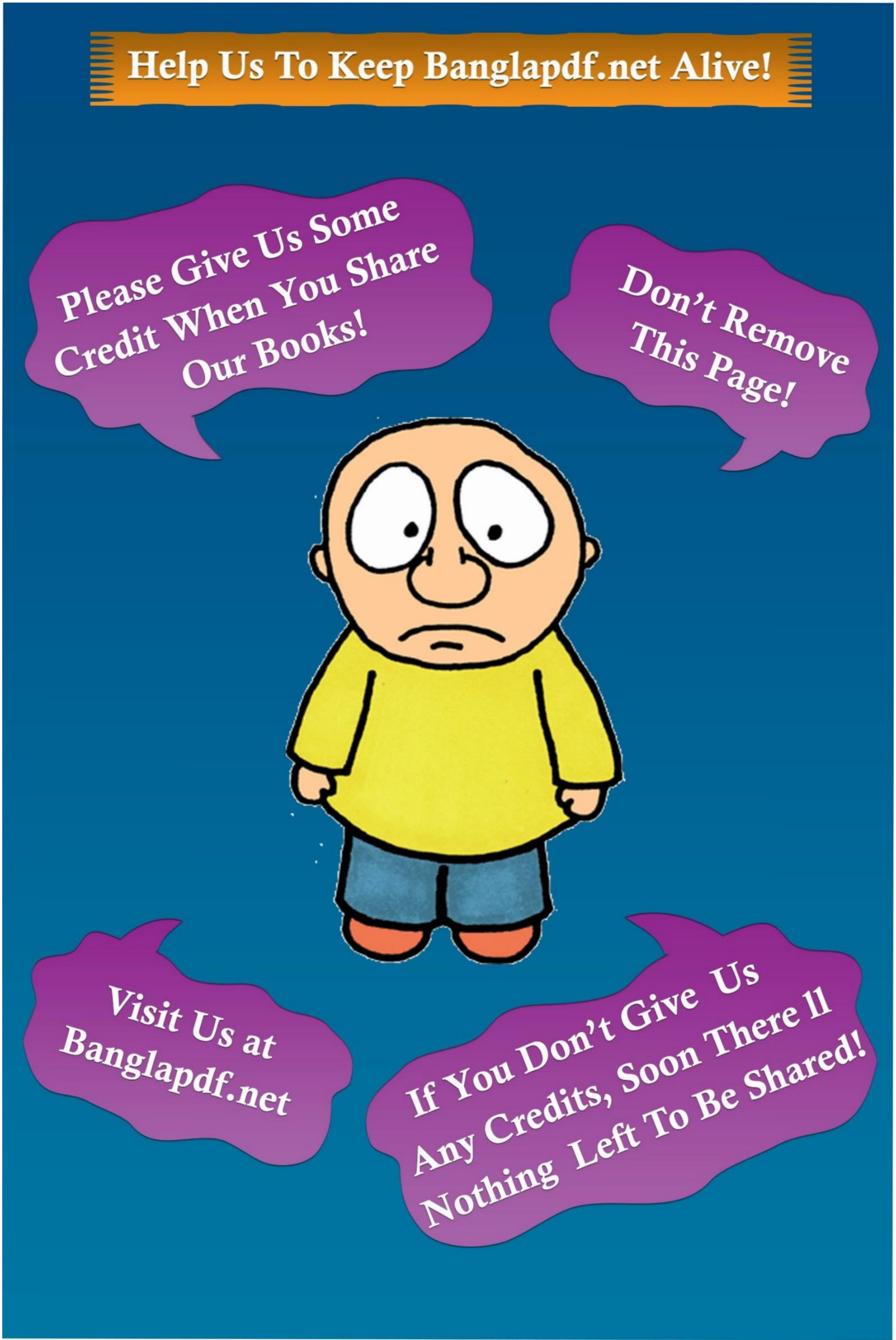
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

গল্পটা অ্যালান কোয়াটারমেইনের মুখ থেকে শোনা। দক্ষিণ আফ্রিকায় সবাই তাকে শিকারী কোয়াটারমেইন বলেই চেনে। গল্পটা শুনেছিলাম তার ইয়র্কশায়ারের বাড়িতে। সেখানে কয়েকদিন ছিলাম তার সাথে। এর কিছুদিন পরই তার একমাত্র ছেলেটা মারা গেল। আর তিনিও আবার আফ্রিকায় চলে গেলেন নতুন অভিযানে। সাথে ছিলেন পুরান দুই বন্ধু স্যার হেনরি কার্টিজ আর ক্যাপ্টেন গুড। আফ্রিকার অনাবিষ্কৃত কোন এক জায়গায় নাকি কোনও একজন সাদা মানুষ থাকে, তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। শেষ যে চিঠিটা তিনি পাঠিয়েছিলেন সেটা লেখা হয়েছিল তানার কোনও এক মিশন স্টেশন থেকে। জায়গাটা জাঞ্জিবারের তিনশ' কিলোমিটার উত্তরে। চিঠিতে লিখেছিলেন অনেক কষ্টের পর আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। তার বিশ্বাস অভিযান সফল হলে অসাধারণ কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলবেন তারা। যাই হোক এবার গল্পে ফেরা যাক।

সেটাই ছিল কোয়াটারমেইনের বাসায় আমার শেষ দিন। ডিনারের পর আমাকে আর ক্যাপ্টেন গুডকে গল্পটা শোনালেন। মাঝে দু'তিন গ্লাস পুরনো পর্তুগিজ মদও গিলেছেন। সেটা অবশ্য গুড আর আমাকে দ্বিতীয় বোতলটা শেষ করতে সাহায্য করার জন্যই। হয়ত মদের কারণেই গল্পটা শুনতে পেরেছিলাম আমরা। নইলে তার অভিযান, শিকার এসব নিয়ে কথা বলতে খুব একটা পছন্দ করেন না তিনি।

সামনে তাকের উপর রাখা একটা সিংহের খুলির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কোয়াটারমেইন বললেন, 'আহ! জাঁদরেল জানোয়ার! গত বারো বছর ধরে ভালোই ভোগাচ্ছ। মরার আগ পর্যন্ত আর থামবে বলে তো মনে হয় না।'

'তুমি কথা দিয়েছিলে ওই সিংহের গল্পটা বলবে। আজ বলেই ফেল।' বললেন গুড।

'আরে ওসব শুনতে চেও না। বিরাট কাহিনী।' উত্তর দিলেন কোয়াটারমেইন।

'আরে, অসুবিধা কী রাত তো এখনও অনেক বাকি। আর পর্তুগিজ বোতলটাও অনেকটা খালি।' আমি বললাম।

কাজ হলো। পাইপে তামাক ভরে নিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন।

যতদূর মনে পড়ছে ঘটনাটা '৬৯ এর মার্চে। সেকুয়াতির পর সিকুকুনি কেবল ক্ষমতায় এসেছে। আমি তখন ওখানেই ছিলাম। কানে আসলো বাপেডিরা আফ্রিকার গহীন থেকে অনেক হাতির দাঁত সঙ্গে এনেছে। তাই ওয়াগন ভর্তি করে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হাতির দাঁত কেনার জন্য। ওই এলাকার জন্য সময়টা মোটেই ভালো না, কারণ বছরের এসময়টায় বিশ্রী রকম জ্বর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমি ছাড়াও আরও দুয়েকজন আছে যাদের ওই আইভরিগুলো দরকার। তাই একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও বেরিয়ে পড়লাম।

যাই হোক কিছুদূর গিয়ে একটা ক্রাল পেলাম। প্রায় সন্ধ্যা। ভাবলাম ক্রালে কিছু দুধ আর ভুট্টা পাব। কাছে যেতেই দেখি, ক্রালটা অস্বাভাবিকরকম নীরব। কোনও সাড়া শব্দ নেই। কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে ক্রালটাতে মানুষ থাকে।

একটু আজব লাগলেও এগিয়ে গেলাম ক্রালের বড় ঘরটার দিকে। কাছে যেতেই দেখি ভেড়ার চামড়া দিয়ে কিছু একটা ঢাকা। চামড়াটা একটু তুলতেই চমকে উঠলাম। একটা কম বয়সী মহিলার লাশ। আর যাই হোক অন্তত এটা আশা করিনি। একবার ভাবলাম ফিরে যাই কিন্তু কৌতূহল আমাকে বড় ঘরটার দিকে টেনে নিয়ে গেল। লাশটা পার হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি ঘর পুরো অন্ধকার। পকেট থেকে ম্যাচটা বের করে জ্বালালাম। প্রথমে দেখলাম একটা পরিবার ঘুমিয়ে আছে। নারী, পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা মিলে পাঁচ জন। কিন্তু ম্যাচের কাঠিটা ভালো করে জ্বলতেই বুঝলাম, সবাই মৃত। হঠাৎ বিশ্রী একটা অনুভূতি আমাকে ঘিরে ধরল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সামনেই দেখি ঘরের এক কোণে এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ। আমি ভেবেছিলাম বনবিড়াল বা সেরকম কিছু। প্রায় সাথে সাথেই কেউ চিৎকার করে উঠল।

তাড়াতাড়ি আরেকটা দিয়াশলাই জ্বালাতেই দেখি, এক বুড়ি। পরে জানলাম আমাকে দেখে তার মনে হয়েছিল, আমি আজরাইল তার জান কবজ করতে এসেছি। সেজন্য ভয়ে চিৎকার দিয়েছে। কোলে তুলে বুড়িকে ওখান থেকে বের করে আনলাম। কারণ বের হওয়ার শক্তি বা ইচ্ছা বা দুটোর কোনওটাই তার ছিল না। বুড়ির হাড় জিরজিরে শরীর দেখে মনে হলো, কেউ শুধু হাড়ের উপর একটা চামড়া পরিয়ে দিয়েছে। ওয়াগনে এনে হালকা খাবার দিলাম। খেয়ে কথা বলতে শুরু করল বুড়ি। জানাল যে ক্রালের সবাই জ্বরে মারা গেছে। আর সবাই মারা যাওয়ার পর আশপাশের ক্রালের লোকজন তাদের গবাদি পশু নিয়ে গেছে।

বুড়িকে আমি কাছের আরেকটা ক্রালে নিয়ে গেলাম। আর ক্রালের প্রধানকে একটা কম্বল দিয়ে বুড়ির দেখাশোনা করতে বললাম। আর এও কথা দিলাম যে, ফিরে এসে যদি দেখি বুড়ি ভালো আছে তাহলে আরেকটা কম্বল দেব। ক্রালের প্রধান বেশ অবাক হয়ে বলল, 'এই অকর্মা বুড়ির জন্য আপনি অযথাই দুটো কম্বল নষ্ট করছেন।' তোমরা তো জানোই আদিবাসীদের বিশ্বাস কেমন। যার লড়াই করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা আছে সে বেঁচে থাকবে, আর যার নেই তার বাঁচার অধিকারও নেই।

বুড়ির হিল্লে করে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। এগারটা পর্যন্ত অনেক খারাপ রাস্তা পাড়ি দিলাম। তারপর থামলাম বিশ্রামের জন্য। ইচ্ছা ছিল ষাঁড়গুলোকে একটু চড়িয়ে আবার সন্ধ্যা নাগাদ রওনা হব। চাঁদের আলোয় আরামে এগোতে চাই আর কি। তো সেজন্যই রাখালটাকে দিয়ে ষাঁড়গুলো চরাতে পাঠালাম আর নিজে ঢুকলাম ওয়াগনে। একটু আরাম করতে গিয়ে ঘুমিয়েই পড়লাম। ভালো একটা ঘুমও হলো। আড়াইটায় ঘুম ভাঙল। উঠে খেয়ে নিলাম। খাওয়া হলে ড্রাইভার টম বাসনপত্র ধুতে নিয়ে গেল। তখনই দেখি হারামজাদা রাখাল একটা একটা ষাঁড় নিয়ে ফিরছে।

'বাকি ষাঁড়গুলো কই?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'বুঝতে পারছি না, মাকুমাজন(স্থানীয়রা আমাকে মাকুমাজন বলে ডাকে)। আমি শুধু একবার এক মিনিটের জন্য ওগুলোকে চোখের আড়াল করেছিলাম। তারপর দেখি এই এটা ছাড়া আর একটা ষাঁড়ও নেই।' ভয়ে ভয়ে বলল সে।

'মিথ্যুক কোথাকার, মিথ্যা বলার আর জায়গা পাস না, তুই ওগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলি আর এ সুযোগে ওগুলো পালিয়েছে, তাই না?' আমার মেজাজ সত্যিই অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল কারণ ওই জ্বরের এলাকায় এসময় আটকে পড়ার কোনও ইচ্ছে ছিল না, 'এখনই যা নিয়ে আয় ওগুলোকে। আর টম, তুমিও ওর সাথে যাও। ষাঁড়গুলো মনে হয় মিডেলবার্গের দিকেই গেছে। আমি এখানেই আছি। ষাঁড়গুলো না নিয়ে ফিরবে না, মনে থাকে যেন।'

টম ছেলেটার পাছায় কষে একটা লাথি মারল, অবশ্য লাথি খাওয়ার মতোই কাজ করেছে সে। তারপর ফিরিয়ে আনা ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে এসেগাই হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমিও যেতাম কিন্তু ওয়াগনের কাছে কাউকে না কাউকে তো থাকতেই হবে। একা একা বিরক্ত লাগছিল তাই রাইফেলটা হাতে নিলাম আশেপাশে কিছু শিকার পাওয়া যায় কিনা এই ভেবে। তারপর দুই ঘন্টা ঘোরাঘুরি করেও শিকার করার মতো কোনও প্রাণী চোখে পড়ল না। তারপর ওয়াগনের কাছে আসতেই ওয়াগন থেকে ষাট-সত্তুর গজ দূরে একটা ইম্পালা দেখলাম। আরামসে ওটাকে শিকারও করলাম। তারপর ওটার একটা গতি করতে করতেই সূর্য ডুবে চাঁদ উঠে গেল। সে রাতে চাঁদটা মনে হয় একটু বেশিই সুন্দর ছিল। কিন্তু অসম্ভব নীরব রাত। চারদিকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। একেবারে প্রাণীশূন্য এলাকা, পাখির ডাকও নেই। এমনকি বাতাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় বেঁধে রাখা ষাঁড়টাকে ধন্যবাদ দিলাম এই ভেবে যে, আমি ছাড়াও এ তল্লাটে আরেকটা জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব আছে।

কিছুক্ষণ পর খেয়াল করলাম ষাঁড়টা যেন একটু অস্থির অস্থির। আমি খুব একটা আমল না দিয়ে ওয়াগনে ঢুকলাম।

ভুলটা ভাঙতে বেশি সময় লাগল না। একটা গর্জন শুনলাম। তারপর মুহূর্তেই একটা কিছু লাফিয়ে গেল ষাঁড়টার দিকে। বুঝে ফেললাম কী হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পর ষাঁড়টার গলার ঘরঘর আওয়াজ আমার কানে এলো। রাইফেলটা ওয়াগনের ভেতরেই ছিল। গুলি ভরে কেবল লাফিয়ে ওয়াগন থেকে নেমেছি, সাথে সাথে পেছনে কারও অস্তিত্ব অনুভব করে পাথর হয়ে গেলাম। বুঝলাম সিংহটা আমার পেছনেই। বলতে কোনও দ্বিধা নেই, সেদিন আমি সত্যিই বুঝেছিলাম ভয় কাকে বলে।

এরকম ভয় আমি আর কোনদিন পাইনি। জানের ভয়ে প্রথমে নড়লাম না। পরে দেখি আমি চাইলেও নড়তে পারছি না। সিংহটা শুঁকতে শুঁকতে আমার উরু পর্যন্ত উঠে এলো। ভাবলাম এবার মরণ কামড় বসাবে। কিন্তু তা না করে, মরা ষাঁড়টার কাছে ফিরে গেল। তখন ওটার পুরো দেহটা দেখতে পেলাম। ওইটা ছিল আমার দেখা সবচেয়ে বড় সিংহ। বড় সিংহ আমি অনেক দেখেছি কিন্তু ওইটা ছিল সেগুলোর চেয়েও অনেক বড়। কালো কেশরওয়ালা একটা পুরুষ। তোমরা ওর দাঁতগুলো দেখেই তো বুঝতে পারছো কত বড় ছিল প্রাণীটা। সিংহটা আমার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই ষাঁড়টার রক্ত চাটতে শুরু করল। তারপর এত জোরে গর্জন করে উঠল যে, বাড়িয়ে বলছি না, মনে হলো পুরো ওয়াগনটা কেঁপে উঠল। সাথে সাথে গর্জনের উত্তরে আরেকটা গর্জন শোনা গেল।

বুঝলাম ওর সঙ্গিনী।

প্রায় সাথে সাথেই ঘাসের বাইরে বের হয়ে এলো সিংহী। তার সাথে ম্যাস্টিফ কুকুর সাইজের দুটো বাচ্চা। সিংহী একবার আমার দিকে তাকাল তারপর বাচ্চাদের নিয়ে ষাঁড়টার দিকে মনোযোগ দিল।

তখন আমার থেকে মাত্র আট দশ ফুট দূরে চারটে সিংহ খাচ্ছে, গরগর করছে, শিকারের মাংস ছিঁড়ছে, কটর মটর শব্দে হাড় ভাঙছে। ভয়ে আমার অবস্থা কাহিল। একসময় বাচ্চাগুলোর খাওয়া শেষ হলো। তারা ছোটাছুটি শুরু করল। প্রথমে ওয়াগনের পেছনে গিয়ে ইম্পালাটার ছেলা দেহটা নিয়ে টানাটানি করল দুজন। ইম্পালার সাথে খেলা শেষ হলে চোখ পড়ল আমার দিকে। এসে আমাকে শুঁকতে শুরু করল। তারপর একটার কী যেন হলো, আমার পা চাটতে শুরু করল। প্যান্ট তুলে পায়ের চামড়া চাটতে শুরু করল। ওদের খরখরে জিহ্বা প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি খরখরে হচ্ছে বলে মনে হলো আমার। প্রমোদ গুনলাম। কখন যেন পায়ের চামড়া ছিলে যায়! আর রক্তের স্বাদ একবার পেলেই আর রক্ষা নাই। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলাম জীবনের সব পাপের জন্য। ছোটবেলার ভালো ভালো স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

তখনই মানুষের শব্দ শুনলাম। টম আর ছেলেটা ষাঁড়গুলো নিয়ে ফিরে এসেছে। ওদের আসার ব্যাপারটা সিংহগুলোও বুঝে ফেলেছে। কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে মানুষের আওয়াজ শুনে ওরা নিঃশব্দে আবার ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে গেল।

সে রাতে সিংহগুলো আর ফিরল না। সকাল হতে হতে আমার নার্ভ স্বাভাবিক হয়ে এলো। সাথে মেজাজও খারাপ হলো। তাছাড়া সিংহগুলো যে ষাঁড়টাকে মেরেছে সে ষাঁড়টা আমার খুব পছন্দের ছিল। তাই সব মিলে আমার মধ্যে প্রতিশোধের নেশা চেপে বসল। ঠিক করলাম পুরো সিংহ পরিবারটাকে, বেঁধে রাখা জন্তু শিকার করার উচিত শিক্ষা দেব। তুলে নিলাম একটা নাম্বার ১২ স্নুখবোর, ওটা আমার প্রথম ব্রিচলোডারগুলোর মধ্যে একটা। সিংহ শিকারের জন্য রাইফেলটা আমার বিশেষ পছন্দের। সাথে নিলাম টমকে। টম অবশ্য আমার এ সিদ্ধান্তে খুব একটা খুশি হলো না।

প্রথমে সিংহগুলোর দিনের বেলায় শুয়ে থাকার জায়গাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। ওয়াগন থেকে একশ’ মিটার দূরে ছোট্ট একটা প্যানের (পানি শুকিয়ে তৈরি একরকম চারণভূমি, বর্ষায় পানিতে ডুবে থাকে) মতো জায়গা দেখলাম। যার পেছনের দিকটা বেশ খনিকটা উঁচু। ওটার মাঝে একটা মিমোসা গাছ পুরো জায়গাটা সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছে। আশেপাশে আরও অনেক ঝোঁপ জাতীয় গাছ ছিল, যেগুলোর নাম এখন আর মনে করতে পারছি না।

বুঝলাম যাদের খুঁজছি তাদের দিনাতিপাতের জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আশেপাশে নেই। টিলাটার মাঝমাঝি উঠতেই একটা ভিল্ডারবিস্টের মৃতদেহ পেলাম। যেটা তিন চারদিন আগে কোনও সিংহ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। বুঝলাম ঠিক জায়গাতেই এসেছি। আজ যদি সিংহগুলো এখানে নাও থাকে, তাহলেও তাদের নিয়মিত যাতায়াত আছে জায়গাটাতে। একটু পরে এও বুঝলাম যে, সিংহগুলো দিনের একটা বড় সময় ওই জায়গায় কাটায়। এখন ব্যাপার হলো ওগুলোকে খুঁজে বের করব কিভাবে। ওগুলোকে খুঁজতে ওদের আস্তানায় যাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা। চারপাশে সুন্দর বাতাস বইছিল। বাতাসটা আমাকে একটা আইডিয়া দিল। ভাবলাম ঘাসে আগুন দিলে কাজ হবে। আমাকে আর রাস্তা বয়ে ওদের খুঁজতে হবে না, ওরা নিজেই বের হয়ে আসবে। আমার কথা মতো টম আগুন জ্বালানোর কাজ শুরু করল বাম দিক থেকে। আমি ডান দিক থেকে। অবশ্য প্রথম আগুন জ্বালাতে বেশ বেগ পেতে হলো। আধাঘন্টা চেষ্টা চরিত্র করে আগুন জ্বালাতে পারলাম আমরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। পেছনের দিকটা উঁচু হওয়ায় কোনও প্রাণী ওদিকটা দিয়ে বের হতে পারবে না সহজে। বের হতে হলে আমাদের এপাশ দিয়েই বের হতে হবে। এবার শ্যুট করার জন্য ভালো একটা জায়গা খোঁজার পালা। আমি শ্যুট করার জন্য যে জায়গাটা নিয়েছিলাম, সেটা আগুনের বেশ খানিক সামনে খোলা জায়গায়। এমনিতে খোলা জায়গায় এভাবে দাঁড়ানো খুবই রিস্কি। কিন্তু তখন আমার রাইফেলের হাত এত ভালো ছিল যে রিস্কটা নিয়ে খুব একটা বিচলিত হলাম না। ‘এবার আসল কাজ।’ নিজেকে বললাম আমি। তখনই ঝোঁপের মধ্যে হলুদ একটা কিছুর নড়াচড়া খেয়াল করলাম। কিন্তু যখন ওটা বেরিয়ে এলো তখন বুঝলাম যাদের জন্য অপেক্ষা তাদের কেউ নয় প্রাণীটা। একটা সুন্দর রিট বক।

যাই হোক, রিট বকটাকে যেতে দিলাম। প্ল্যানের পুরো জায়গাটার ওপর থেকে চোখ একবারের জন্যও সরালাম না। আগুন ততক্ষণে ফার্নেসের মতো জ্বলতে শুরু করেছে। আগুনের শিখা আকাশের দিকে প্রায় বিশ ফুট। কোনও কোনও ঝোঁপ তখনও সবুজ ছিল তাই ধোঁয়াও তৈরি হলো অনেক। আর বাতাস ধোঁয়া আমাদের দিকে নিয়ে এসে আমার দৃষ্টি পথে একটু বাধার সৃষ্টি করল। তাই শুয়ে পড়লাম। ঠিক সেই সময় একটা ভয়ার্ত গর্জন শুনতে পেলাম, তারপর আরেকটা, তারপর আবার আরেকটা। এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেল মিয়া ভায়েরা বাড়িতেই আছেন।

স্নায়ুতে উত্তেজনা অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পর সিংহ পরিবার বেরিয়ে আসতে শুরু করল। বের হয়েই আমাকে দেখতে পেল। কালো কেশরওয়ালা পুরুষটা এবার সামনে এগিয়ে আসলো। আমি আমার সমস্ত শিকারী জীবনে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর দেখিনি। একটা বিশাল পুরুষ সিংহের পেছনে তার পরিবার। আর তাদের পেছনে আগুনের লেলিহান শিখা যেন আকাশ ছুঁয়েছে। চারপাশ ধোঁয়া ধোঁয়া। কিন্তু এই বিপদেও সিংহের পরিবার বাঁচানোর সংকল্প সহজেই চোখে পড়ছে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম। কিন্তু ওদের না মারলে আমার মরণ নিশ্চিত। হয় শিকার করো নইলে শিকার হয়ে যাও। তাই শিকারের সিদ্ধান্ত থেকে সরতে পারলাম না। খুব সহজ নিশানা বানালাম পরিবারের প্রধানকে। নিশানা কালো কেশরওয়ালার হৃৎপিণ্ড বরাবর। আমি প্রস্তুত। ট্রিগার টানতেও শুরু করেছি। এমন সময় উড়ন্ত ছাই এসে পড়ল চোখে। গরম ছাই চোখে পড়ায় মনে হলো কেউ আমার চোখে গরম লাভা ঢেলে দিয়েছে। তারপর যখন চোখ খুললাম তখন শেষ সিংহের লেজটা আরেকটা ঝোঁপের জঙ্গলের আড়ালে ঢুকে গেল।

এরকম একটা শট মিস করে মেজাজ পুরাই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র আমি না। তাই পেছন পেছন আমিও গেলাম। টম যেতে নিষেধ করল। কিন্তু ওর নিষেধ শোনার মতো মন মানসিকতা তখন ছিল না। আমি যে খুব সাহসী তা বলব না (আমি আসলেই সাহসী নই), কিন্তু ততক্ষণে ওই সিংহগুলোকে মারার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। এখন হয় আমি ওগুলোকে মারব না হয় ওগুলো আমাকে মারবে। আমার জেদের ব্যাপারটা তো তুমি জানোই। টমের নিষেধ শুনে বললাম, 'তোমার যদি ভয় লাগে তাহলে যাওয়ার দরকার নেই, আমি একাই যাব।' আমার কথা শুনে টমও আমার পিছু পিছু আসতে শুরু করল। আর ফিসফিস করে বলল, হয় আমি পাগল হয়ে গেছি নইলে আমাকে জাদু করা হয়েছে।

আমরাও ঝোঁপের জঙ্গলটার কাছে পৌঁছলাম। ঝোঁপটা প্রায় একশ' গজ লম্বা আর ঘন। প্রতিটা ঝোঁপের পেছনেই সিংহ অনায়াসে থাকতে পারে। কিন্তু আমরা জানি না আমাদের সিংহ চারটা কোন কোন ঝোঁপের পেছনে আছে।

আমি বিভিন্নভাবে জঙ্গলের ভেতরে দেখার চেষ্টা করলাম। একসময় একটা ঝোঁপের পেছনে হলুদ কিছু নড়তে দেখলাম। সেই সময় আমার ঠিক অপজিটের আরেকটা ঝোঁপের পেছন থেকে একটা বাচ্চা বেরিয়ে এসে আবার প্যানের দিকে দৌড়াতে শুরু করল। ওটাকে গুলি করলাম। গুলি লাগল মেরুদণ্ডে। লেজের দু' ইঞ্চি উপরে। পরে টম এসেগাই দিয়ে ওটার ওটার ইহলীলা সাঙ্গ করল।

আমি সাথে সাথে রাইফেলের ব্রিচ খুললাম। আরেকটা কার্টিজ কেবল ঢোকাতে শুরু করেছি, সেই মুহূর্তে দেখি সিংহী বেরিয়ে আসলো। অবশ্যই বাচ্চার চিৎকার শুনে। সে আমার থেকে বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ধীরে পেছাতে শুরু করলাম। সিংহীও ধীর গতিতে দৌড়ে এগোতে শুরু করল। প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব কমছে। বিপদ আগে থেকেই ছিল কিন্তু সেই বিপদ তখন আরও বড় আকার ধারণ করল

যখন দেখলাম আমার নতুন কার্টিজটা অর্ধেক ঢুকে আর ঢুকছে না। কার্টিজ কোম্পানির বাপ তুলে গালি দিয়ে ওই কার্টিজটা বের করতে চাইলাম। এবার দেখি কার্টিজটা বেরও হচ্ছে না। মাঝামাঝি অবস্থায় আটকে গেছে। উত্তেজনায় আর রাগে কার্টিজের গায়ে এত জোরে বাড়ি মারলাম যে হাতই কেটে গেল। রক্ত দিয়ে রাইফেল মাখামাখি।"

এই বলে কোয়াটারমেইন তার হাতে শুকিয়ে যাওয়া কয়েকটা ক্ষত চিহ্ন দেখাল। আবার বলতে শুরু করল।

"এতজোরে মারার পর ভেবেছিলাম কার্টিজ খুলে গেছে কিন্তু টানাটানি করে দেখলাম খোলে নি। একসময় সিংহী আক্রমণের জন্য রেডি হলো। আমি প্রার্থনা করতে শুরু করেছি। সেই সময় পেছন থেকে টম চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলল, 'আপনি ওর বাচ্চার দিকে যাচ্ছেন। ডানে সরে যান।'

আমার মাথা তখনও পরিষ্কার ছিল, তাই সিংহীর ওপর চোখ রেখে ডানে ঘুরে পেছাতে থাকলাম।

আমাকে বাচ্চার থেকে সরে আসতে দেখে সিংহী আবার ঝোঁপের দিকে ফিরে গেল।

'ইনকুসি, অনেক হয়েছে, এবার চলুন ওয়াগনে ফিরে যাই।' টম বলল।

'যাব, টম। তবে তার আগে বাকি তিনটাকে মারব।' ততক্ষণে আমার গো চেপে বসেছে।

'তোমার যদি ভয় লাগে তাহলে ফিরে যেতে পারো, আবার গাছে উঠেও বসে থাকতে পারো।'

টম বুদ্ধিমানের মতো গাছে উঠতে শুরু করল। এখন আমার মনে হয়, ইশ! আমিও যদি সেদিন ওর মতো গাছে উঠে বসে থাকতাম!

তারপর চাকু বের করে, গুঁতাগুঁতি করে কার্টিজটা বের করতে পারলাম। সাধারণ কার্টিজের চেয়ে একটা কাগজের সমান পুরুত্বের সমান বেশি পুরু কার্টিজটা আরেকটু হলে আমার জীবনটাই নিয়ে নিত! তারপর আরেকটা কার্টিজ ভরে নিলাম রাইফেলে।

সিংহী আবার আরেকটা সবুজ ঝোঁপের পেছনে ঢুকে গেল দেখলাম। একটু এগিয়ে মনে হলো আর এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। একটা বড় সাইজের পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সিংহীর ঝোঁপের দিকে ছুঁড়ে

মারলাম। পাথরটা মনে হয় আরেকটা বাচ্চার গায়ে লাগল। বাচ্চাটা লাফিয়ে বের হলো। খুব সহজেই আমার সহজ নিশানায় পরিণত হলো। এক গুলিতেই কাজ হলো।

প্রায় সাথে সাথেই সিংহী লাফিয়ে বের হয়ে বিদ্যুৎ বেগে আমার দিকে দৌড়াতে শুরু করল। আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা বুলেট হানতে পারলাম ওর পাঁজরে। গুলি খাওয়া খরগোশের মতো তিন চারবার পল্টি খেল ওটা। তারপর আবার উঠে চরম আক্রোশে সর্বশক্তি দিয়ে এগোতে শুরু করল আমার দিকে। এমন আক্রোশ যে আত্মা কেঁপে উঠল আমার। আমি ওর বুকে আরেকটা গুলি করতেই পড়ে গেল ও। চিরদিনের মতো নিঃস্তব্ধ।

নিজের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে আমি আবার রাইফেল রিলোড করলাম এবং কালোকেশরকে খুঁজতে শুরু করলাম। খুব সাবধানে ঝোঁপের জঙ্গলটার ভেতর ঢুকলাম। ধীরে ধীরে একটার পর একটা ঝোঁপ দেখে খুব সাবধানে এগোচ্ছিলাম। একসময় হঠাৎ মনে হলো একটু দূরে লম্বা টাম্বউকি ঘাসে একটু নড়াচড়া দেখলাম। যদিও নড়াচড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না তবুও ওদিকে গেলাম। কিন্তু দেখা পেলাম না পশুটার।

দেখতে দেখতে ঝোঁপের জঙ্গলটার শেষ মাথায় পৌঁছে গেলাম। ওই জায়গা থেকে সোজাসুজি একটা পাথরে দেয়াল উঠে গেছে পুরো পঞ্চাশ ফুট। সিংহের পক্ষে এ দেয়াল বেয়ে ওঠা সম্ভব না। তারমানে আমি হয় সিংহটাকে কোথাও মিস করেছি অথবা ওটা পালিয়ে গেছে আমার অজান্তে। আর সিংহ যেহেতু বিপদে না পড়লে বা আঘাত না পেলে আক্রমণ করে না। আর সিংহটা তখন ক্ষুধার্তও ছিল না, তাই ওর তরফ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করলাম না। আর ততক্ষণে প্রায় একঘন্টা হয়ে গেছে সিংহগুলোর পিছে পিছে ঘুরছি। বেশ ক্লান্ত। আর একবারে তিনটা সিংহ শিকার করা, শিকারের অভিজ্ঞতা হিসেবে মন্দ নয়। তাই ভাবলাম যে তিনটা মেরেছি সেগুলোর ছাল ছিলে নিয়েই ফিরে যাই। এসব ভাবতে ভাবতেই আমার চোখ ঝট করে ঘুরে গেল একটা পাথরের দিকে, আমার চোখ খুব সেনসিটিভ, কিন্তু সেখানেও কিছু দেখলাম না।

তারপর হঠাৎ দেখি আমার ঠিক অপজিটে একটা পাথরের বোল্ডারের উপর দাঁড়িয়ে আছে বিরাট সুন্দর প্রাণীটা। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই, এমনকি রাইফেলটা তোলারও সময় পেলাম না, সিংহ লাফ দিল। সরাসরি আমার দিকে।

সে যে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। আমার কাছে সিংহের লাফ দেয়া শরীরটাকে মূর্তিমান আজরাইল বলে মনে হলো। ও যখন লাফের সর্বোচ্চ উচ্চতায় তখন আমি ভয়ে

গুলি চালিয়ে দিলাম কোনও নিশানা ছাড়াই। আমি এত চমকে গিয়েছিলাম যে নিশানা করার চিন্তা মাথাতেই আসেনি। মনে হলো গুলি গিয়ে বিঁধল মেরুদণ্ডে। শব্দ শুনে মনে হয়েছিল, এই আর কি। এরমধ্যেই আমি প্রকৃতিগতভাবে এক দু' পা পিছিয়ে গেছি। আর একটা ঝোঁপে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। সিংহ লাফিয়ে পড়ল আমার পায়ের সামনে। পড়েই কামড়ে ধরল উরু। আমি পায়ের হাড়ে ওর দাঁত ঘষা খাওয়ার শব্দ শুনলাম। তারপর হঠাৎ ওর কামড় ঢিলা হলো। আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই আকাশের দিকে মুখ করে অসম্ভব জোরে গর্জন করে উঠল। দুনিয়াটা কেঁপে উঠল। সাথেসাথেই আমার শরীরের সব শ্বাস বের করে দিতেই যেন ওর বিশাল মাথাটা পড়ল আমার গায়ে। মারা গেছে বিশাল সুন্দর জানোয়ারটা। বুলেট বুক দিয়ে ঢুকে মেরুদণ্ডে অর্ধেক ঢুকে আটকে ছিল।

ব্যথার জন্যই হয়ত ওই বিরাট শরীর গায়ের ওপর পড়ার পরও অজ্ঞান হলাম না। অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে সিংহের শরীরের নিচে আবিষ্কার করলাম। বুঝলাম ওই বিরাট দাঁত আমার পায়ের হাড় শেষ পর্যন্ত ভাঙেনি ঠিকই কিন্তু এভাবে রক্ত বের হতে থাকলে মরতে বেশি সময় লাগবে না। পরে টমের সাহায্যে সিংহের নিচ থেকে বেরিয়ে রুমাল দিয়ে ক্ষতটা শক্ত করে বেঁধে নিলাম।

আমার সেই একরোখা জেদের কারণে আজ আমি প্রায় খোঁড়া হয়ে গেছি। প্রায় মরতেও বসেছিলাম। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর জীবন বাঁচল ঠিকই কিন্তু প্রতি মার্চে ক্ষতের জায়গাটায় ভীষণ ব্যথা হয়। আর প্রতি তিন বছর পরপর জায়গাটা ফেটে গিয়ে একহাতে একবারে পুরা সিংহ পরিবারকে খুন করার মজা টের পাইয়ে দেয়।

আর যে আইভরির জন্য গিয়েছিলাম সেটা পায় এক জার্মান। আর সেবার সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয়েছিল ৫০০ পাউন্ড। এদিকে আমি একমাস বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি আর ছয়মাসের জন্য সম্পূর্ন পঙ্গু ছিলাম। তো কাহিনী তো শুনলে। এবার চল, ঘুমিয়ে পড়ি। শুভ রাত্রি।

লেখক পরিচিতি : হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড একজন বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ১৮৫৬ সালে জন্ম নেয়া এই লেখক ইতিহাসআশ্রিত এমনসব অঞ্চল নিয়ে লিখেছেন যেগুলো ইংরেজদের কাছেও ছিল অনেকটাই অপরিচিত। তার উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে—কিং সলোমনস মাইনস, অ্যালান কোয়াটারমেইন, পিপল অভ দ্য মিস্ট ইত্যাদি।

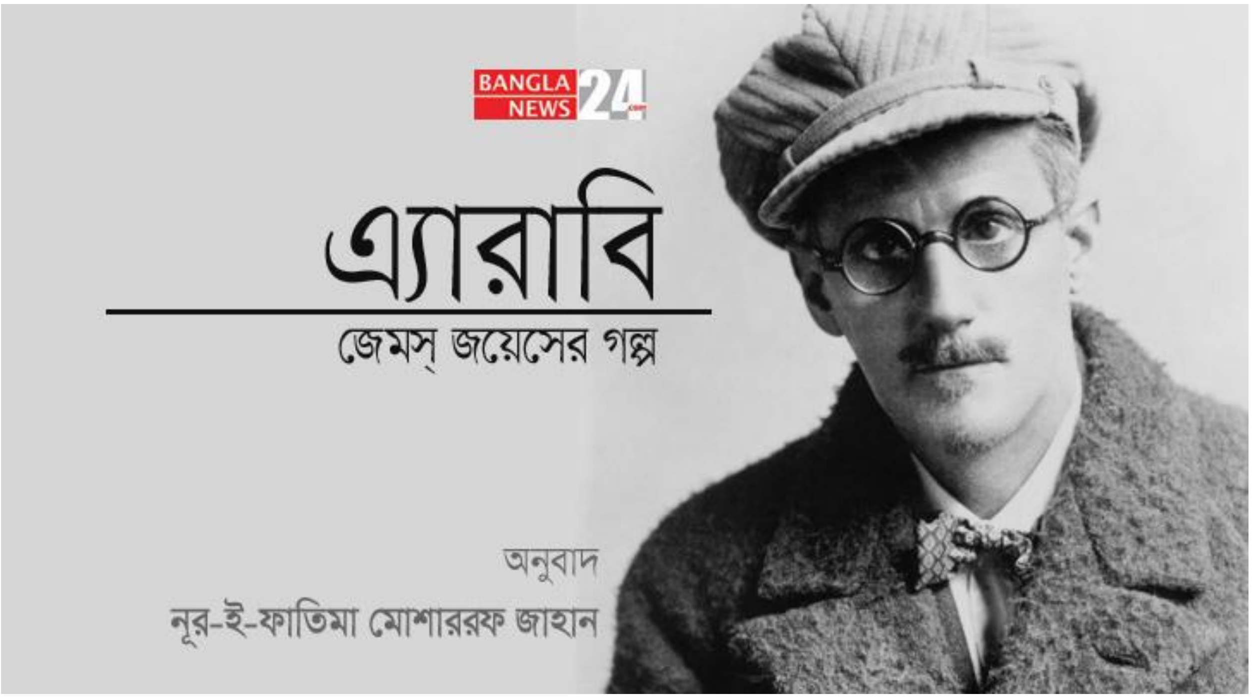

নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট কানাগলি হওয়ায় ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্স স্কুলের ছেলেদের ছুটির সময় ব্যতীত সারাক্ষণ নীরব থাকত। কানাগলির শেষ মাথায় একটি চৌকো জমির ওপর একটি জনশূন্য দোতলা বাড়ি প্রতিবেশিদের থেকে আলাদাভাবে অবস্থিত ছিল। গলির অন্য বাড়িগুলো তাদের ভেতরকার ভদ্র জীবনধারার ব্যাপারে সচেতন হয়ে একে অপরের প্রতি ধূসরনেত্রে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকত।

আমাদের বাড়ির প্রাক্তন ভাড়াটিয়া ছিলেন একজন পাদ্রী, যিনি পেছনের বসার ঘরে মারা গিয়েছিলেন। অনেকদিন বন্ধ থাকায় সবগুলো ঘরে স্যাঁতস্যাঁতে ছাতা পড়া দুর্গন্ধ আর রান্নাঘরের পেছনের জরাজীর্ণ ঘরটিতে ছিল পুরনো অদরকারি কাগজের আবর্জনা। এসবের মধ্যেই কিছু কোঁচকানো, ছাতাপড়া, মলাট করা বইয়ের খোঁজ পেয়েছিলাম—তার মধ্যে ছিল ওয়াল্টার স্কটের 'দি এ্যাবট', 'দ্য ডিভাউট কমিউনিক্যান্ট' ও 'দ্য মেমোয়ের্স অব ভিডক'। এর মধ্যে শেষের বইটি আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল এর হলদেটে পাতাগুলোর জন্য। বাড়ির পেছনে অযত্নে বেড়ে ওঠা বাগানের একদম মাঝখানে ছিল একটি আপেল গাছ আর এদিক সেদিক গজিয়ে ওঠা কিছু ঝোঁপঝাড় যার নিচে আমি মৃত ভাড়াটিয়ার জং ধরা সাইকেলের পাম্পটি পেয়েছিলাম। পাদ্রী মশায় খুব দানশীল লোক ছিলেন। তিনি উইল করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর সমস্ত টাকাপয়সা আর নিজের বোনকে তাঁর আসবাবপত্র দিয়ে গিয়েছিলেন।

শীতকালে দিন যখন ছোট হয়ে এলো, তখন রাতের খাবারের পর্ব ভালোভাবে শেষ হওয়ার আগেই সন্ধ্যা নামত। আমরা যখন একসাথে খেলা করার জন্য পথে বেরিয়ে আসতাম, চারপাশের বাড়িগুলোতে ততক্ষণে আঁধার নেমে এসেছে। আমাদের মাথার উপরের খোলা আকাশে তখন নানারকম বেগুনি রংয়ের ছটা আর রাস্তার বাতিগুলো সেদিকে তাদের নিস্তেজ লন্ঠনগুলো তুলে ধরত। শীতের বাতাসে গায়ে কাঁটা দিত আর আমরা ঘেমে লাল হওয়ার আগ পর্যন্ত খেলা করতাম। আমাদের চিৎকার এই নীরব গলিটিতে প্রতিধ্বনিত হতো। এই খেলাধুলা আমাদের টেনে আনত বাড়ির পেছনের অন্ধকার আর কাদায় ভরা পথের মাঝে, যেখানে পথের দু'পাশের বদমেজাজী বাসিন্দাদের চোখ রাঙানি আর ধমক পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যেতাম অন্ধকার শিশিরভেজা বাগানের পেছনের দরজার দিকে যেখানে ছাইগাঁদা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াত, আর যেতাম দুর্গন্ধময় আস্তাবলের দিকে যেখানে কোচোয়ান ঘোড়ার পরিচর্যা করত কিংবা টুংটাং শব্দে ঘোড়ার লাগাম ও জিন পরিষ্কার করত। আমরা যখন গলিতে ফিরে আসতাম, তখন রান্নাঘরের জানালা দিয়ে আলো এসে চারদিক আলোকিত করত। আমার কাকাকে গলির মোড়ে দেখা গেলেই আমরা অন্ধকারে ছায়ায় লুকিয়ে থাকতাম তিনি নিরাপদে বাড়িতে ঢোকার আগ পর্যন্ত। আর যদি ম্যাক্সগানের বোন তাদের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে তার ভাইকে চা খেতে ডাকত, তাহলে আমরা আমাদের লুকানোর জায়গা থেকে বারবার উঁকি দিয়ে তাকে দেখতাম। সে দাঁড়িয়ে থাকে নাকি চলে যায় তা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করতাম। সে থেকে গেলে আমরা ছায়া থেকে বেড়িয়ে এসে ম্যাক্সগানদের দোরগোড়ায় গিয়ে বসে পড়তাম। সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করত। আধখোলা দরজার ফাঁক গলে আলো পড়ে তার দেহের আদলটি ফুটে উঠত। বোনের কথা শোনার আগে ভাইটি সবসময় তার সাথে একটু খুনসুঁটি করত, আর আমি রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তার শরীর নড়ে উঠলেই তার পোশাকটিও দুলে উঠত, আর তার নরম দড়ির মতো চুল একপাশ থেকে অন্যপাশে দুলতে থাকত।

শনিবারের সন্ধ্যাগুলোয় কাকিমা বাজার করতে গেলে কিছু কিছু জিনিসপত্র বয়ে আনার জন্য আমাকেই তাঁর সাথে যেতে হতো। ক্রমশ চওড়া হতে থাকা রাস্তার মাঝখান দিয়ে আমরা হেঁটে যেতাম মাতাল আর দরকষাকষিরতা মহিলাদের গায়ের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে আর রাস্তার দিনমজুরদের খিস্তি, কসাইয়ের দোকানের কর্মচারী ছোকরাদের বেসুরো হাঁকডাক, পথগায়কদের খোনা গলার গান (যার মূল বিষয় মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দশা) শুনতে শুনতে। এই শব্দগুলো একটিমাত্র রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়ে আমার হৃদয়ে এসে জমাট বাঁধত। কল্পনা করতাম যে, আমি একদল শত্রুর মাঝখান দিয়ে একটি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বয়ে নিয়ে চলেছি।

প্রতিদিন সকালে আমি সামনের বসার ঘরের মেঝেতে শুয়ে তার বাড়ির দরজার দিকে নজর রাখতাম। দরজার পর্দাটি তখন সযত্নে চৌকাঠের সাথে মিলিয়ে রাখতাম যাতে আমাকে দেখা না যায়। সে দোরগোড়ায় বেরিয়ে এলেই আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠত। আমি দৌড়ে হলঘরে গিয়ে বইপত্র বগলদাবা করতাম আর তারপর তাকে অনুসরণ করতাম। তার বাদামি দেহাবয়ব সারাক্ষণ আমার চোখে লেগে

থাকত আর যে জায়গায় এসে আমাদের দু'জনার পথ দু'দিকে ভাগ হয়ে যেত সেখানে এসে আমি দ্রুত পা চালিয়ে তাকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতাম। দিনের পর দিন সকালে এমনটি হতো। তার সাথে কখনো আমার কথা হয়নি, কেবলমাত্র কয়েকটি সাধারণ কথাবার্তা ছাড়া, তবুও তার নামটি আমার নির্বোধ রক্তকণিকায় সর্বদা যেন সমন জারি করত।

প্রেমের পক্ষে নেহাৎ বেরসিক জায়গায়ও তার কল্পনা আমার সঙ্গী হতো। শনিবারের সন্ধ্যাগুলোয় কাকিমা বাজার করতে গেলে কিছু কিছু জিনিসপত্র বয়ে আনার জন্য আমাকেই তাঁর সাথে যেতে হতো। ক্রমশ চওড়া হতে থাকা রাস্তার মাঝখান দিয়ে আমরা হেঁটে যেতাম মাতাল আর দরকষাকষিরতা মহিলাদের গায়ের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে আর রাস্তার দিনমজুরদের খিস্তি, কসাইয়ের দোকানের কর্মচারী ছোকরাদের বেসুরো হাঁকডাক, পথগায়কদের খোনা গলার গান (যার মূল বিষয় মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দশা) শুনতে শুনতে। এই শব্দগুলো একটিমাত্র রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়ে আমার হৃদয়ে এসে জমাট বাঁধত। কল্পনা করতাম যে, আমি একদল শত্রুর মাঝখান দিয়ে একটি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বয়ে নিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে প্রার্থনা আর স্তোত্রপাঠ করার সময় কেমন করে যে অদ্ভুতভাবে তার নামটি আমার মুখে উঠে আসত তা আমি নিজেও বুঝতে পারতাম না। প্রায়ই আমার চোখে জল আসত (জানি না কেন আসত) আর অনেকসময় আমার হৃদয় থেকে একটি প্লাবন যেন আমার বুকের মাঝে এসে সজোরে আছড়ে পড়ত। ভবিষ্যতের কথা তখন অল্পই ভাবতাম। কখনো তার সাথে কথা হবে কিনা জানতাম না, যদিও বা কখনো কথা হয় তখন কেমন করেই বা আমার এই বিহ্বল মুগ্ধতার কথা তাকে জানাব। কিন্তু আমার শরীর যেন এক বীণা যার প্রতিটি তারে ঝঙ্কার তুলত তার কথা আর ইশারা।

এক সন্ধ্যায় আমি পেছনের বসার ঘরে গেলাম যেখানে পাদ্রী মশায় দেহ রেখেছিলেন। সেই অন্ধকার বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় বাড়িতে কোনো সাড়াশব্দ ছিল না। জানালার একটি ভাঙা কাচের ফাঁক গলে শোনা যাচ্ছিল পৃথিবীর বুকে অবিরাম বর্ষণের ঝমঝম শব্দ। সুঁইয়ের মতো তীক্ষ্ণ বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ভেজা নরম মাটিকে যেন ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। দূরের কোনো জানালায় আবছা আলো দেখা যাচ্ছিল। এত কম দেখতে পেয়েই আমার মন তুষ্ট ছিল। আমার সমস্ত চেতনা যেন অবচেতন হতে ব্যাকুল। আমি যে দিশেহারা হওয়ার উপক্রম তা বুঝতে পেরে নিজের দু'হাতের তালু একসাথে মিলিয়ে চেপে ধরে রাখলাম যতক্ষণ না হাত কাঁপতে শুরু করল, আর বিড়বিড় করে বলতে থাকলাম, "হে প্রেম! হে প্রেম!"

অবশেষে তার সাথে আমার কথা হলো। সে যখন প্রথমবারের মতো আমাকে কিছু বলেছিল, আমি তখন এতটাই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম যে ভেবে পাইনি কী জবাব দেব। সে জানতে চাইল আমি

‘এ্যারাবি’তে যাব কিনা। উত্তরে ‘হ্যাঁ’ নাকি ‘না’ বলেছিলাম তাও মনে নেই। খুব নাকি জমকালো মেলা বসবে। সে বলেছিল যে তার যাবার খুব শখ।

“কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না কেন?” আমি জানতে চাইলাম। কথা বলার সময় সে তার হাতের রুপার বালাটি বারবার ঘুরিয়ে দেখছিল। সে বলেছিল তার যাওয়া হবে না কারণ তাকে তার কনভেন্টের স্কুলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যেতে হবে। তার ভাই আর অন্য দু’টি ছেলে নিজেদের খুনসুঁটি আর ইয়ার্কি নিয়ে ব্যস্ত। আমি তখন রেলিংয়ের একপাশে একা দাঁড়িয়ে। আর সে তখন তার মাথাটি আমার দিকে কিছুটা ঝুঁকিয়ে রেলিংয়ের একটি শিক ধরে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের বাড়ির দরজার উল্টোদিক থেকে বাতির আলো এসে তার ফর্সা ঘাড়ের বাঁকে পড়ায় তার ঘাড়ে পড়ে থাকা চুল আর রেলিংয়ে রাখা হাত যেন জ্বলজ্বল করছিল। তার লম্বা জামার একপাশে আলো পড়ে সেই আলো এসে জামার নিচের পেটিকোটের পাড়েও লাগছিল। সে সহজভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল বলেই তার পেটিকোটের পাড়টি দেখা যাচ্ছিল।

সে বলল, “তুমি গেলে ভালোই হবে।”

আমি বললাম, “যদি যাই তবে তোমার জন্য কিছু কিনে আনব।”

সেই সন্ধ্যার পরে কত অগণিত নির্বোধ ভাবনা যে আমার দিনের আরাম আর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল! আমার ইচ্ছে করত মেলার আগের সেই একঘেয়ে দিনগুলোকে একদম মুছে ফেলতে। স্কুলের কাজের চাপে যেন ক্ষয়ে যাচ্ছিলাম আমি। যখনই অনেক কষ্টে পড়ায় মন বসাতে চাইতাম তখনই তার কল্পনা দিনের বেলায় স্কুলঘরে আর রাতের বেলায় শোবার ঘরে আমার আর আমার বইয়ের পাতার মাঝখানে এসে দাঁড়াত। গভীর নীরবতার মাঝেও ‘এ্যারাবি’ কথাটির প্রতিটি শব্দ যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বকে এক অসীম আনন্দের মাঝে ডেকে নিয়ে প্রাচ্যের মোহজাল আমার ওপর বিস্তার করত। বাড়িতে শনিবারের মেলায় যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলাম। কাকিমা বেশ অবাক হলেন; ভাবলেন ভিন্নমতাবলম্বীদের মেলা না হলেই হয়। সেদিন ক্লাসের পড়া ঠিকমত বলতে পারি নি। দেখলাম যে মাস্টার মশায়ের মুখের কোমলভাব বদলে গিয়ে কঠিনভাব দেখা দিচ্ছে। আমাকে তিনি পড়ালেখায় ফাঁকি দেয়ার ব্যাপারে সাবধান করে দিলেন। কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারলাম না। আমার আর আমার স্বপ্নের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়ানো যতসব নিরস কাজকর্মের ওপর আমার বিরক্তি ধরে গেল। এসব কাজগুলোকে তখন নিছক ছেলেখেলা বলে মনে হতে লাগল—বিশ্রী আর একঘেয়ে সব ছেলেখেলা।

শনিবার সকালে কাকাকে আবারো মনে করিয়ে দিলাম যে সন্ধ্যায় মেলায় যেতে চাই। তিনি তখন হলঘরের দেরাজে টুপি ঝাড়ার বুরুশ খোঁজায় ব্যস্ত। তাই তাঁর চাঁছাছোলা জবাব এলো,

“হ্যাঁ রে বাপু, জানি।”

তিনি তখন হলঘরে থাকায় সামনের বসার ঘরে গিয়ে জানালার ধারে শুয়ে থাকতে পারলাম না। বাড়ির পরিবেশ সুবিধার মনে হলো না। আস্তে আস্তে স্কুলের দিকে পা বাড়ালাম। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস যেন গায়ে এসে বিঁধছিল আর এরই মধ্যে আমার মন একেবারেই দমে গিয়েছিল।

সন্ধ্যায় যখন খাবার খেতে বাড়িতে ঢুকলাম, কাকা তখনও ফেরেননি। হাতে তখনও সময় ছিল। বসে বসে কিছুক্ষণ দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলাম, আর যখন ঘড়ির টিকটিক শব্দে বিরক্তি ধরে গেল তখন ঘরটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় চলে গেলাম। উঁচু উঁচু ফাঁকা ঘরগুলো বেশ ঠাণ্ডা আর মলিন। এখানে এসে আমি যেন মুক্তির স্বাদ পেয়ে এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগলাম। নিচের রাস্তায় দেখলাম আমার খেলার সাথীরা খেলছে। তাদের চিৎকারের শব্দ আমার মনকে অস্থির আর দুর্বল করে দিল। জানালার শীতল কাচে কপাল ঠেকিয়ে আমি সেই আলোহীন বাড়িটির দিকে তাকালাম যেখানে সে থাকত। প্রায় ঘন্টাখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুই দেখতে পাইনি কেবল আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনায় তার ধূসর দেহাবয়বটি ছাড়া। সেই অবয়ব যার মরাল গ্রীবায়, রেলিংয়ে রাখা হাতে আর পেটিকোটের পাড়ে লন্ঠনের আলোর আলতো ছোঁয়াচ লেগেছিল।

অবশেষে তার সাথে আমার কথা হলো। সে যখন প্রথমবারের মতো আমাকে কিছু বলেছিল, আমি তখন এতটাই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে ছিলাম যে ভেবে পাইনি কী জবাব দেব। সে জানতে চাইল আমি ‘এ্যারাবি’তে যাব কিনা। উত্তরে ‘হ্যাঁ’ নাকি ‘না’ বলেছিলাম তাও মনে নেই। খুব নাকি জমকালো মেলা বসবে। সে বলেছিল যে তার যাবার খুব শখ।

“কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না কেন?” আমি জানতে চাইলাম। কথা বলার সময় সে তার হাতের রুপার বালাটি বারবার ঘুরিয়ে দেখছিল। সে বলেছিল তার যাওয়া হবে না কারণ তাকে তার কনভেন্টের স্কুলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যেতে হবে।

এরপর নিচে নেমে এসে দেখি মিসেস মার্সার বসার ঘরের উনুনের পাশে বসে আছেন। এই বাঁচাল বৃদ্ধা এক বন্ধকী মহাজনের বিধবা। মহিলা ধর্মীয় সাহায্যের চাঁদা তোলার নাম করে পুরানো ডাকটিকিট বিক্রি করে বেড়াতেন। বাধ্য হলাম চায়ের টেবিলের বাজে গাল-গল্প সহ্য করতে। রাতের খাবারের পর্ব আরো ঘন্টাখানেক পিছিয়ে গেল তবু কাকার দেখা নেই। মিসেস মার্সার এবার যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ক্ষমা চেয়ে বললেন যে তিনি আর বসে থাকতে পারছেন না। ঘড়ির কাঁটা তখন আটটা পেরিয়ে গেছে। তাছাড়া রাতের হিমেল হাওয়া তাঁর শরীরের জন্য ভালো নয় বলে তিনি রাত করে বাড়ির বাইরে থাকা পছন্দ করেন না। মহিলা চলে যাওয়ার পর রাগে গজগজ করতে করতে আমি ঘরময় পায়চারি করতে থাকলাম। কাকিমা বললেন,

"তুই বরং আজকের মতো মেলায় যাওয়ার চিন্তা বাদ দে।"

রাত নয়টায় শব্দ পেলাম কাকা হলঘরের দরজা খুলছেন। শুনতে পেলাম তিনি আপন মনে কথা বলছেন। তাঁর ওভারকোটের ভারে হলঘরের কোট রাখার আলনাটির দুলে ওঠার শব্দ হলো। কাকার খাওয়া প্রায় অর্ধেক হয়ে এলে তাঁর কাছে মেলায় যাওয়ার টাকা চাইলাম। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি বললেন,

"মেলার লোকেরা সব এখন ঘুমিয়ে পড়েছে আর এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাদের এক ঘুম হয়েও গেছে।"

শুনে আমার মোটেও হাসি পেল না। কাকিমা বেশ উদ্যমের সাথে বললেন,

"টাকাটা দিয়ে ওকে যেতে দিচ্ছো না কেন? এমনিতেই ওর অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছো।"

কাকা বললেন যে তিনি ভুলে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। এবং আরো বললেন যে তিনি এই প্রবাদটি বিশ্বাস করেন—

"খেলা ছেড়ে শুধুই পড়া,

ছেলের মাথায় গোবর পোড়া।"

তিনি জানতে চাইলেন আমি কোথায় যাচ্ছি। আর তাঁকে সেটি দ্বিতীয়বারের মতো বলার পর এবার তিনি জানতে চাইলেন আমি সেই আরব বেদুইনের কবিতাটি জানি কিনা। রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় দেখলাম তিনি কাকিমাকে কবিতাটির প্রথম পঙক্তিগুলো শোনাতে শুরু করেছেন।

লম্বা লম্বা পা ফেলে বাকিংহাম স্ট্রিট থেকে স্টেশনের দিকে যাওয়ার সময় শক্ত করে টাকাটি ধরে রাখলাম। রাস্তায় নেমে চোখ ঝলসানো আলো আর খদ্দেরের জটলা দেখে মেলায় যাবার কারণটি আবারও মনে পড়ে গেল। একটি খালি রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আমি নিজের আসনে গিয়ে বসলাম। অসহ্য রকমের দেরি হওয়ার পর ধীরে ধীরে গাড়িটি স্টেশন ছাড়ল। ভাঙাচোরা বাড়িঘর আর ঝলমলে নদীর ওপর দিয়ে রেলগাড়ি এগিয়ে চলল। ওয়েস্ট ল্যান্ড রো স্টেশনে আসার পর একদল লোক কামরার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু কুলিরা তাদের পিছু হটিয়ে দিল এই বলে যে এটা মেলার জন্য চালু করা বিশেষ রেল। খালি কামরায় আমি একাই বসে রইলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়িটি একটি কাঠের অস্থায়ী প্লাটফর্মের পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নেমে রাস্তার বড় ঘড়িতে দেখলাম দশটা বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকি। আমার সামনে পড়ল একটি বড় দালান যাতে সেই মোহিনী নামটি লেখা।

সস্তায় মেলার ভিতরে ঢোকার মতো কোনো ফটক খুঁজে পেলাম না। মেলা বন্ধ হয়ে যাবে এই ভয়ে ক্লান্ত চেহারার এক লোকের হাতে এক শিলিং গুঁজে দিয়ে ঘূর্ণি-দোরের ভেতর দিয়ে মেলায় ঢুকে পড়লাম। ভেতরে একটি বড় হলঘর তার চেয়েও অর্ধেক উচ্চতার বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা। মেলার প্রায় সবক'টি দোকানই তখন বন্ধ হয়ে গেছে আর হলঘরটির বেশিরভাগ অংশই তখন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেখানে তখন এমনই নীরবতা নেমে এসেছে যেমনটি নেমে আসে গীর্জায় প্রার্থনা সংগীত শেষ হয়ে যাওয়ার পর। ভয়ে ভয়ে মেলার ঠিক মাঝখানে গেলাম। যে কয়টি দোকান তখনও খোলা ছিল তার সামনে অল্প কিছু লোকের আনাগোনা ছিল। একটি পর্দার ওপর রঙিন বাতি দিয়ে লেখা 'ক্যাফে শ্যাঁতো'। তার সামনে দু'জন লোক একটি থালার ওপর টাকাপয়সা রেখে গুনছিল। পয়সার ঝনঝনানির দিকে মন চলে গেল।

আমার এখানে আসার কারণটি কষ্টে-সৃষ্টে মনে পড়ার পর এসব দোকানের একটিতে ঢুকে কিছু চীনামাটির ফুলদানি আর ফুল-আঁকা চায়ের সেট পরখ করে দেখছিলাম। দোকানটির দরজায় দাঁড়িয়ে একজন তরুণী ভদ্রমহিলা দু'জন তরুণ ভদ্রলোকের সাথে হেসে হেসে গল্প করছিল। তাদের বাচনভঙ্গি লক্ষ্য করার সময় তাদের কথাবার্তার কিছু অংশও আমার কানে এলো।

"ইশ, আমি কক্ষণো এমন কথা বলিনি।"

"উঁহু, তুমি অবশ্যই বলেছো।"

"উঁহু, আমি মোটেও সেকথা বলিনি।"

"ও তো বলল।"

"হ্যা, আমিও ওকে বলতে শুনেছি।"

"ইশ, একদম বাজে কথা।"

আমার দিকে নজর পড়ায় তরুণীটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল আমি কিছু কিনতে চাই কিনা। তার বলার ভাবটি তেমন উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। শুনে মনে হলো কেবল কর্তব্যের খাতিরেই আমাকে একথা বলা। অন্ধকারাচ্ছন্ন দরজার দু'পাশে প্রাচ্যের প্রহরীর মতো দাঁড় করানো দু'টি বড় ঘোড়ার দিকে বিনীতভাবে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললাম, "না, ধন্যবাদ।" তরুণীটি তখন চীনামাটির একটি ফুলদানির জায়গা বদল করে সেই তরুণ দু'টির কাছে ফিরে গেল। তারা আবার সেই একই বিষয়ে কথা বলতে শুরু করল।

দু'একবার তরুণীটি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। সেখানে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই জেনেও দোকানটির সামনে আরো কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করলাম শুধুমাত্র দোকানের জিনিসপত্রগুলোতে আমার যে সত্যি খুব আগ্রহ সেটি বোঝানোর জন্য।

তারপর আস্তে আস্তে ফিরে চললাম মেলার মাঝখান দিয়ে। পকেটে থাকা একটি বড় পয়সার সাথে অন্য দু'টি ছোট পয়সাও রেখে দিলাম। মেলার এক পাশ থেকে বাতি নেভানোর ঘোষণা ভেসে এলো। হলঘরের ওপরের অংশটি তখন পুরোপুরি অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে পেলাম নিজেরই মিথ্যা অহমিকার ফলে অপদস্থ হওয়া এক জীব হিসেবে। আর তখন তীব্র রাগে-দুঃখে আমার চোখ দু'টি জ্বলতে লাগল।

এক যে ছিল মেয়ে। সৌন্দর্যে আর সৌকর্যে যার জীবনের পথচলা শুরু। তবু তার ভাগ্য খোলেনি। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। কিন্তু সেই ভালোবাসা আজ ধূলায় মিশে গেছে। কোল জুড়ে ফুটফুটে ছেলেমেয়ে, তবু তার মনে হয় কেউ যেন এদের বোঝার মতো করে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। সে আর কিছুতেই তার সন্তানদের ভালোবাসতে পারে না। এদিকে তারাও এমন ভাবলেশহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে যেন সারাক্ষণ মায়ের খুঁত ধরতে ব্যস্ত! ঠিক তখনি তড়িঘড়ি করে তারও মনে হয় যে নিজের কিছু দোষত্রুটি এক্ষুণি লুকিয়ে ফেলা উচিৎ। কিন্তু কী যে লুকিয়ে ফেলবে তা সে নিজেও জানে না। যাই হোক, ছেলেমেয়েরা সামনে থাকলেই শুধু মনে হতে থাকে যে, তার অন্তরের অন্তস্থল কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এতে তার খারাপ লাগলেও হাবভাব দেখলে মনে হয় যেন ছেলেমেয়েদের প্রতি মমতা আর ভাবনার শেষ নেই, যেন সে সত্যিই তাদের খুব ভালোবাসে। সে নিজেই শুধু জানে তার মনের গহীন কোণের ছোট্ট এক চিলতে জায়গার কথা যেখানে ভালোবাসার কোনো অস্তিত্ব নেই-না, কারো জন্যই নেই। লোকে বলে , “মা হিসেবে সে অসাধারণ। বাচ্চাদের একেবারে বুকে আগলে রাখে”। শুধু সে নিজে আর তার সন্তানরাই জানে একথা কতটা অমূলক। একে অপরের চোখ দেখেই এসব বুঝতে পারে।

নতুন খেলনা কুকুরছানাকেও এমন অদ্ভুত রকমের বোকা বোকা লাগে শুধুমাত্র এই এক কারণে—সেও এই চাপা আওয়াজ শুনতে পায় বাড়ি জুড়ে। “টাকা চাই! আরও টাকা!” তবু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না। এই গোপন আর্তনাদ চারিদিকে ভেসে বেড়ায়। আর এই কারণেই কেউ এর কথা বলে না। ঠিক যেমন সারাক্ষণ নিঃশ্বাস চলতে থাকলেও কেউ বলে না যে “শ্বাস নিচ্ছি”

তার একটি ছেলে আর ছোট্ট দু'টি মেয়ে। বাগানঘেরা ছিমছাম বাড়ি। সেই সাথে আছে করিৎকর্মা সব কাজের লোক। তাই পাড়ার যে কারো চেয়ে নিজেদের বড় বলেই ভাবে তারা। এত স্বচ্ছলতার মাঝেও বাড়িজুড়ে সারাক্ষণ এক চাপা হাহাকার। সংসারে অভাব যেন নিত্যসঙ্গী। মায়ের সামান্য কিছু আয় আছে, বাবারও তাই। কিন্তু তাদের চাহিদামাফিক ঠাটবাট বজায় রাখতে এই আয় মোটেও যথেষ্ট নয়। বাবা শহরের কোন এক অফিসে কাজ করে। রোজগারপাতির সম্ভাবনা ভালোই, কিন্তু সে সম্ভাবনা কখনো বাস্তবে রুপ নেয়নি। অভাবের যাঁতাকলে চিড়েচ্যাপ্টা দশা হলেও ঠাটবাটের কোনো রকম কমতি নেই।

শেষমেষ একদিন মা বলে বসে, "দেখা যাক এবার আমার দ্বারা কিছু হয় কি না"। কিন্তু সে নিজেও জানে না কিভাবে কোথা থেকে শুরু করবে। ভেবে ভেবে সারা হয়। এটা সেটা নানান কিছু চেষ্টা করতে থাকে। তবু সাফল্যের সোনার হরিণ অধরাই রয়ে যায়। তার কপালে এবার চিন্তার ভাঁজ। ছেলেমেয়েরা দিন দিন বড় হচ্ছে। আজ বাদে কাল স্কুলে যাবে। আর তাই টাকা চাই, আরো টাকা। রুপবান ও রুচিবান এই বাবাকে দেখে মনে হয় না তার দ্বারা জুৎসই কোন কাজ আদৌ সম্ভব। মায়ের অবশ্য আত্মবিশ্বাসের কোনো কমতি নেই। অথচ তারও সেই একই দশা। তাই বলে রুচিতে সে স্বামীর চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না।

এবং তাই পুরো বাড়ির আনাচে কানাচে এক চাপা আওয়াজ ভেসে বেড়াতে থাকে—"টাকা চাই! আরো টাকা!" বড়দিন উপলক্ষে যখন বাড়ির খেলাঘরটি চমৎকার আর দামি সব খেলনায় সেজে উঠে তখনও ছেলেমেয়েরা সেই অব্যক্ত আওয়াজ টের পায়। হালফ্যাশানের চকচকে কাঠের খেলনা ঘোড়া আর ফিটফাট পুতুল-বাড়ির পেছন থেকেও একই আওয়াজ যেন গুমরে গুমরে বলে যায়—"টাকা চাই! আরো টাকা!"

দুলতে থাকা খেলনা ঘোড়ার স্প্রিং থেকেও যেন এই আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। ঘোড়াটি যেন তার খসখসে কাঠের মাথা কাত করে শুনতে থাকে সেই আওয়াজ। খেলনা গাড়িতে বসানো বড়সড় গোলাপী পুতুলটিও যেন হাসতে হাসতে এই আওয়াজ শুনতে পায়। আর শুনতে পায় বলেই যেন ইচ্ছে করে এমন বোকার মতো হাসতে থাকে। নতুন খেলনা কুকুরছানাকেও এমন অদ্ভুত রকমের বোকা বোকা লাগে শুধুমাত্র এই এক কারণে—সেও এই চাপা আওয়াজ শুনতে পায় বাড়ি জুড়ে। "টাকা চাই! আরও টাকা!"

তবু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না। এই গোপন আর্তনাদ চারিদিকে ভেসে বেড়ায়। আর এই কারণেই কেউ এর কথা বলে না। ঠিক যেমন সারাক্ষণ নিঃশ্বাস চলতে থাকলেও কেউ বলে না যে "শ্বাস নিচ্ছি"।

একদিন তাদের ছেলে পল এসে মায়ের কাছে জানতে চায়, "মা, আমাদের নিজেদের গাড়ি নেই কেন? কেন আমরা সবসময় মামার গাড়ি নয়ত ট্যাক্সিতে চড়ি?"

মা বলে, "কারণ পুরো বংশে আমরাই সবচে' গরীব।"

"কেন, মা?"

"কারণ তোর বাবার ভাগ্য বলতে কিছু নেই", মায়ের গলায় তিক্ত ঝাঁঝ।

ছেলেটি কিছুক্ষণ নীরব থাকে। সে খানিকটা ভয়ে ভয়ে জানতে চায়, "'ভাগ্য' মানে কি টাকাপয়সা, মা?"

"না, পল। ঠিক তা না। 'ভাগ্য' থাকলেই লোকের টাকা পয়সা হয়।"

পল মায়ের কথা ঠিক বুঝতে পারে না। সে বলে, "ও, অস্কার মামা যে ভাগ্যের মালপানির কথা বলে, আমি তো ভাবি মামা টাকার কথাই বলে।"

মা বোঝায়, "ভাগের মালপানি বলতে তোর মামা টাকার কথাই বোঝায়। কিন্তু সে 'ভাগের' কথা বলে, 'ভাগ্যের' কথা না।"

ছেলে বলে, "ও আচ্ছা, তাহলে ভাগ্য কী জিনিস, মা?"

মা বলে, "ভাগ্য থাকলেই টাকা হয়। যার ভাগ্য থাকে, তার টাকাও থাকে। তাই জন্মের সময় টাকার চেয়েও ভাগ্য থাকা বেশি ভালো। ধনী হলে টাকা হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভাগ্য থাকলে আরো বেশি করে টাকা হাতে আসে।"

"ওহ, তাই বুঝি? তাহলে বাবার কি ভাগ্য নেই?"

"না রে, একেবারে অভাগা লোক একটা।" মায়ের কথার সুর রীতিমত তিক্ত-বিরক্ত।

ছেলে ফ্যালফ্যাল করে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"কেন?" সে জানতে চায়।

"জানি না। একজন মানুষের কেন ভাগ্য থাকে, আবার আরেকজনের কেন থাকে না তা কেউ জানে না।"

"তাই বুঝি? কেউ জানে না? কেউ-ই না?"

"হয়ত ঈশ্বর জানেন। কিন্তু তিনি কখনো বলেন না।"

"তবে তো তাঁর বলা উচিৎ। কিন্তু তোমারও কি ভাগ্য নেই, মা?"

"না রে, অভাগা লোকের সাথে বিয়ে হলে কারো ভাগ্য থাকে না।"

"কিন্তু তোমার নিজের কি ভাগ্য নেই?"

"বিয়ের আগে ভাবতাম আমার ভাগ্য আছে। কিন্তু এখন কেবল উল্টোটাই মনে হয়।"

"কেন?"

"থাক ওসব কথা। এমন তো নাও হতে পারে।"

এটাই মায়ের মনের কথা কিনা তা বোঝার জন্য ছেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু মায়ের চোখমুখ দেখে তার মনে হয় মা কী যেন একটা লুকানোর চেষ্টা করছে।

"তবে যাই হোক", ছেলের অহঙ্কারী জবাব, "আমার কিন্তু ভাগ্য আছে।"

"কেন, রে?" মা এবার হেসে ফেলে।

সে মায়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। সে নিজেও জানে না এ কথা কেন বলেছে।

"ঈশ্বর আমাকে বলেছেন," গর্বে ছেলের বুক ফুলে দশহাত।

"তিনি বললে তো ভালোই হয়, বাবা।"

"তিনি বলেছেন, মা।"

"চমৎকার!" মা এবার বাবার মতো ভঙ্গি করে বলে ওঠে। ছেলেটি দেখল যে মা তার দাবি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা বরং কোনো পাত্তাই দেয়নি। মনে মনে তার রাগ হয়। তার মন চায় জোর করে মায়ের নজর কাড়তে। ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে সে আপনমনে গুটি গুটি পায়ে চলে যায় "ভাগ্যে"র সূত্র খুঁজতে। ভাগ্যকে তার চাই-ই চাই।

খেলাঘরে যখন তার বোন দু'টি পুতুল খেলায় ব্যস্ত, তখন বড় কাঠের ঘোড়ায় চড়ে জোরে জোরে দুলতে দুলতে তার এমনই মত্ত অবস্থা হয় যে বোন দু'টি উসখুস করতে থাকে। তারা আড়চোখে দেখতে থাকে ভাইয়ের কাণ্ড-কারখানা । দুরন্ত বেগে দুলতে থাকে ঘোড়া আর সেই সাথে দুলতে থাকে তার কালো ঢেউ খেলানো চুল। ছেলেটির চোখে তখন অদ্ভুত এক আগুনের ফুলকি। বাচ্চা মেয়ে দু'টির সাহস হয় না ভাইয়ের সাথে কথা বলার।

এই উন্মত্ত ঘোড়দৌড় শেষে ছেলেটি ঘোড়া থেকে নেমে এসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ঘোড়াটির মুখের দিকে। ঘোড়ার লাল রঙের মুখটি সামান্য খোলা আর বড় বড় চোখদু'টি কাচের মতো ঝকঝকে।

"চল! এক্ষুণি আমাকে ভাগ্যের কাছে নিয়ে চল! চল বলছি!" সে মনে মনে ঘোড়াকে হুকুম করে।

অস্কার মামাকে বলে ছোট্ট একটা চাবুক আনিয়েছে, আর সেটা দিয়েই সে ঘোড়ার ঘাড়ে চাবকায়। এই ঘোড়াই যে তাকে ভাগ্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারে সেটা তার ভালোই জানা আছে। একটু জোর খাটালেই কাজ আদায় করা যাবে। তাই সে আবার তার খেলনা ঘোড়ায় চেপে প্রবল বেগে ছুটে চলে, যদি কোনোভাবে ভাগ্যের নাগাল পাওয়া যায়। সে জানে তার এই চেষ্টা একদিন ঠিকই সফল হবে।

"তোমার ঘোড়া তো ভেঙে যাবে, পল" পলের আয়া বলে।

"সারাক্ষণ খালি ঘোড়ার পিঠে। এবার একটু থামলে ভালো হতো," পলের বোন জোন বলে উঠে।

জবাবে পল কেবল কটমট করে চেয়ে থাকে তাদের দিকে। আয়া এবার হাল ছেড়ে দেয়। এই ছেলেটির চালচলন সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। অবশ্য ছেলেও এখন মোটামুটি বড় হয়ে গেছে। সারাক্ষণ আয়ার দেখভালের আর দরকার পড়ে না।

একদিন মা আর অস্কার মামা খেলার ঘরে গিয়ে দেখে সে রোজকার মতো ঘোড়ার পিঠে। পল তাদের সাথে কোনো কথা বলে না।

"কিরে জকি! বাজিমাৎ হবে তো?" মামা বলে।

"তোর কি এখনো কাঠের ঘোড়ায় দোল খাওয়ার বয়স আছে নাকি? তুই আর এখন একেবারে ছোট্টটি নেই, বুঝলি," মা বলে।

পলের নীল চোখজোড়া মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে শুধু। মত্ত অবস্থায় সে কারো সাথে কথা বলে না। মা চিন্তিত মুখে ছেলের কাণ্ড-কীর্তি দেখতে থাকে। হঠাৎ এক সময় সে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ে।

"পেয়ে গেছি!" সে চিৎকার করে সবাইকে বলে উঠে। তার নীল চোখগুলো যেন জ্বলছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি বলিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী।

"কী পেয়েছিস?" মা জানতে চায়।

"যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি!" ছেলের তেজী জবাব।

"ঠিক বলেছিস, ভাগ্নে। কোনো কিছুর শেষ না দেখে থামতে নেই। তোর ঘোড়ার নাম কী রে?" অস্কার মামা বলে।

"ওর কোন নাম নেই," ছেলেটি বলে।

"নাম ধরে না ডাকলেও কথা শোনে?" মামা জানতে চায়।

"আসলে ওর অনেকগুলো নাম। গত সপ্তাহে নাম ছিল 'স্যানসোভিনো'।"

"'স্যানসোভিনো'? ওই ঘোড়া তো এ্যাস্কট-এর রেস জিতেছিল। এই নাম তুই কী করে জানলি?"

"ও তো সারাক্ষণ শুধু ব্যাসেটের সাথে রেসের গল্প করে," জোন বলে।

এইটুকু ভাগ্নে রেসের সব খবর রাখে শুনে মামা বেশ খুশি হয়। ব্যাসেটের বয়স বেশি নয়। যুদ্ধের ময়দানে এই ছোকরা অস্কার ক্রেসওয়েলের খাস বেয়ারা ছিল। সেই সময় ব্যাসেটের বাঁ পায়ে চোট লাগে। এ বাড়ির মালির চাকরিটা সে অস্কারের সুপারিশেই পেয়েছে। ব্যাসেটের আবার সাংঘাতিক জুয়ার নেশা। দিনরাত তার মাথায় শুধু রেসের চিন্তা ঘুরপাক খায়। তার সাথে এবার এই বাচ্চা ছেলেও এসে জুটেছে।

অস্কার ক্রেসওয়েল ব্যাসেটের কাছ থেকেই আসল খবরটা বের করে আনে।

"ছোট সাহেব বারবার এসে জানতে চায়। না বলে উপায় থাকে না, স্যার," ব্যাসেট বলে। ব্যাসেটের চোখমুখ গুরুগম্ভীর, যেন কোন ধর্মকথা আলোচনা করছে।

"কোনো ঘোড়া মনে ধরলে বাজি-টাজিও ধরে নাকি?"

“আসলে স্যার, তার সাথে আমি বেইমানী করতে চাই না। ছেলেমানুষ, খেয়ালের বশে খেলে। তবে স্যার, ভালোই খেলে। কিছু মনে না করলে, স্যার, আপনি বরং নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করুন না। এই খেলায় তার বেশ আগ্রহ। পাছে আবার ভেবে বসবে যে আমি তার নামে কথা লাগাচ্ছি। আমায় মাফ করবেন, স্যার।” ব্যাসেটের কথায় সেই একই ভাবগাম্ভীর্য।

“কিন্তু তোর টাকাগুলো দিয়ে এবার কী করবি?”

“কী আর করব। মায়ের জন্যই তো এসব ধরলাম। মা বলে বাবার ভাগ্য নেই বলে তারও নাকি ভাগ্য নেই। তাই ভাবলাম আমার ভাগ্য থাকলে যদি আওয়াজটা এবার বন্ধ হয়।”

“কিসের আওয়াজ বন্ধ হবে?”

“আমাদের বাড়ির। এই আওয়াজের জন্যই বাড়িটা অসহ্য লাগে আমার।”

“কী রকম আওয়াজ হয়?

“আমি... আমি... আমি ঠিক জানি না। কিন্তু সবসময় শুধু টাকার অভাব থাকে, জানো মামা,” ছেলেটি অস্থিরভাবে নড়েচড়ে বসে।

“জানি বাবা, জানি।”

“তুমি তো জানো মা’র কাছে পাওনাদারদের চিঠি আসে, জানো না?”

“হ্যাঁ, তা জানি,” মামা বলে।

মামা এবার যায় ভাগ্নের কাছে। তাকে নিয়ে গাড়িতে করে বেড়াতে বের হয়।

“তা বাবা পল, কখনো ঘোড়ার নামে বাজি ধরেছিস?” মামা জানতে চায়।

ভাগ্নে খুব মনযোগ দিয়ে তার এই সুদর্শন মামাটির হাবভাব লক্ষ্য করে। তারপর আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, “কেন, আমার কি বাজি ধরা নিষেধ?”

“আরে মোটেও না! আমি তো আরো ভাবছি লিংকন-এর রেসের কথা তোর থেকে জেনে নেব।”

গাড়িটি গ্রামের পথ ধরে ছুটে চলে হ্যাম্পশায়ারে অস্কার মামার বাড়ির দিকে।

“তিন সত্যি?” ভাগ্নে বলে।

“তিন সত্যি, ভাগ্নে!” মামা বলে।

“বেশ তবে, ‘ড্যাফোডিল’ জিতবে।”

"'ড্যাফোডিল'! আমার কিন্তু খটকা লাগছে, ভাগ্নে। আচ্ছা, 'মির্জা' কেমন দৌড়াবে?"

"আমি শুধু কে জিতবে সেটাই জানতে পারি। 'ড্যাফোডিল'ই বাজিমাৎ করবে।"

"'ড্যাফোডিল', না?"

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। 'ড্যাফোডিল' আসলে তেমন ভালো ঘোড়া নয়।

"মামা!"

"কী, বাবা?"

"এসব আবার কাউকে বলে দেবে না তো? আমি কিন্তু ব্যাসেটকে কথা দিয়েছি।"

"জাহান্নামে যাক ব্যাসেট! ওই ব্যাটা এসবের কী বোঝে?"

"আমরা দু'জন তো পার্টনার, সেই শুরু থেকেই পার্টনার। ও-ই তো প্রথম আমাকে পাঁচ শিলিং ধার দেয় বাজি ধরার জন্য। সেবার অবশ্য হেরে যাই। তার কাছে আমি তিন সত্যি করেছি যে এসব কথা আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানবে না। সেই যে তুমি আমাকে একবার দশ শিলিং দিয়েছিলে সেটা দিয়েই আমার বাজি জেতা শুরু হলো। তাই ভাবলাম তোমার ভাগ্য আছে। এসব কথা কাউকে বলে দেবে না তো?"

ছেলেটি তার বড় বড় নীল চোখ মেলে মামার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মামা এবার একটু নড়েচড়ে বসে। তার চেহারায় অস্বস্তির ছাপ।

"একদম ঠিক বলেছিস, ভাগ্নে! তোর এসব কথা গোপনই থাকবে। 'ড্যাফোডিল', তাই না? তো এর নামে কত বাজি ধরলি?"

"বিশ পাউন্ড হাতে রেখে বাদ বাকি সবই বাজিতে লাগিয়েছি। এই বিশ পাউন্ড জমা থাকে," এ কথায় মামা বেশ মজা পায়।

"তবে রে পাকা বুড়ো, বিশ পাউন্ড আবার জমাও রেখেছিস? তাহলে বাজি ধরেছিস কত?"

"তিন শ'। কাউকে বলো না কিন্তু, মামা। তিন সত্যি করো," ছেলের মুখ গম্ভীর।

মামা এবার হো হো করে হেসে উঠে।

“ওরে সবজান্তা শমশের, কাউকে কিছু বলব না, কেমন। কিন্তু তোর সেই তিন শ’ পাউন্ড এখন কোথায়?” মামা হাসতে হাসতে বলে।

“ব্যাসেটের কাছেই জমা থাকে। আমরা দু’জন পার্টনার না?”

“তোরা পার্টনার? তাই নাকি রে? তা ব্যাসেট কত বাজি ধরেছে ‘ড্যাফোডিলের’ নামে?”

“সে মনে হয় আমার মতো অত বেশি ধরতে পারেনি। দেড় শ’ হবে হয়ত।”

“কী বলিস? দেড় শ’ পয়সা? ” মামা হাসে।

“দেড় শ’ পাউন্ড। ব্যাসেটের জমা তো আমার থেকেও বেশি ,” ভাগ্নে অবাক হয়ে মামাকে দেখে।

বিস্ময়ে আর আমোদে অস্কার মামার মুখের ভাষা হারিয়ে যায়। মামা এ বিষয়ে ভাগ্নেকে আর ঘাঁটায় না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে এবার লিংকনের রেসে ভাগ্নেকেও সাথে নেবে।

মামা বলে, “শোন বাবা, ‘মির্জা’র নামে বিশ পাউন্ড বাজি ধরছি। আর তোর পছন্দের ঘোড়ার নামে আরো পাঁচ পাউন্ড ধরব। তোর কোনো পছন্দের ঘোড়া থাকলে নাম বল।”

“‘ড্যাফোডিল’, মামা।”

“না না, ‘ড্যাফোডিল’ এর নামে পাঁচ পাউন্ড ধরা ঠিক হবে না।”

“আমি হলে কিন্তু ঠিকই ধরতাম।”

“বাহ! ঠিক বলেছিস! তাহলে ‘ড্যাফোডিল’এর নামে আমার পাঁচ পাউন্ড আর তোর পাঁচ পাউন্ড, কেমন।”

ছেলেটি জীবনে কখনো ঘোড়দৌড়ের ময়দানে যায়নি। তার নীল চোখের তারায় যেন দাবানল জ্বলে উঠেছে। সে একদম মুখ বুজে চুপচাপ রেস দেখে যায়। ঠিক তার সামনেই এক ফরাসী ভদ্রলোক ‘ল্যান্সলট’-এর নামে বাজি ধরেছে। উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে লোকটি দু’হাত চাপড়ে ফরাসী উচ্চারণে “‘ল্যান্সলট’!‘ল্যান্সলট’!” বলে চেঁচাতে থাকে।

সেই রেসে ‘ড্যাফোডিল’ প্রথম হয়, ‘ল্যান্সলট’ হয় দ্বিতীয় আর ‘মির্জা’ তৃতীয়।

ছেলের মুখে রক্তিম আভা, দু’চোখে আগুনের হলকা, অথচ কী অদ্ভুত রকমের শান্ত ভাব। মামা চারটি পাঁচ পাউন্ডের নোট এনে তার হাতে দেয়। তার বাজিতে ধরা টাকা এবার চার গুণ হয়ে ফিরে এসেছে।

“এগুলো দিয়ে এবার কী করি বল তো?” মামা সেই টাকাগুলো ভাগ্নের মুখের সামনে নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে বলে।

“ভাবছি ব্যাসেটের সাথে কথা বলে দেখব। এবার বোধহয় আমার পনের শ’ পাউন্ড হলো। এছাড়া জমা আছে আরো বিশ পাউন্ড, সেই সাথে যোগ হলো আজকের বিশ পাউন্ড,” ছেলেটি বলে।

মামা তার এই ভাগ্নেকে মন দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দেখে। তারপর বলে, “আচ্ছা দেখ ভাগ্নে, ব্যাসেট আর ওই পনের শ’ পাউন্ডের গল্পটা আসলে সত্যি না, তাই না?”

“সব সত্যি, মামা। কিন্তু এসব কথা কেবল তোমার আর আমার মাঝেই থাকবে। তিন সত্যি করো!”

“আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে, তিন সত্যি করছি! কিন্তু ব্যাসেটের সাথে আমাকে কথা বলতেই হবে।”

“আমার আর ব্যাসেটের সাথে যদি পার্টনার হতে চাও, তবে আমরা তিন জনে মিলে পার্টনার হতে পারি। শুধু একটা কথা, তোমাকে তিন সত্যি করে কথা দিতে হবে যে আমরা তিনজন ছাড়া এসব কথা আর কেউ জানতে পারবে না। আমার আর ব্যাসেটের ভাগ্য আছে। তোমারও নিশ্চয়ই আছে, কারণ তোমার দেয়া দশ শিলিং দিয়েই আমার রেস জেতা শুরু...।”

অস্কার মামা এক বিকেলে পল আর ব্যাসেটকে রিচমন্ড পার্কে নিয়ে যায়। সেখানেই তাদের কথাবার্তা হয়।

“ব্যাপারখানা হলো, স্যার, ছোট সাহেব আমার কাছে রেসের নানান কিস্যা-কাহিনী শুনতে চায়। জিতলাম কি হারলাম তাতে তার বেজায় আগ্রহ। প্রায় বছর খানেক আগে ছোট সাহেবের হয়ে ‘ব্লাশ অব ডন’-এর নামে পাঁচ শিলিং বাজি ধরেছিলাম। সেবার হেরে যাই। এরপর ‘সিংহলি’র নামে বাজি ধরলাম আপনার দেয়া সেই দশ শিলিং দিয়ে। তাতেই ভাগ্য ফিরে গেল। আর সেই থেকে সব মিলিয়ে ভালোই চলে যাচ্ছে। কী বলো, ছোট সাহেব?”

"মন থেকে সায় পেলেই ঠিক কাজটা করা যায়। মন থেকে সায় না পেলেই যত লোকসান," পল বলে।

"আমরা কিন্তু তখন সাবধানেই পা ফেলি," ব্যাসেট বলে।

"কিন্তু মন থেকে এই 'সায়'টা পাস কখন?"

"এই হলো আমাদের ছোট সাহেব, স্যার। ঠিক যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে সংকেত পায়। এই যেমন লিংকনের রেসে 'ড্যাফোডিল'-এর জেতার কথাটা আগেই বলতে পারল। একদম খাপে খাপে মিলে গেল সব," ব্যাসেট এমনভাবে বলে যেন ভক্তিভরে কোনো নিগূঢ় কথা বলছে।

"'ড্যাফোডিল'-এর নামে বাজি ধরেছিলে না কি?" অস্কার ক্রেসওয়েল জিজ্ঞেস করে।

"জ্বী, স্যার। এই সামান্য কিছু আয় হয়ে গেল, আর কি," পলের দিকে তাকিয়ে ব্যাসেট এবার মুখে কুলুপ এঁটে রাখে।

"আমি তো বার শ' জিতেছি, তাই না ব্যাসেট? মামাকে আগেই বলেছিলাম যে 'ড্যাফোডিল'-এর নামে তিন শ' ধরব।"

"ঠিক তাই," ব্যাসেট মাথা ঝাঁকায়।

"কিন্তু কোথায় সেই টাকা?" মামা জানতে চায়।

"সে আমি তালা-চাবি দিয়ে রাখি, স্যার। ছোট সাহেব একবার মুখ ফুটে চাইলেই সব বের করে এনে দেব।"

"কী! পনের শ' পাউন্ড?"

"সাথে আরো বিশ পাউন্ড! মানে আজকের রেসের আয় মিলিয়ে আরো চল্লিশ পাউন্ড, আর কি।"

"এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার!" মামা বলে।

"বেয়াদবি না নিলে একটা কথা বলি, স্যার। ছোট সাহেব যদি আপনাকে পার্টনার করতে চায় তবে রাজি হয়ে যাওয়াই ভালো," ব্যাসেট বলে।

অস্কার ক্রেসওয়েল এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে দেখে।

“সেই টাকাটা একবার দেখতে চাই,” সে বলে।

তারা গাড়ি করে আবার বাড়ি ফিরে যায়। বাগানের চালাঘরে এসে ব্যাসেট সত্যি সত্যি পনের শ’ পাউন্ড বের করে এনে তাকে দেখায়। আর বাকি সেই বিশ পাউন্ড জমা থাকে রেসকোর্সের কোষাগারে, কোষাধ্যক্ষ জো গ্লি’র জিম্মায়।

“দেখলে তো মামা, মন থেকে সায় পেলেই সব কাজ ঠিকমতো হয়! মনের জোরই তো আমাদের আসল জোর, তাই না ব্যাসেট?”

“ঠিক তাই, ছোট সাহেব।”

“আর তোর মন থেকে কখন সায় পাস?” মামা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

“আসলে, মাঝে মাঝে এমন হয় যে মন থেকে পুরোপুরি সায় পেয়ে যাই, এই যেমন ‘ড্যাফোডিল’-এর বেলায় হলো। কোনোদিন আবার কিছুটা আভাস পাই, কখনো আবার কোনো আভাসই পাই না, তাই না ব্যাসেট? তখনই আমাদের সাবধানে পা ফেলতে হয়। কারণ তখন বেশিরভাগই লোকসান হয়।”

“তাই না কি রে? আর ওই যে ‘ড্যাফোডিল’-এর বেলায় তোর মন থেকে সায় পেলি, সায় পেলে কিভাবে বুঝতে পারিস, বল তো ভাগ্নে।”

“কিভাবে বুঝতে পারি তা তো জানি না, মামা। কিন্তু কোনো একভাবে বোঝা যায়, এই আর কি,” ছেলেটি অস্বস্তিতে পড়ে।

“ঠিক যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে পাঠানো সংকেত আসে, স্যার” ব্যাসেটের মুখে ঘুরে ফিরে সেই এক কথা।

“এই তবে মানতে হবে!” মামা বলে।

মামা কিন্তু পার্টনার হলো। লেজার-এর রেসের আগে আগে পল মন থেকে ‘সায় পেল’ যে, ‘লাইভলি স্পার্ক’ নামের বাজে একটা ঘোড়াই নাকি জিতবে। পল গোঁ ধরে বসে যে এই ঘোড়ার নামে সে হাজার পাউন্ড ধরবেই। ব্যাসেট ধরল পাঁচ শ’ আর অস্কার ক্রেসওয়েল দু’শ’। ওই ঘোড়াই শেষপর্যন্ত মাৎ করে। বাজির টাকার দশগুণ উঠে আসে। এই রেস থেকে পলের দশ হাজার পাউন্ড আয় হয়।

“দেখলে তো, এর ব্যাপারে মন থেকে পুরোপুরি সায় পেয়েছিলাম,” সে বলে।

অস্কার ক্রেসওয়েলও দু'হাজার পাউন্ড আয় করে ফেলে। সে বলে, "দেখ ভাগ্নে, এসব ব্যাপারে আমার কেমন জানি অস্বস্তি হয়।"

"অস্বস্তির কিছু নেই, মামা। হয়ত দেখবে সামনের অনেকদিন ধরে আমি আর মন থেকে তেমন কোনো সায় পেলাম না।"

"কিন্তু তোর টাকাগুলো দিয়ে এবার কী করবি?"

"কী আর করব। মায়ের জন্যই তো এসব ধরলাম। মা বলে বাবার ভাগ্য নেই বলে তারও নাকি ভাগ্য নেই। তাই ভাবলাম আমার ভাগ্য থাকলে যদি আওয়াজটা এবার বন্ধ হয়।"

"কিসের আওয়াজ বন্ধ হবে?"

"আমাদের বাড়ির। এই আওয়াজের জন্যই বাড়িটা অসহ্য লাগে আমার।"

"কী রকম আওয়াজ হয়?

"আমি... আমি... আমি ঠিক জানি না। কিন্তু সবসময় শুধু টাকার অভাব থাকে, জানো মামা," ছেলেটি অস্থিরভাবে নড়েচড়ে বসে।

"জানি বাবা, জানি।"

"তুমি তো জানো মা'র কাছে পাওনাদারদের চিঠি আসে, জানো না?"

"হ্যাঁ, তা জানি," মামা বলে।

"তখন বাড়িতে এমন আওয়াজ হয় যেন কেউ আমাদের নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করছে। সত্যিই ভীষণ খারাপ লাগে। তাই ভাবলাম, আমার যদি ভাগ্য থাকত..."

"তাহলে তুই এই আওয়াজটা থামাতে পারতি," মামা কথা শেষ করে।

ছেলেটি তার বড় বড় নীল চোখ মেলে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। তার চোখে যেন শীতল এক আগ্নেয়গিরি।

"ভালো কথা, আমরা এবার কী করব?" মামা বলে।

"আমি চাই না মা আমার ভাগ্যের কথা জানুক।"

"জানাতে চাস না কেন?"

"জানতে পারলে মা আর আমাকে এসব করতে দেবে না।"

"আমার মনে হয় না সে এমনটা করবে।"

"না না, মামা, আমি মোটেই চাই না মা কিছু জানুক," ছেলেটি অদ্ভুতভাবে কাঁচুমাচু করতে থাকে।

"আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে। মা'কে না জানিয়েই সব হবে, কেমন।"

খুব সহজেই সবকিছু সামলে নেয় তারা। মামার বুদ্ধিমতো পল তার হাতে পাঁচ হাজার পাউন্ড তুলে দেয়। মামা উকিলের মাধ্যমে বন্দোবস্ত করে দেয় যে পলের মা পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে প্রতি জন্মদিনে হাজার পাউন্ড পাবে উপহার হিসাবে।

মামা বলে, "যাক এখন থেকে তোর মা পরপর পাঁচ জন্মদিনে হাজার পাউন্ড করে উপহার পাবে। এভাবে পেতে পেতে আবার বদঅভ্যাস না হয়ে যায়।"

পলের মায়ের জন্মদিন নভেম্বর মাসে। ইদানীং বাড়ির সেই আওয়াজটা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কিন্তু এত ভাগ্য থেকেও পল আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না। হাজার পাউন্ডের কথা লেখা সেই জন্মদিনের চিঠিটি মায়ের হাতে পৌঁছালে কী ফল হয় তা দেখার জন্য তার আর তর সইছে না।

বাইরের লোক কেউ না থাকলে পল আজকাল বাবা মার সাথেই খাবার টেবিলে খেতে বসে। এখন সে বড় হচ্ছে কিনা। মা প্রায় রোজই শহরে যায়। মা আজকাল নিজের এক সুপ্ত প্রতিভার খোঁজ পেয়েছে—পোশাকের নকশা আঁকার গুণ। তাই এক বান্ধবীর চিত্রশালায় সে গোপনে আঁকাআঁকির কাজ শুরু করে। সেই বান্ধবী আবার নাম করা পোশাক বিপণির প্রধান নকশাশিল্পী। পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্য রেশমী, পশমী, চুমকিওয়ালা নানা রকম পোশাকের নকশা এঁকে বান্ধবী বছরে কয়েক হাজার পাউন্ড রোজগার করে। আর এদিকে বছরে মাত্র কয়েক শ' পাউন্ড রোজগারে পলের মায়ের মন ভরে না। সে মনে প্রাণে চায় কোনো একটা বিষয়ে সেরা হতে, অথচ সামান্য একটা পোশাক নকশার কাজে পর্যন্ত সেরা হতে পারছে না।

উকিল সাহেব পুরো পাঁচ হাজার পাউন্ডই মায়ের হাতে তুলে দেয়। এরপর ঘটে ভারি অদ্ভুত ঘটনা। বাড়ির সেই আওয়াজ এবার একদম লাগাম ছাড়া, উন্মত্ত। যেন কোনো মনোরম ফাল্গুনী সন্ধ্যায় অজস্র ব্যাঙের বেসুরো ঘ্যাঙর ঘ্যাং। বাড়িতে নতুন কিছু আসবাব এলো। পলের জন্যও নতুন শিক্ষক রাখা হলো। আসছে বছর পল বিখ্যাত 'ইটন' স্কুলে ভর্তি হবে। তার বাবাও একসময় এই নামী স্কুলের ছাত্র ছিল। ঘরদোরের সাজসজ্জা এখন আরো নজরকাড়া। পলের মা একসময় যেমন বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত ছিল, তারই ছোঁয়া এবার একটু একটু করে লাগতে শুরু করেছে পুরো বাড়ি জুড়ে। তবুও বাগানে থোকায় থোকায় ফুটে থাকা কাঠবাদাম ফুলের গুচ্ছ, লজ্জাবতী লতা আর সোফায় সাজানো রঙ-বেরঙের কুশনের তলা থেকে বেরিয়ে আসা তীব্র এক নিঃশব্দ চিৎকারে গোটা বাড়ি যেন গমগম করতে থাকে—"টাকা চাই, আরো টাকা! আরো চাই, অনেক টাকা! চাই-ই চাই, অনেক টাকা!"

জন্মদিনের সকালে পলের মা নাস্তা খেতে একতলায় নেমে এলো। মা চিঠিপত্র খুলে পড়ার সময় পল অধীর আগ্রহে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। উকিল সাহেবের চিঠির খাম পলের চেনা। চিঠিটা পড়তে পড়তে মায়ের চোখমুখ পাথরের মতো কঠিন, ভাবলেশহীন হতে থাকে। তার মুখে মমতার লেশমাত্র নেই, আছে শুধু দৃঢ় সংকল্পের ছায়া। মা এই চিঠি অন্যসব চিঠির তলায় লুকিয়ে রাখে। এ বিষয়ে আর একটাও কথা বলে না।

"জন্মদিনে আজ ভালো কিছু পাওনি, মা?"

"আছে আর কি, মোটামুটি," মায়ের কন্ঠ নিরুত্তাপ। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে মা শহরের দিকে চলে যায়। কিন্তু বিকেল হতেই অস্কার মামা এসে হাজির। মামা জানায় পলের মা নাকি উকিল সাহেবের সাথে অনেকক্ষণ যাবৎ আলোচনা করেছে। মা ওই পাঁচ হাজার পাউন্ড একবারেই হাতে পেতে চাইছে, অনেক দেনা আছে কিনা।

"তোমার কি মত, মামা?" ছেলেটি জানতে চায়।

"তুই-ই বল কী করবি।"

"তাহলে দিয়ে দাও না! অন্য রেসে ঠিকই আবার টাকা হতে আসবে।"

"হাতের পাঁচ ছাড়তে নেই রে ভাগ্নে!' অস্কার মামা বলে।

"সামনে গ্রান্ড ন্যাশনাল, লিংকনশায়ার আর ডার্বি-র রেস আছে। এর মধ্যে অন্তত একটা রেসের ব্যাপারে মন থেকে ঠিকই সায় পাব," পল বলে।

অস্কার মামার অনুমতিতে উকিল সাহেব পুরো পাঁচ হাজার পাউন্ডই মায়ের হাতে তুলে দেয়। এরপর ঘটে ভারি অদ্ভুত ঘটনা। বাড়ির সেই আওয়াজ এবার একদম লাগাম ছাড়া, উন্মত্ত। যেন কোনো মনোরম ফাল্গুনী সন্ধ্যায় অজস্র ব্যাঙের বেসুরো ঘ্যাঙর ঘ্যাং। বাড়িতে নতুন কিছু আসবাব এলো। পলের জন্যও নতুন শিক্ষক রাখা হলো। আসছে বছর পল বিখ্যাত 'ইটন' স্কুলে ভর্তি হবে। তার বাবাও একসময় এই নামী স্কুলের ছাত্র ছিল। ঘরদোরের সাজসজ্জা এখন আরো নজরকাড়া। পলের মা একসময় যেমন বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত ছিল, তারই ছোঁয়া এবার একটু একটু করে লাগতে শুরু করেছে পুরো বাড়ি জুড়ে। তবুও বাগানে থোকায় থোকায় ফুটে থাকা কাঠবাদাম ফুলের গুচ্ছ, লজ্জাবতী লতা আর সোফায় সাজানো রঙ-বেরঙের কুশনের তলা থেকে বেরিয়ে আসা তীব্র এক নিঃশব্দ চিৎকারে গোটা বাড়ি যেন গমগম করতে থাকে—"টাকা চাই, আরো টাকা! আরো চাই, অনেক টাকা! চাই-ই চাই, অনেক টাকা!"

পলের বড় ভয় করে। সে গৃহশিক্ষকদের কাছে গ্রিক আর ল্যাটিন পড়ায় মনোযোগ দেয়। প্রবল উত্তেজনায় ব্যাসেটের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটে তার। গ্র্যান্ড ন্যাশনাল রেস গেল অথচ সে আগেভাগে কিছুই 'জানতে' পারেনি। এই কারণে একশ' পাউন্ড হেরে যায় সে। গ্রীষ্মকাল এসে যাচ্ছে। লিংকনের রেস নিয়ে ভীষণ মানসিক যন্ত্রণায় তার দিন কাটে। কিন্তু লিংকনের বেলাতেও সে আগেভাগে মন থেকে কিছুই জানতে পারে না। এখানেও পাঁচশ' পাউন্ড হেরে যায়। তার অদ্ভুত আচরণ আর উদভ্রান্ত চাহনি দেখলে মনে হয় যেন তার ভেতরে একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে।

"বাদ দে না, ভাগ্নে! এসব নিয়ে আর মাথা ঘামাস না তো!" অস্কার মামা পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু মামার কোনো কথাই যেন ছেলেটির কানে ঠিকমতো পৌঁছায় না।

"ডার্বির রেসের ফল আমাকে জানতেই হবে! জানতেই হবে!" ঘুরেফিরে সেই এক কথাই বারবার বলে যায় সে। তার বড় বড় নীল চোখ যেন জ্বলছে—এ যেন এক উন্মাদের দৃষ্টি।

তার এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা একসময় মায়ের নজরে পড়ে।

"তুই বরং ক'টা দিন সাগরপাড় থেকে একটু বেড়িয়ে আয়। এখন এভাবে ঘরে বসে না থেকে বেড়াতে গেলেই বরং তোর বেশি ভালো লাগবে, তাই না? আমার তো মনে হয় গেলেই ভালো করবি তুই," বলতে বলতে মা চিন্তিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মায়ের মন তার জন্য ভারী হয়ে আসে।

ছেলেটি তার রহস্যময় নীল চোখদু'টি মেলে তাকায়।

সে বলে, "ডার্বির রেসের আগে আমি কিছুতেই যেতে পারব না, মা! কিছুতেই না!" ছেলের মুখে 'না' শুনে মায়ের গলা ধরে এলো। মা বলে, "কেন রে? কেন যাবি না? চাইলে সাগর দেখা শেষেও তোর অস্কার মামার সাথে রেস দেখতে যেতে পারবি। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে তোর কাজ নেই। তাছাড়া আমি খেয়াল করেছি তুই এসব রেস নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামাচ্ছিস। এ তো মোটেও ভালো লক্ষণ না। আমার বাপের বাড়িতে সবার জুয়ার নেশা। আর এই নেশা যে কতটা ক্ষতি করেছে তা বড় না হয়ে বুঝতে পারবি না। অনেক ক্ষতি করেছে। ওই ব্যাসেটকে এবার বিদায় করতে হবে। তোর অস্কার মামাকেও বলে দেব, তোর মাথা থেকে রেসের ভূত নামার আগে যেন তোকে আর এসব ছাইপাঁশ গল্প না বলে। এবার যা, সাগরপাড় থেকে ঘুরে আয়। আর মাথা থেকেও এসব ঝেড়ে ফেল। তোর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে!"

"তুমি যা বলবে তাই করব, মা। শুধু 'ডার্বি'র রেসের আগে আমাকে এখান থেকে কোথাও যেতে বলো না," ছেলে বলে।

"এখান থেকে মানে? এই বাড়ি থেকে?"

"হ্যাঁ," ছেলেটি একদৃষ্টে মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দেয়।

"অদ্ভুত ছেলে তো তুই। আচ্ছা, এই বাড়ি নিয়ে তোর হঠাৎ এত মাথাব্যথা কিসের? এ বাড়ি যে তোর এত প্রিয় জানতাম না তো।"

ছেলেটি নীরবে অপলক চেয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। তার গোপন কথাটির মাঝেও আরেকটি গোপন কথা লুকিয়ে আছে যার কথা সে কারো কাছেই প্রকাশ করেনি, এমনকি ব্যাসেট বা অস্কার মামার কাছেও না।

মা কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্তভাবে অন্ধকার মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, "আচ্ছা, ঠিক আছে! তোর মন না চাইলে ডার্বির রেসের আগে সাগরপাড়ে যেতে হবে না। কিন্তু আমাকে কথা দে, এসব ভেবে ভেবে আর তুই মাথা খারাপ করবি না। কথা দে, ওসব রেস-টেস নিয়ে আর এত বেশি মাথা ঘামাবি না।"

"আরে না, আমি আর ওসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাব না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, মা। তোমার জায়গায় হলে আমিও নিশ্চিন্তে থাকতাম," ছেলেটি সহজ গলায় বলে ওঠে।

"তুই আমার জায়গায় আর আমি তোর জায়গায় হলে যে কী হতো তাই ভাবি," মা বলে।

"কিন্তু মা, তোমার আসলেই চিন্তার কোনো কারণ নেই," ছেলে আবারও বলে।

"শুনে বড়ই খুশি হলাম," মা ক্লান্ত স্বরে জবাব দেয়।

"তুমি খুশি হতেই পারো, মা। মানে তোমার জেনে রাখা ভালো যে তুমি সত্যিই নিশ্চিন্তে থাকতে পারো," ছেলে খুব জোর দিয়ে বলে।

"তাই বুঝি? তাহলে ভেবে দেখব সত্যিই নিশ্চিন্ত হতে পারি কি না," মা বলে।

পলের গোপনতম কথাটি আসলে তার সেই কাঠের ঘোড়া, যে ঘোড়ার নির্দিষ্ট কোনো নাম নেই। একটু বড় হয়ে যাওয়ায় সে এখন আয়ার নজরদারি থেকে মুক্ত। তাই কাঠের এই খেলনা ঘোড়াটিকে সে খেলাঘর থেকে সরিয়ে এনে চিলেকোঠায় তার শোবার ঘরে রেখেছে।

"তোর কি এখনো এই কাঠের ঘোড়ায় চড়ার বয়স আছে?" মা আপত্তি করেছিল।

"দেখো মা, সত্যিকারের ঘোড়া যতদিন না পাচ্ছি ততদিন না হয় এই ঘোড়াতেই চড়লাম," ছেলের খামখেয়ালী জবাব এলো।

"এই ঘোড়ার সাথে খেলতে সত্যিই তোর ভালো লাগে?"

"হ্যাঁ মা, এই ঘোড়া খুব ভালো। এর সাথে খেলতে আমার খুব ভালো লাগে।"

আর এভাবেই জীর্ণশীর্ণ ঘোড়াটি স্থির, উদ্ধতভঙ্গিতে ছেলেটির ঘরেই নিজের জায়গা করে নিল।

'ডার্বি'র রেসের দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে আর ছেলেটির অস্থিরতা বেড়েই চলে। কেউ কিছু বললে যেন শুনতেই পায় না। শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে, চোখের দৃষ্টিও উদভ্রান্ত। ছেলের চিন্তায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে মায়ের হাত পা আচমকা জমে আসে। একরাশ দুশ্চিন্তা হঠাৎ এসে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রতিবারই প্রায় আধ ঘন্টা যাবৎ এমন লাগে তার। তখন খুব ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে দেখে আসতে যে তার ছেলেটি নিরাপদে আছে কিনা।

ডার্বির রেসের দু'দিন আগের কথা। মা সেই রাতে শহরে গেল জমকালো এক অনুষ্ঠানের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। সেখানে হঠাৎ তার নাড়ি ছেঁড়া ধন—তার প্রথম সন্তানের জন্য সেই দুশ্চিন্তার অনুভূতিটি এমনভাবে তার সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে ফেলে যে ঠিকমতো কথা বলতেও তার কষ্ট হয়। সে প্রাণপণে

এমন দুর্ভাবনা তার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় কারণ তার সাধারণ বিবেচনা অনুযায়ী এমন আশঙ্কা নিতান্তই ভিত্তিহীন। কিন্তু এ যাতনা এতটাই ভয়াবহ যে নাচের আসর ছেড়ে সে দ্রুত ছুটে যায় টেলিফোনে বাড়ির খবর নিতে। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার আয়া এত রাতে ফোন পেয়ে ভীষণ অবাক হয়, একেবারে চমকে ওঠে।

"ছেলেমেয়েরা সব ঠিক আছে তো, মিস উইল্মট?"

"জ্বী ম্যাডাম, তারা সব ঠিকই আছে।"

"আর তোমাদের ছোট সাহেব? সে ঠিক আছে তো?"

"সে তো লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমুতে চলে গেল। ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসব?"

"না, না, ঠিক আছে। যেতে হবে না। আজ আমরা আগে আগেই ফিরব। তোমাকে আর আমাদের জন্য জেগে বসে থাকতে হবে না।" পলের মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আয়াকে নিষেধ করে দেয়। সে তার ছেলের ব্যক্তিসাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করতে চায় না।

"জ্বী আচ্ছা, ম্যাডাম" আয়া বলে।

পলের বাবা মা যখন গাড়ি করে বাড়ি ঢোকে তখন ঘড়িতে রাত একটা বাজে। চারিদিকে সুনশান নীরবতা। পলের মা ঘরে গিয়ে তার সাদা পশমি ওভারকোটটি আলগোছে খুলে ফেলে একটু হালকা হয়। কাজের মেয়েকে আগেই বলে রেখেছিল যেন তার জন্য জেগে না থাকে। একতলা থেকে পলের বাবার আওয়াজ পাওয়া যায়, সেই সাথে হুইস্কির গ্লাসের টুংটাং শব্দ।

ঠিক সেই সময় অদ্ভুত সেই দুশ্চিন্তা আবারও তার মনকে ঘিরে ধরে। তাই সে চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যায় ছেলের চিলেকোঠার ঘরের দিকে। তিনতলার বারান্দা দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে সে। একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে না? কিসের আওয়াজ এটা?

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পাতে সে। শুনতে শুনতে তার শরীর যেন অবশ হয়ে এলো। ভেতরে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ—ভারি অথচ চাপা। তার হৃৎপিণ্ডের গতি যেন থেমে গেল। আওয়াজটা চাপা হলেও প্রবল আর দ্রুতগামী। বিরাট কোনো বস্তু যেন নিঃশব্দে অথচ প্রবলবেগে নড়ে চলেছে। সেটা কী? ও ঈশ্বর, কী সেটা? তাকে জানতেই হবে। তার মন বলছে এই শব্দ তার চেনা, সে জানে কী নড়ছে।

তবু সে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। কিছুতেই যেন বলে বোঝাতে পারে না সে। আর সেই জিনিসটা পাগলের মতো নড়ে চলে, নড়তেই থাকে।

ভয়ে আতঙ্কে প্রায় জমে গিয়ে সে আস্তে আস্তে দরজার হাতল ঘোরায়।

ঘর অন্ধকার। তবু আবছা ছায়ায় আর অস্ফুট শব্দে বোঝা যায় যে জানালার পাশে কিছু একটা প্রবল বেগে অনবরত সামনে পেছনে দুলে চলেছে। বিস্ময়ে আর ভয়ে তার চোখ দু'টো ছানাবড়া।

আচমকা সে বাতি জ্বেলে দেখতে পায় তার ছেলে একটি সবুজ পায়জামা পরে পাগলের মতো কাঠের ঘোড়ায় বসে দুলে চলেছে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দেখা গেল ছেলে দুর্দান্ত প্রতাপে কাঠের ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে আর তার স্বর্ণকেশী মা হালকা সবুজ পোশাক আর স্ফটিকের গয়না পরে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

"পল! তুই এটা কী করছিস?" মা চিৎকার করে ডাকে।

"'মালাবার' জিতবে! 'মালাবার' জিতবে!" ছেলে অদ্ভুত তেজে চিৎকার করতে থাকে।

ছেলেটির জ্বলন্ত চোখ দু'টি কেবল ক্ষণিকের জন্য মায়ের দিকে অর্থহীন দৃষ্টি হেনে থেমে যায়। তারপর সে দড়াম করে আছড়ে পড়ে মেঝেতে। মায়ের হৃদয়ে যেন তার বেদনাপীড়িত মাতৃত্বের এক প্লাবন বয়ে যায়। সে ছুটে যায় তার ছেলেকে ধরে তুলতে।

কিন্তু ছেলেটি তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর অজ্ঞান হয়েই সে অনেকটা বিকারগ্রস্তের মতো পড়ে থাকে। ছেলেটি বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে কথা বলে। মা তখন ছেলের পাশে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

"'মালাবার'! 'মালাবার' জিতবে! ব্যাসেট, ব্যাসেট, আমি জেনে গেছি! 'মালাবার' জিতবে!" এভাবে চিৎকার করতে করতে ছেলেটি বারবার বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। উঠে গিয়ে সেই কাঠের ঘোড়া হাঁকাতে চায় সে, যার পিঠে চেপে সে ভবিষ্যতের সন্ধান পায়।

"'মালাবার' মানে কী?" ছেলেটির কঠিন-হৃদয় মা জানতে চায়।

"জানি না," তার বাবা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে জবাব দেয়।

"'মালাবার' মনে কী?" মা এবার তার ভাই অস্কারকে জিজ্ঞেস করে।

" 'মালাবার' ডার্বির রেসের একটা ঘোড়ার নাম," ভাইয়ের জবাব এলো।

কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অস্কার ক্রেসওয়েল ব্যাসেটের সাথে আলোচনা করে। তারপর 'মালাবার'-এর নামে হাজার পাউন্ড বাজি ধরে আসে—জিতলে বাজির টাকার চৌদ্দ গুণ উঠে আসবে।

অসুখের তৃতীয় দিনে রোগীর অবস্থা আরো গুরুতর হয়। সবাই অপেক্ষা করতে থাকে কখন অবস্থার একটু পরিবর্তন হয়। ছেলেটির এক মাথা কোঁকড়া চুল। বালিশে মাথা রেখে অনবরত এপাশ ওপাশ করে চলেছে। তার না হয় ঘুম, না ফেরে জ্ঞান। তার নীল চোখ দুটি যেন একজোড়া নীল পাথর। মা তার ঠায় বসে থাকে। মা ভেবেছিল নিজের হৃদয় বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, কিন্তু সেই হৃদয় আসলে পাথরে পরিণত হয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আর অস্কার ক্রেসওয়েল আসে না। কিন্তু ব্যাসেট রোগীর ঘরে অনুমতি চেয়ে পাঠায়। সে কিছুক্ষণ, শুধুমাত্র অল্প কিছুক্ষণের জন্য রোগীর ঘরে একটু আসতে চায়। ব্যাসেটের অনধিকারচর্চায় পলের মা খুব রেগে গেলেও পরে কী ভেবে যেন রাজি হয়ে যায়। ছেলের অবস্থা সেই আগের মতোই। কে জানে, যদি ব্যাসেট এসে তার জ্ঞান ফেরাতে পারে।

ব্যাসেট মালি ছোটখাটো মানুষ। নাকের নিচে ছোট্ট এক টুকরো বাদামী গোঁফ। তার ছোট ছোট বাদামী চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। লোকটি পা টিপে টিপে ঘরের ভেতরে ঢোকে। তারপর পলের মাকে একটা সেলাম ঠুকে চুপিসারে রোগীর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোট ছোট চকচকে চোখ মেলে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ছটফট করতে থাকা মুমূর্ষু ছেলেটির দিকে।

ব্যাসেট ফিসফিস করে বলে, "ছোট সাহেব!, ছোট সাহেব! 'মালাবার' জিতে গেছে, একেবারে বাজিমাৎ। তোমার কথামতোই কাজ করেছি। তুমি সত্তর হাজার পাউন্ডেরও বেশি জিতেছো; এখন তুমি আশি হাজার পাউন্ডের মালিক। 'মালাবার' বাজিমাৎ করেছে, ছোট সাহেব!"

"'মালাবার'! 'মালাবার'! আমি কি 'মালাবার'-এর কথাই বলেছিলাম, মা? 'মালাবার'? মা, তোমার কি মনে হয় আমার ভাগ্য আছে? আগেই জানতাম 'মালাবার' জিতবে, তাই না? আশি হাজার পাউন্ডেরও বেশি! এটা তো ভাগ্যের কথা, তাই না মা? আশি হাজার পাউন্ডেরও বেশি! আমি

জানতাম, সব জানতাম! 'মালাবার'-এর বাজিমাৎ! মন থেকে সায় পাওয়ার আগ পর্যন্ত যদি ঘোড়ার পিঠে দুলতেই থাকি, তবে তোমায় বলে দিচ্ছি ব্যাসেট, যতদূর খুশি তত দূর যাওয়া যায়। তোমার সাধ্যমত বাজি ধরেছিলে তো, ব্যাসেট?"

"হাজার পাউন্ড ধরেছিলাম, ছোট সাহেব!"

"কখনো তোমাকে বলা হয়নি মা, একবার যদি ঘোড়ায় চড়ে দুলতে দুলতে সায় পেয়ে যাই, তবে নিশ্চিন্ত... একেবারে নিশ্চিন্ত। মাগো, তোমায় কি কখনো বলেছি, মা? আমার ভাগ্য আছে!"

" না রে, কখনো বলিসনি", মা বলে।

সে রাতেই ছেলেটি মারা গেল।

ছেলের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মা শুনতে পেল তার ভাই তাকে উদ্দেশ্য করে বলছে—"সত্যি বলছি রে হেস্টার, একদিকে তোর লাভের খাতায় উঠল আশি হাজার পাউন্ড, আর অন্য দিকে লোকসানের খাতায় তোর এই হতভাগা ছেলেটা। হায়রে অভাগা, যে দুনিয়ায় জিততে গেলে এভাবে খেলনা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটতে হয়, সেই দুনিয়া ছেড়ে পালিয়ে বড় বাঁচা বেঁচে গেছে বেচারা।"

খবরটা কাগজে পড়ি, সাবওয়েতে, কাজে যাবার পথে। আমি পড়ি তবে তখন তা আমার মোটেই বিশ্বাস হয়নি, তাই আবারও পড়ে দেখি। তারপর সম্ভবত, আমি লেখাটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, নিউজপ্রিন্ট থেকে বানান করে ওর নামটা উচ্চারণ করি, বানান করে লেখাটা পড়ি। সাবওয়ের গাড়ির দোদুল্যমান আলোতে আমি খবরটার দিকে তাকিয়ে থাকি, এবং আশপাশের লোকেদের মুখ আর শরীরের ভিড়, আর আমার নিজের চেহারাটা অন্ধকারের মাঝে বন্দী হয়ে থাকে, বাইরে থেকে যা প্রায় চিৎকার করে উঠছিল।

কথাটা বিশ্বাস করবার মতো নয় আর আমি নিজেকেও সেটা বলতে থাকি, একই সঙ্গে যেভাবে আমি এতে সন্দেহও করতে পারছিলাম না। আমি আঁতকে উঠি, সনির জন্য ভয় হতে থাকে। সে আবারও আমার কাছে বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। আমার পেটের ভেতরে আস্ত একটা জমাট বরফ আটকে থাকে আর দিনভর সেটা একটু একটু করে ধীরে ধীরে গলতে থাকে, যখন আমি আমার বীজগণিত ক্লাস নিচ্ছিলাম। বরফটা ছিল বিশেষ ধরনের। সেটা গলে গলে, টিপ টিপ করে তার বরফ গলা জলের সবটা আমার ধমনীর ওপর নিচে করছিল তবে কখনোই সেটা একেবারে হারিয়ে যায়নি। কখনো সেটা কঠিন হচ্ছিল এবং গলা থেকে বেরিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত মনে হচ্ছিল এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে আসে বা চিৎকার করে উঠি। এমন একটা মুহূর্তে সেটা ঘটছিল যখন প্রতিবারই সনির এমন বিশেষ একটা কথা বা সে করেছিল এমন একটা জিনিস মনে পড়ে যাচ্ছিল।

সিঁড়ি থেকে যখন নেমে আসি তখন উঠান জুড়ে শুনশান নীরবতা। দেখি সেই ছেলেটা একটা দরজার কাছে ছায়ার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ওর নাম ধরে ডাকতে যাব। কিন্তু তখনই দেখি ওটা আসলে সনি নয়, তবে পরিচিত বলেই মনে হচ্ছিল, ছেলেটা আমাদের ব্লকের আশপাশেই থাকে। ও সনির বন্ধু। ও কখনোই আমার ছাত্র ছিল না, আমার ছাত্র হবার বয়সও ওর হয়নি, তবে যাই হোক আমি ওকে একেবারেই পছন্দ করি না। আর এখন একটা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হবার পরও, ও সেই আগের ব্লকেই রয়ে গেছে, এখনো রাস্তার কোণাকাঞ্চিতে সময় কাটায়, সব সময় উঁচু আর নোংরা দিকটাতে। প্রায়ই আমি বিভিন্ন সময় ওর কাছ দিয়ে যাই আর ও প্রায়ই আমার কাছে এক কোয়াটার বা পঞ্চাশ সেন্ট চায়। সব সময়ই ও উপযুক্ত কোনো না কোনো ছুতাও তৈরি করে আর আমিও সবসময় ওকে তা দেই। ঠিক জানি না কেন

যখন ও আমার ক্লাসের ছেলেদের মতো প্রায় বালক বয়সী হয়ে উঠছিল তখন ওর চেহারাটাই ছিল অনেক উজ্জ্বল আর খোলামেলা, তার অনেকটাই ছিল তামাটে; এবং ওর ছিল চমৎকার দ্বিধাহীন এক জোড়া বাদামি চোখ আর, তাতে ছিল প্রচণ্ড অমায়িকতা আর একান্ততা। আমি অবাক হই ও দেখতে এখন কতটা আলাদা। হিরোইন ফেরিকরা আর ব্যবহারের কারণে, গতকাল সন্ধ্যায় এক ঝটিকা অভিযানে, ওকে গ্রেপ্তার করা হয়, ডাওন-টাওনের এক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে।

আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না: কিন্তু এর দ্বারা আমি কী বোঝাতে চাইছি আমি কি আমার ভেতরে কোথাও এর জন্যে কোনো জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপারটা আমি নিজের বাইরে রাখি। আমি জানতে চাইনি। আমি সন্দিহান ছিলাম, তবে আমি সেসবের কোনো নাম দেইনি, আমি বিষয়টাকে সরিয়ে রাখি। নিজেকে আমি বলি যে সনি বেপরোয়া ছিল, তবে সে দিশেহারা ছিল না। আর সব সময়ই ও খুব ভালো একটা ছেলে ছিল, কখনোই ও রূঢ় বা দুষ্ট বা অসম্মানজনক কিছু করেনি, যেমনটা আর সব শিশুরা হয়ে থাকে, খুব চটপটে, খুব চটপটে, বিশেষত হারলেমের।

আমি বিশ্বাস করতে চাই না আমার ভাইকে যখন নিচে গিয়ে যেতে দেখেছি তখন সে প্রতিবার নিঃশেষ হয়ে ফিরে এসেছে, সেসময় তার মুখের সব আলো একেবারে নিভে যেত, এরইমধ্যে এমন অবস্থায় আমি আরো অনেককেই দেখেছি। যদিও যা ঘটার তা ঘটে গেছে আর আমি এখানে একপাল ছেলেদের মাঝে বীজগণিত কপচাচ্ছি, যতদূর জানি এদের প্রত্যেকেই, প্রতিবার তাদের মাথার ভেতরে উঁকি দিতে সুই নিয়ে থাকে। হতে পারে বীজগণিত যা পারে তার ক্ষমতা এর চেয়ে অনেক বেশি।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এই প্রথমবারের মতো সনি হেরোইন নিয়েছে, সে এখানকার এই ছেলেগুলোর থেকে বয়সে খুব একটা বড় নয়। এই ছেলেগুলো, এখন, তখনকার আমাদের মতোই জীবন যাপন করছে, তবে ওরা খুবই দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে উঠছে আর ওদের মাথা ওদের সত্যিকার সম্ভাবনার চেয়ে

নিচু ছাদের সঙ্গে বারবার আচমকা ধাক্কা খাচ্ছে। ওরা ক্রোধে ফুঁসে আছে। ওদের সবারই দুটা অন্ধকার সম্বন্ধে জানা, ওদের জীবনের অন্ধকার, যা এখন ওদের খুব কাছাকাছি, আর সিনেমার অন্ধকার, যা তাদের অপর সেই অন্ধকারের প্রতি অন্ধ করে রাখে, এবং যার প্রতি তারা এখন, খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাবে, যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি কল্পনাবিলাসী হয়ে আরো বেশি একা হয়ে পড়ে।

শেষ ঘন্টাটা বেজে উঠলে, শেষের ক্লাসটা শেষ হলে পর, আমি হাফ ছেড়ে বাঁচি। মনে হচ্ছিল সারাটাক্ষণ আমি এটাই আঁকড়ে ছিলাম। আমার কাপড় চোপড় ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গিয়েছিল— আমাকে দেখে বোধহয় তখন মনে হচ্ছিল আমি সব পোশাক পরিচ্ছদ পরে সারাটা বিকেল বাষ্পস্নানে বসে রয়েছি। অনেকক্ষণ ধরে আমি ক্লাসরুমে একা বসে থাকি। বাইরে, সিঁড়ির নিচে, ছেলেদের শোরগোল, ভিড় আর হাসাহাসি টের পাচ্ছিলাম। সম্ভবত ওদের হাসি এই প্রথমবার আমাকে অসাড় করে তোলে। এটা সেই আনন্দের হাসি নয়—স্রষ্টাই জানেন কেন—যেমনটা শিশুদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। সেই হাসি ছিল উপহাস এবং কূপমণ্ডূক গ্রাম্য সংকীর্ণতার, এর উদ্দেশ্যই ছিল কারো ওপর কালিমা লেপন করা। এটা ছিল মোহমুক্তির, এবং এর মাঝে, তাদের অভিশাপের অধিকারও লুকিয়ে ছিল। সম্ভবত আমি ওদের শুনতে পাচ্ছিলাম তার কারণ সেসময় আমি আমার ভাইয়ের কথা ভাবছিলাম। এবং আমার নিজের কথাও।

একটা ছেলে কোন একটা সুরে শিস বাজাচ্ছিল, একই সঙ্গে তা ছিল খুবই জটিল আর সরলও, সেটা তার মুখ থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসছিল যেন সে সত্যিই একটা পাখি, আর শব্দটা ছিল খুবই শান্ত আর সেটা তার সমস্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, উৎফুল্ল বাতাসে, আর সব শোরগোলের মাঝে কেবল তার নিজের অস্তিত্বই জানান দিয়ে যাচ্ছিল।

আমি উঠে দাঁড়াই এবং হেঁটে হেঁটে জানালার কাছে যাই এবং নিচে উঠানের দিকে তাকাই। তখন সবে বসন্তের শুরু এবং ছেলেদের মাঝে প্রাণশক্তি জাগতে শুরু করেছে। মাঝে মধ্যেই ওদের মাঝ দিয়ে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা হেঁটে চলে যাচ্ছে, অনেকটা দ্রুত ভঙ্গিমায়, যেন তাদের যে কেউ সেই উঠানখানা কোনো রকমে পেরুতে পারলেই হলো, যাতে সেইসব ছেলেদের নিজেদের দৃষ্টি আর মনের সীমানার বাইরে রাখতে পারলেই হয়। আমি আমার জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করি। ভাবতে থাকি ভালো হয় যদি বাড়ি গিয়ে ইসাবেলের সঙ্গে মন খুলে দুটা কথা বলি।

সিঁড়ি থেকে যখন নেমে আসি তখন উঠান জুড়ে শুনশান নীরবতা। দেখি সেই ছেলেটা একটা দরজার কাছে ছায়ার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ওর নাম ধরে ডাকতে যাব। কিন্তু তখনই দেখি ওটা আসলে সনি নয়, তবে পরিচিত বলেই মনে হচ্ছিল, ছেলেটা আমাদের ব্লকের আশপাশেই থাকে। ও

সনির বন্ধু। ও কখনোই আমার ছাত্র ছিল না, আমার ছাত্র হবার বয়সও ওর হয়নি, তবে যাই হোক আমি ওকে একেবারেই পছন্দ করি না। আর এখন একটা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হবার পরও, ও সেই আগের ব্লকেই রয়ে গেছে, এখনো রাস্তার কোণাকাঞ্চিতে সময় কাটায়, সব সময় উঁচু আর নোংরা দিকটাতে। প্রায়ই আমি বিভিন্ন সময় ওর কাছ দিয়ে যাই আর ও প্রায়ই আমার কাছে এক কোয়াটার বা পঞ্চাশ সেন্ট চায়। সব সময়ই ও উপযুক্ত কোনো না কোনো ছুতাও তৈরি করে আর আমিও সবসময় ওকে তা দেই। ঠিক জানি না কেন।

কিন্তু এখন, হঠাৎই ওকে, আমি ঘৃণা করতে শুরু করি। যেভাবে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে তা সহ্য করতে পারি না, খানিকটা কুকুরের মতো, খানিকটা ধূর্ত ছেলের মতো। ওকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, স্কুলের আঙ্গিনায় ও কী করছে।

আমার দিকে পা টেনে টেনে খানিকটা এগিয়ে আসে এবং বলে, "আমি দেখেছি আপনি কাগজটা পেয়েছেন। তাই এরই মধ্যে ব্যাপারটা জেনে গেছেন।"

"তুমি কি সনির কথা বোঝাচ্ছো? হ্যাঁ আমি এরই মধ্যে খবরটা জেনেছি। ওরা তোমাকে ধরেনি কেন?"

ও দাঁত বের করে একগাল হাসে। এতে ওকে আরো বীভৎস দেখায় এবং মনে করিয়ে দেয় কোন দিক দিয়ে ও দেখতে শিশুসুলভ। "আমি ওখানে ছিলাম না। আমি ওসব লোক থেকে দূরে থাকি।"

"তোমার জন্য ভালো।" আমি ওকে একটা সিগারেট সাধি এবং ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ওকে দেখতে থাকি। "আপনি নিচে নেমে এদ্দুর হেঁটে আসলেন কেবল আমাকে সনির কথা জিজ্ঞেস করতে?"

"ঠিক ধরেছো।"

ও মৃদু মাথা দোলায় আর ওর চোখ দুটা তখন অবাক দেখায়, যেন তারা এখন এদিক দিয়েই যাচ্ছে। সূর্যের উজ্জ্বল আভায় ওর ভেজা কালো ত্বকটাকে নিষ্প্রাণ লাগে, চোখ দুটা হলদে এবং পাক খাওয়া চুলগুলোকে ময়লা দেখায়। ওকে খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত বলেই মনে হয়। আমি ওর কাছ থেকে সামান্য পিছিয়ে আসি আর বলি, "ঠিক আছে। কিন্তু আমি এরই মধ্যে এ ব্যাপারে জেনে গেছি আর আমাকে এখন বাড়ি যেতে হচ্ছে।"

"আমি আপনার সঙ্গে কিছুদূর হাঁটব"—সে বলে। আমরা হাঁটতে থাকি। অঙ্গনে তখনও কয়েক জোড়া বাচ্চা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ওদের একজন আমাকে শুভরাত্রি বলে আমার পাশের ছেলেটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

"আপনি কী করতে চাইছেন?" সে আমাকে জিজ্ঞেস করে। "আমি প্রাক্তন সনির কথা বলছি?"

"দেখো সনির সঙ্গে বছর খানেক ধরে আমার কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই, আমি নিশ্চিত না আমি ওর জন্য কিছু করব। সে যাই হোক, আমি আসলে তেমন কী করতে পারি?"

"তা ঠিক"—ও দ্রুত বলে ওঠে। "আপনি কিছুই করতে পারেন না, সনি কোনো সাহায্য পেতে পারে না, আমার ধারণা।"

আমি একথাই ভাবছিলাম আর তাই আমার কাছে মনে হতে থাকে একথা বলার কোনো অধিকার ওর নেই।

"সনিকে আমার অদ্ভুত মনে হয়, তবু"—সে বলতে থাকে, আজব একটা ভঙ্গিতে কথা বলে, কথা বলার সময় এমনভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে—"আমি মনে করি সনি খুবই বুদ্ধিমান একটা ছেলে, আমি মনে করি ও এতই বুদ্ধিমান যে ওকে ঝুলানো সহজ হবে না।"

"আমার মনে হয় সে নিজেও এমনটাই ভাবে"—আমি স্পষ্ট ভাষায় বলি, "আর তাই ও ঝুলবে। এবং তোমার কী অবস্থা? তুমিও খুব পটু, আমি বাজি ধরতে রাজি।"

তারপর ও আমার দিকে সরাসরি তাকায়, কয়েক মুহূর্তের জন্য। "আমি মোটেই বুদ্ধিমান নই"—ও বলে, "যদি বুদ্ধিমানই হতাম তবে অনেক আগে থেকেই আমার হাতে একটা পিস্তল থাকত।"

"দেখো, আমাকে তোমার দুখের গল্প শোনাতে এসো না, যদি আমার কাছে থাকত, তাহলে তোমাকে একটা অবশ্যই দিতাম।" তারপর নিজেকে আমার অপরাধী মনে হতে থাকে—অপরাধী, সম্ভবত, কখনোই আমি ভাবিনি যে এই অসহায় জারজটারও নিজস্ব কোনো গল্প থাকতে পারে, সেটা অনেক কম দুখেরও হতে পারে, সে জন্য, এবং আমি দ্রুত জিজ্ঞেস করি, ওর এখন কী হবে?"

ও এর কোনো জবাব দেয় না। ও নিজের ভেতরে কোথাও আটকে ছিল। "মজার জিনিস"—ও বলে, আর ওর বলার ভঙ্গি থেকে আমরা দ্রুত ব্রুকলিন পৌঁছার ব্যাপারে আলাপ করতে থাকি, "সকালে যখন খবরের কাগজগুলো দেখি, তখন প্রথম যে প্রশ্নটা আমি নিজেকে করেছিলাম তা হলো আমার কি এ ব্যাপারে কিছু করার আছে। আমি খানিকটা দায়িত্ব অনুভব করি।"

আমি খুব সতর্ক হয়ে শুনতে থাকি। সাবওয়ে স্টেশনটা ছিল কোণার দিকেই, একেবারে আমাদের পাশেই, এবং আমি থামি। সেও থামে। আমরা তখন একটা বারের সামনে আর ও মাথা নিচু করে আঁড়চোখে সেটার ভেতরে উঁকি মারছিল, কিন্তু ও যাকে খুঁজছিল মনে হয় সে সেখানে ছিল না। জুকবক্সে সজোরে চমৎকার কিছু একটা বাজছে আর আমি বারের পেছনে জুকবক্সের কাছে নাচতে থাকা একটা মেয়েকে দেখি। আর ওর মুখটাও দেখি যেন হাসতে হাসতে কারো কথায় সারা দিচ্ছে, সেই সঙ্গে গানের সঙ্গে তাল রাখছে। ওর হাসির মাঝে যে কেউ একটা ছোট্ট মেয়েকে দেখতে পাবে, যার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে, যদিও তখনও সেই আধো-বেশ্যার সুন্দর মুখের আড়ালে আস্ত একটা নারী ছটফট করছে।

“আমি সনিকে কখনোই কিছু দেইনি”—সবশেষে ছেলেটা বলে, কিন্তু অনেক আগে আমি স্কুলের ভেতর ঢুকি, তখন সনি আমাকে জিজ্ঞেস করে কেমন লাগছে।” ও থামে, আমি ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না, বারমেইডের দিকে তাকিয়ে থাকি আর চত্তরটাকে কাঁপাচ্ছিল সেই গানটা মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করি। “আমি ওকে বলি এটা খুব ভালো লাগছে।” গানটা থামে, বারমেইডও বিরতি দেয়, আর আবারও গান বেজে ওঠার আগপর্যন্ত জুকবক্সের দিকে তাকিয়ে থাকে। “আবারও গান বেজে ওঠে।”

এর সবই আমাকে এমন একটা জায়গাতে নিয়ে যায় যেখানে আমি যেতে চাই না। নিশ্চিত জানতেও চাই না এতে কেমন লাগে। এটা সব কিছুকেই ভীতির দ্বারা আচ্ছন্ন করে, লোকেদের, এইসব ঘরবাড়ি, গানবাজনা, এই অন্ধকার, পারদরঙা বারমেইড সবাইকে; আর এই ভীতিই ওদের বাস্তবতা।

“এখন ওর কী হবে?” আমি আবারও জিজ্ঞেস করি।

“ওরা ওকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে এবং সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে।” ও মাথা ঝাঁকায়। “মনে হয় ও নিজেও ওর এই অভ্যাস ঝেঁড়ে ফেলবার কথা ভাববে। তারপর ওরা ওকে ছেড়ে দিবে”—নালার মধ্যে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ও ইশারা করে। “এই হলো ঘটনা।”

“এই হলো ঘটনা দিয়ে তুমি কী বোঝাতে চাইছো?”

কিন্তু আমি জানতাম ও কী বুঝিয়েছে।

“আমি বলতে চাইছি এমনই হবে।” ও মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায়। মুখের কোণ দুটা টেনে নিচের দিকে নামায়। “আপনি কি বুঝতে পারছেন না আমি কী বলতে চাইছি?” মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে।

“আমি কী করে জানব তুমি কী বোঝাতে চাইছো?” আমি একেবারে ফিসফিস করে কথাটা বলি, জানি না কেন।

“ঠিক”—বাতাসের দিকে মুখকরে ও বলে, “উনি কী করে জানবেন আমি কী বোঝাচ্ছি?” ও আবারও আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, ধৈর্যসহকারে আর শান্তভাবে, এবং আমি তবু বুঝতে পারি ও কাঁপছে, এমনভাবে কাঁপছে যেন এই বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। আমি আবারও গলার ভেতরে সেই বরফটা অনুভব করি, যে ভয়টা আমি সারাটা দুপুর অনুভব করে এসেছি; আর আবারও আমি বারমেইডের দিকে তাকিয়ে থাকি, মেয়েটা বারের ভেতরে চলাচল করছে, গ্লাস ধুচ্ছে, আর থেকে থেকে গান গাইছে। “শুনুন। ওরা ওকে ছেড়ে দেবে এবং তারপর আবারও সবকিছু আগের মতোই শুরু হবে। আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছি।”

“তুমি মনে কর—ওরা ওকে ছেড়ে দেবে। আর তারপর আবারও ও আগের মতোই কাজকারবার শুরু করে দেবে। তুমি কি মনে করো ও কখনোই অভ্যাসটা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। তুমি কি এটাই বোঝাতে চেয়েছো?”

“ঠিক তাই”—আনন্দের সঙ্গে ও বলে। “দেখতে পাচ্ছি আপনি আমার কথা ধরতে পেরেছেন।”

“আমাকে বলো”—শেষে আমি বলি, “ও আসলে কেন মরতে চায়? ও আসলে মরে যেতে চায়, ও নিজেকে মেরে ফেলছে ও কেন মরতে চায়?”

ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠোঁট চাটে। “ও মরতে চায় না। ও বাঁচতে চায়। কেউই মরতে চায় না, কখনোই।”

তারপর আমি ওকে জিজ্ঞেস করতে চাই—অনেক কিছু। সেসবের জবাব ওর কাছে নেই, বা যদি থেকেও থাকে, তাহলে আমি সেই জবাব সহ্য করতে পারতাম না। আমি হাঁটতে শুরু করি। “ভালো, ভাবি এর কোনোটাই আমাদের কাজ নয়।”

“এতে করে প্রাক্তন সনি’র প্রতি কঠোর হওয়া হবে”—ও বলে। আমরা সাবওয়ে স্টেশনে পৌঁছাই। “এটা আপনার স্টেশন?” ও জিজ্ঞেস করে। আমি মাথা নাড়াই। একধাপ নিচে নামি। “ধুর!” হঠাৎ ও বলে ওঠে। আমি ওপরে থাকা ওর দিকে তাকাই। আবারও দাঁত বের করে হাসছে। “ধুর যদি বাসায় সব টাকাকড়ি রেখে না আসতাম। আপনার কাছে কি এক ডলার হবে নাকি? এই কেবল দুদিনের জন্য।”

হঠাৎই আমার ভেতরে কিছু একটা ঢুকে পড়ে এবং উপচে পড়ার হুঁশিয়ারি দিতে থাকে। আমি আর ওকে ঘৃণা করতে পারি না। আমার মনে হতে থাকে আবারও আমি ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করে দিব।

“নিশ্চয়”—আমি বলি। “ভয়ের কিছু নেই।” আমি আমার ওয়ালেটের ভেতরে তাকাই আর দেখি সেখানে কোনো এক ডলারের নোট নেই, কেবল একটা পাঁচ ডলারের নোট। “এইতো”—আমি বলি। “এইটা রাখো?”

ও নোটটার দিকে তাকায় না—ও সেটার দিকে তাকাতে চায় না। ওর মুখজুড়ে কেমন যেন একটা ভয়াবহ আবহ ভর করে, যেন সে বিলের নম্বরটা নিজের এবং আমার কাছ থেকে গোপন করতে চাইছে। “ধন্যবাদ।” ও বলে, এবং তারপর ও আমাকে বিদায় দেবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। সনিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। হয়ত আমি ওকে লিখব বা কিছু একটা পাঠাব।”

“অবশ্যই”—আমি বলি। “তুমি সেটা কোরো। যতদূর পারো।”

“আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে”—ও বলে। আমি পা ফেলে নিচে নামতে শুরু করি।

আমরা ১১০তম স্ট্রিটে পৌঁছে লেনোক্স অ্যাভিনিউর দিকে যেতে থাকি। আর এই অ্যাভিনিউটা আমার কাছে আজীবনই পরিচিত। কিন্তু যেদিন থেকে সনি সমস্যায় আক্রান্ত হয় সেদিন থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছে এর প্রতিটি নিঃশ্বাসের মাঝে যেন কোনো এক অজানা ভীতি লুকিয়ে রয়েছে।

“আমরা প্রায় এসে গেছি”—সনি বলে।

“প্রায়।” এর বেশি কিছু বলতে আমরা দুজনেই অস্বস্তি বোধ করি। আমরা একটা হাউজিং প্রজেক্টে থাকি। খুব বেশি দিন হয়নি। তৈরির বেশ কয়েকদিন পর এটাকে একেবারে প্রথাবিরোধী নতুন বলে মনে হয়েছিল, এখন, অবশ্যই, এর একেবারেই জরাজীর্ণদশা। একে এখন সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ বলেই মনে হয়—

এবং দীর্ঘদিন আমি সনিকে কিছু লিখিনি বা কোনো কিছু পাঠাইনি। শেষে আমার ছোট মেয়ে মারা যাবার পর ওকে একটা চিঠি লিখি, জবাবে ও আমাকে একটা চিঠি লিখে, যেটা পড়ার পর নিজেকে পিতৃপরিচয়হীন বলে মনে হতে থাকে।

চিঠিতে ও এসব কথা লিখেছে:

প্রিয় ভাই,

তুমি জানো না তোমার কাছ থেকে শোনার আমার কত দরকার। আমি বহুবার তোমার কাছে লিখতে চেয়েছি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমি তোমাকে কতটা আঘাত দিয়েছি আর তাই তোমাকে লিখিনি। কিন্তু এখন আমি একজন পুরুষের মতোই বুঝতে পারছি যে কিনা কোনো গর্ত বেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, সত্যিকার গভীর এবং ভয়ঙ্কর কোনো গর্ত থেকে যে কেবল উপরকার বাইরের সূর্যটা দেখতে পাচ্ছে। আমাকে এখান থেকে বেরুতে হবে।

কী করে আমি এখানে এলাম সে সম্পর্কে খুব বেশি একটা আমি তোমাকে বলতে পারব না। আমি বোঝাতে চাইছি আমি জানি না ঠিক কিভাবে সেসব তোমাকে বলতে হবে। আমার ধারণা আমি কোনো একটা কিছুর ভয়ে ভীত বা আমি কিছু একটা থেকে পালাতে চাইছি আর তুমি ভালো করেই জানো যে মাথার দিক দিয়ে আমি কখনোই খুব একটা শক্ত নই (হাসি)। আমি খুশি যে মা বাবা মারা গেছেন এবং তারা দেখছেন না তাদের ছেলের ভাগ্যে কী ঘটেছে এবং আমি শপথ করে বলছি আমি যদি জানতাম কী করছি তাহলে আমি তোমাকে কখনোই এতটা আঘাত দিতাম না, তুমি এবং আরো অসংখ্য ভালো লোকেরা যারা আমার প্রতি সদয় ছিলেন এবং আমাকে বিশ্বাস করেছেন।

আমি তোমাকে এটা ভাবাতে চাই না যে সঙ্গীতজ্ঞ হতে গিয়েই আমি এমন কিছু একটা করেছি। এটা তার চাইতেও বেশি কিছু। অথবা হতে পারে এর চেয়ে কম কিছু। এখানে সোজাসাপ্টাভাবে কোনো কিছু মনে করতে পারছি না আর আমি ভাবতেও চাইছি না আমার কী হবে যখন আবারও বাইরে বের হব। কখনো কখনো আমি ভাবি আমি হয়ত ফুরিয়ে গেছি এবং কখনোই বাইরে বের হব না আর কখনো কখনো আমি ভাবি আমি হয়ত আবারও ফিরে আসব। আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, যদিও, আমি বরং এমনটা যাতে আর হতে না পারে সেই মতো আমার চিন্তাকে বইতে দিচ্ছি। কিন্তু ওরা সবাই এ কথাই বলে, তাই আমাকেও ওরা সেসব বলে। যদি আমি তোমাকে বলব কখন আমি নিউইয়র্কে আসব এবং তুমি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো, আমি নিশ্চিত তখন সেটা তুমি উপভোগ করবে। ইসাবেল আর বাচ্চাদের আমার ভালোবাসা দিবে এবং ছোট্ট গ্রোসি'র কথা যা জানলাম তাতে আমি যারপরনাই দুঃখিত। আশা করি আমি মায়ের মতো হতে পারব এবং বলব স্রষ্টাই করবেন, তবে আমি জানি না কখন আমার এমন মনে হবে যে সমস্যা এমন একটা জিনিস যা কখনোই শেষ হবার নয় এবং আমি জানি না এর জন্য স্রষ্টাকে দোষ দেয়া কতটা ভালো হবে। তবে হতে পারে এতে কিছু একটা ভালো হতেও পারে যদি তুমি তাতে বিশ্বাস রাখো।

তোমার ভাই,

সনি

এরপর আমি সবসময় ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করি এবং সাধ্যমতো যা পারি পাঠাতে থাকি এবং নিউইয়র্কে ফিরে আসার পর ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ওকে দেখার পর ভুলে যাওয়া অনেক কথা মনে পড়ে যায়। এ কারণেই আমি শুরু করি, শেষে, সনির ব্যাপারে অবাক হই, ভেতরে ভেতরে যে জীবন সে যাপন করছিল। এই জীবন, সেটা যাই হোক না কেন, ওকে বয়স্ক করে তোলে এবং সরু, এবং সেটা দূরবর্তী সেই স্থিরতার মাঝে ডুবে যাচ্ছিল যার ভেতর সব সময় ওর যাতায়াত ছিল। আমার সেই শিশু ভাইয়ের থেকে ওকে অনেক আলাদা মনে হচ্ছিল। যদিও, যখন হাসছিল, হাত মেলাচ্ছিল, যে শিশু ভাইটিকে আমি কখনোই চিনতে পারিনি সে তার ব্যক্তিগত জীবনের গভীর থেকে উঁকি মারছিল, ঠিক এমন একটা পশুর মতো যেটা আলোর হাতছানিতে প্রলুব্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করছে।

"কেমন যাচ্ছে দিনকাল?" আমাকে সে জিজ্ঞেস করে।

"ভালো। আর তোমার?"

"ভালোই তো।" ওর সারা মুখ জুড়ে হাসি ফুটে ওঠে। "খুব ভালো হলো তোমাকে আবারও দেখতে পেলাম।"

"তোমাকে দেখেও ভালো লাগছে।"

আমাদের মাঝে সাত বছরের ফারাক গভীর একটা খাদের মতো বিছিয়ে রয়েছে: খুব অবাক হতাম এই বছরগুলো যদি কখনো আমাদের মাঝে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করত। আমি মনে করতে চেষ্টা করছিলাম, আর এতে করে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হচ্ছিল, কারণ ও জন্মের সময় আমি ওখানেই ছিলাম, এবং ওর প্রথম কথাটা আমিই শুনি। যখন ও হাঁটতে শুরু করে, তখন ও মায়ের কাছ থেকে সোজা আমার কাছে আসত। পড়ে যাবার আগেই আমি ওকে ধরে ফেলি যেদিন ও এই পৃথিবীতে প্রথম পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে।

"ইসাবেলের কী খবর?"

"ভালো। ও তোমাকে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে আছে।"

"আর ছেলেরা?"

"ওরাও ভালোই আছে। ওরা ওদের কাকাকে দেখার জন্য উদ্বিগ্ন।"

“আরে, ঠিক করে বলো। তুমি জানো আমার কথা ওদের মনে নেই।”

“তুমি কি ছেলেমানুষী করছো? অবশ্যই তোমার কথা ওদের মনে আছে।”

ও আবারও দাঁত বের করে হাসে। আমরা একটা ট্যাক্সিতে উঠি। একে অপরকে বলার মতো আমাদের তখন আরো অনেক কথা রয়েছে, কেবল জানা নেই কোথা থেকে শুরু করতে হবে।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে, আমি জিজ্ঞেস করি, “তুমি কি এখনো ভারত যেতে চাও?”

ও হাসে। “তোমার এখনো সেটা মনে আছে। দোজখ, না। এখানকার ভারতীয়েরাই আমার জন্যে যথেষ্ট।”

“এরা নিজেদের মতো থাকতে পছন্দ করে”—আমি বলি।

আর ও আবারও হেসে ওঠে। “ওরা আসলে জানেই না ওরা কী করছে যখন এটা ছেড়ে দেয়।”

বছর খানেক আগে, যখন ও চোদ্দের কাছাকাছি, তখন ওর মাথায় ভারত যাবার ইচ্ছে চাড়া দিয়ে বসে। সে পাথরের ওপর উলঙ্গ হয়ে বসে থাকা লোকেদের ওপর বই পড়তে শুরু করে, যারা উলঙ্গ থাকে, সব ধরনের আবহাওয়াতে, যার বেশির ভাগই দুর্যোগপূর্ণ, প্রাকৃতিক, এবং তপ্ত বেলাভূমিতে খালি পায় হেঁটে বেড়ায় এবং এভাবেই প্রাজ্ঞতায় পৌঁছায়। আমি প্রায়ই বলতাম যে আমার কাছে মনে হয় ওরা যত তাড়াতাড়ি পারে প্রাজ্ঞতা থেকে দূরে সরে যায়। আমার মনে হয় এজন্যই ও আমার দিকে খানিকটা মাথা নিচু করে তাকাত।

“তুমি কি কিছু মনে করবে”—ও জিজ্ঞেস করে, “ড্রাইভারকে যদি পার্কের পাশ দিয়ে যেতে বলি? পশ্চিম পাশ দিয়ে—অনেক দিন ধরে আমি শহরটা দেখি না।”

“অবশ্যই না”—আমি বলি। ভয় ছিল বোধহয় ওকে নিয়ে মজা করছি আমার গলার স্বরে এমন কিছু একটা ফুটে উঠছে, তবে আমি আশা করছিলাম ও সেটা সেভাবে নেবে না।

তাই আমরা পার্কের সবুজ এবং পাথুরে অভিজাত নিষ্প্রাণ সারি সারি অভিজাত হোটেল, অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের মাঝ দিয়ে যেতে থাকি, আমাদের শিশুবেলা কাটানো প্রাণবন্ত সড়কের দিকে। এই সড়কগুলো একেবারেই বদলায়নি, যদিও এদের ঘিরে হাউজিং প্রজেক্ট গজিয়ে ওঠায় এখন এগুলোকে ফুটন্ত সাগর

ঘেরা পাথরের মতোই মনে হয়। যে বাড়ি ঘরের মাঝে আমরা বেড়ে উঠেছি তার বেশিরভাগই এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে, যে দোকানগুলো থেকে আমরা চুরি করতাম সেগুলোর মতোই, যে বেজমেন্টগুলোর ভেতর আমরা প্রথম সেক্স করতে চেষ্টা করি, যে ছাদগুলো থেকে আমরা টিনের ক্যান বা ইটের টুকরো ছুঁড়ে মারতাম। কিন্তু ভূমিদৃশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাড়িগুলো দেখতে এখনো আগেরই মতো, এক সময় এই বাড়িগুলোতে যেসব ছেলেদের দেখতে পেতাম এখনকার ছেলেরাও দেখতে ওদের মতোই, ওরাও আলোর আর বাতাসের আশায় পথে নেমে এসে নিজেদের দুর্যোগের পাকে ঘেরা অবস্থায় আবিষ্কার করে। কেউ কেউ সেই সব ফাঁদ থেকে পালাতে সক্ষম হয়। বেশির ভাগই পারে না। যারা পালায় তারা পেছনে কিছু না কিছু ফেলে রেখে যায়, যেমন পশুরা তাদের কেটে যাওয়া পা খানা ফাঁদের মধ্যে ফেলে পালায়। বলা যেতে পারে, সম্ভবত, যে আমিও পালিয়ে ছিলাম, অন্তত, আমি ছিলাম একজন স্কুল শিক্ষক, বা সনিও, সে হারলেমে বছর খানেক ধরে বসবাস করছে না। যদিও, ক্যাবটা সড়ক ধরে সামনের দিকে এগোচ্ছে বাইরে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, খুব দ্রুত চলার জন্যে, সড়কটা কালো কালো লোকে কালো হয়ে আছে, আর আমি সনির চেহারার লক্ষ্য করতে থাকি, আমার কাছে মনে হতে থাকে আমরা দুজনেই ক্যাবের পৃথক জানালা দিয়ে পেছনে ফেলে আসা সেই আগেকার আমাদের খুঁজছি। অভাব বোধ করা কোনো সদস্যের মুখোমুখি হওয়া সব সময়ই সময় ঘন্টাখানেকের সমস্যা।

আমরা ১১০তম স্ট্রিটে পৌঁছে লেনোক্স অ্যাভিনিউর দিকে যেতে থাকি। আর এই অ্যাভিনিউটা আমার কাছে আজীবনই পরিচিত। কিন্তু যেদিন থেকে সনি সমস্যায় আক্রান্ত হয় সেদিন থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছে এর প্রতিটি নিঃশ্বাসের মাঝে যেন কোনো এক অজানা ভীতি লুকিয়ে রয়েছে।

“আমরা প্রায় এসে গেছি”—সনি বলে।

“প্রায়।” এর বেশি কিছু বলতে আমরা দুজনেই অস্বস্তি বোধ করি। আমরা একটা হাউজিং প্রজেক্টে থাকি। খুব বেশি দিন হয়নি। তৈরির বেশ কয়েকদিন পর এটাকে একেবারে প্রথাবিরোধী নতুন বলে মনে হয়েছিল, এখন, অবশ্যই, এর একেবারেই জরাজীর্ণদশা। একে এখন সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ বলেই মনে হয়—খোদাই জানেন যেসব লোকেরা এর ভেতরে থাকেন তারা একে ব্যঙ্গাত্মক করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। চারপাশের নিয়মিত ঘাস তাদের জীবনটাকে সবুজ করার জন্য যথেষ্ট নয়, ঝোঁপগুলোকে কখনোই সড়কের সীমানা জুড়ে ধরে রাখা হয় না, এবং তারা সেটা জানে। বড় বড় জানালাসমূহ কাউকেই বোকা বানায় না, শূন্য থেকে স্থান তৈরি করার জন্য সেগুলো যথেষ্ট বড় নয়। এরা এই সব জানালা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না, বরং এর বদলে তারা টিভি দেখে। খেলার মাঠগুলো শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা যারা জেকস, বা স্কিপ রোপ, বা রোলার স্কেট, বা সুয়িং তথা দোলনা খেলে না। আমরা এমন একটা অংশ দিয়ে যাচ্ছি কারণ জায়গাটা আমি যেখানে পড়াই সেখান থেকে খুব একটা দূরে নয়, এবং এর অংশ বিশেষ শিশুদের জন্য বরাদ্দ; তবে সনি আর আমি যেখানে বেড়ে উঠেছি এখানকার ঘরবাড়ি অনেকটা সেখানকার মতো। একই ঘটনা ঘটছে, ওরাও সেই একই স্মৃতি বয়ে বেড়াবে। যখন আমি আর সনি ঘরে ঢুকতে যাই তখন আমার এমন

মনে হতে থাকে যেন আমি তাকে এই মাত্র বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসলাম যেখান থেকে সে পালাবার জন্য মরিয়া হয়ে ছিল।

সনি কখনোই বাচাল ছিল না। তাই আমি জানতাম না কেন আমি অতটা নিশ্চিত ছিলাম যে প্রথম রাতে খাবার পর সে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আকুল হয়ে ছিল। সব কিছু ভালোই চলছিল, বড় ছেলেটা ওকে মনে রেখেছে, ছোটটা ওকে পছন্দ করে, এবং সনি ওদের প্রত্যেকের জন্য কিছু একটা নিয়ে আসার কথা মনে রাখে; এবং ইসাবেল, যে কিনা সত্যিই আমার চেয়ে কাছের, খোলামেলা আর ওকে কম যন্ত্রণা করত, রাতের খাবারের সময় সে অনেক সমস্যা তৈরি করে এবং সনিকে দেখে সে সত্যিই অনেক খুশি হয়। আর ও সবসময় সনির সঙ্গে এমনভাবে মজা করত যা আমি কখনোই করতাম না। আবারও ওর হাসিখুশি দেখতে পেয়ে আর ওকে হাসতে শুনে এবং ওকে সনিকে হাসাতে দেখে খুবই ভালো লাগছে। মেয়েটা এমন ছিল না, বা যে করেই হোক দেখতে অন্তত খানিকটা অস্থির বা লাজুক ছিল। এখন সে এমনভাবে কথা বলছে যেন ওর কথা বলার মতো এমন কোনো বিষয়ই নেই যা এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে এবং সে সনির প্রথম অতীতটা ধরতে পারে, ক্ষীণ অনমনীয়তায়। এবং আমি স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই মেয়েটা সেখানে ছিল, কেননা আবারও আমাকে সেই বরফ শীতল ভয়টা পেয়ে বসে। আমি যা কিছুই করছি তা আমাকে আরো সজাগ করে তুলছিল বলে মনে হচ্ছিল, এবং যা কিছু বলছি তাতে কোনো প্রচ্ছন্ন মানে রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। মাদকের নেশা ছাড়াবার ব্যাপারে যা কিছু শুনেছি মনে করতে চেষ্টা করি এবং সনির মাঝে তার অস্তিত্ব খুঁজতে আমার বিশেষ কিছু করার থাকে না। বিদ্বেষ থেকে আমি এমনটা করিনি। আমি আমার ভাইয়ের মাঝে কিছু একটা খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিলাম। ও নিজে থেকে বলুক সে এখন নিরাপদ সেটা শোনার জন্য আমি মরিয়া হয়ে ছিলাম।

ও, হ্যাঁ। তোমার বাবা আর কখনোই পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। সেদিন থেকে নিশ্চিত না হবার পরও তবু সব সাদা লোককে সে তার ভাইয়ের হত্যাকারী মনে করছে যেহেতু সে এমনই একজন লোককে তার ভাইকে খুন করতে দেখেছে।”

সে থামে এবং নিজের রুমালটার দিকে তাকিয়ে থাকে আর চোখ মুছে আমার দিকে তাকায়।

“আমি তোমাকে এসব বলিনি”—তিনি বলেন, “যাতে কাউকে অযথা ভয়, কটু কথা বা ঘৃণা না করো। এখন তোমাকে কথাটা বললাম কারণ তোমারও একটা ভাই আছে। আর পৃথিবীটা মোটেই বদলে যায়নি।”

“নিরাপদ!”—আমার বাবা নিশ্চিত করে বলেছিলেন, অন্যদিকে মা বলেছিলেন কাছাকাছি অন্য কোথাও সরে যেতে যে জায়গাটা শিশুদের জন্য নিরাপদ হবে।

“নিরাপদ, দোযখ! বাচ্চাদের জন্য এমন কোনো নিরাপদ জায়গা কি আছে, না কারো জন্যই না।”

তিনি সব সময়ই এমন কথা বলতেন, তবে মুখে যতটা বলতেন বাস্তবে আসলে ততটা খারাপ ছিলেন না, এমনকি সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও, যেদিনটাতে তিনি মাতাল থাকতেন। ঘটনাক্রমে, তিনি সব সময়ই কিছু একটা খুঁজতেন ‘খানিকটা ভালো কিছু’—কিন্তু সেটা খুঁজে পাবার আগেই তিনি মারা যান। তিনি হঠাৎ করেই মারা যান, যুদ্ধের সময় মাতাল এক ছুটির দিনে, সনির বয়স তখন পনের। তার এবং সনির সম্পর্ক কখনোই অতটা ভালো ছিল না। আর এর আংশিক কারণ ছিল সনি ছিল তার বাবার চোখের মণি। এর কারণ ছিল তিনি সনিকে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং তিনি ওকে নিয়ে ভয় করতেন, তাই সব সময় ওর পেছনে লেগে থাকতেন। সনির পেছনে লেগে থাকাটা কোনো ভালো ফল বয়ে আনেনি। সনি তাই পিছিয়ে এসে, নিজের ভেতরে সেঁধিয়ে যায়, যেখানে তিনি পৌঁছতে পারেননি। তবে এর মূল কারণ ছিল যেটা তারা কখনোই বুঝে উঠতে পারেনি যে তারা ছিল হুবহু একই রকমের। ড্যাডি ছিল বিশাল আকারের এবং কর্কশ স্বভাবের এবং তিনি খুব জোরে কথা বলতেন, সনি ছিল এর বিপরীত, তবে তাদের দুজনেরই ছিল—একই ধরনের নিরুপদ্রব ব্যক্তিত্ব।

মা এ ব্যাপারে আমাকে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে, ড্যাডির মৃত্যুর পরপর। আমি তখন সেনাবাহিনী থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতেই অবস্থান করছিলাম।

মাকে সেই শেষ বারের মতন জীবিত অবস্থায় দেখি। একইভাবে, এই ছবিটা তাকে যুবতী বেলায় যেমন দেখেছি সেই ছবিগুলোর সঙ্গে আমার মনের ভেতরে মিশে রয়েছে। রোববারের বিকেলগুলোতে সব সময় তাকে যেভাবে দেখেছি তাকে সব সময় আমি তেমনি ভাবতেই অভ্যস্ত, ধরা যাক, যখন বড়রা সবাই মিলে রোববার দুপুরের খাবারের পর আলাপ চারিতায় মেতে উঠত। আমি তাকে সব সময় হালকা নীল রঙের পোশাক পরে থাকতে দেখতাম। তিনি সোফায় বসে থাকতেন। আর আমার বাবা বসতেন ইজি চেয়ারে, সেটা তার থেকে খুব একটা দূরে নয়। আর বসার ঘরটা চার্চের লোক এবং আত্মীয় স্বজনে ঠাঁসা থাকত। তারাও বসার ঘরের চারপাশ ঘিরে থাকা আর সব চেয়ারে বসে থাকত, আর বাইরে ধীরে ধীরে রাত নামত, কিন্তু ভেতরের কেউই সেটা টের পেত না। জানালার শার্সির বাইরে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসত এবং একটু পরপর সড়কের শোরগোল ভেসে আসত, অথবা হতে পারে সেটা কাছের কোনো চার্চের সঙ্গীতের খঞ্জনীর তালের শব্দ। কিন্তু ঘরের ভেতরে সত্যিকার নীরবতা বিরাজ করত। কয়েক মুহূর্তের জন্য কেউই কোনো কথা বলত না, তবে সবগুলো মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসত, ঠিক বাইরের আকাশটার মতো। আর আমার মা খানিকটা কোমর দোলাত, এবং বাবার চোখ জোড়া বন্ধ হয়ে আসত। সবাই এমন কিছু একটা খুঁজত যা কোনো শিশুর পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। কয়েক মিনিটের জন্য তারা বাচ্চাদের কথা ভুলে থাকত। হয়ত কোনো শিশু গালিচার ওপর শুয়ে, আধো ঘুমে ডুবে থাকত। হয়ত কেউ একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে

থাকত আর অন্যমনস্কভাবে ওর মাথায় টোকা মারত। হয়ত একটা বাচ্চা চুপচাপ বড় বড় চোখ করে, কোণায় বসে চেয়ার ভাঁজ করত। সেই নীরবতার মাঝে, অন্ধকার নেমে আসত, এবং সেই মুখগুলোর অন্ধকার আড়ালে শিশুদের ভীত করে তুলত। সে আশা করত যে হাতটা তার কপালে আঘাত করছে সেটা কখনোই থামবে না—কখনোই মারা যাবে না। সে আশা করত এমন একটা সময় কখনোই আসবে না যখন এই বয়স্ক লোকেরা বসার ঘর জুড়ে বসে থাকবে না, তারা কে কোথা হতে এসেছে সেসব নিয়ে কথা বলা বন্ধ করবে না, এবং তারা যা দেখেছে, এবং তাদের জীবনে আর তাদের আত্মীয় স্বজনদের জীবনে যা যা ঘটেছে এর কোনো কিছুরই শেষ নেই।

কিন্তু কোনো গভীর চিন্তামগ্ন এবং জেগে থাকা কোনো শিশু ঠিকই জানত যে এর সবই শেষ হতে বাধ্য, যা এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তখনি কেউ একজন উঠে গিয়ে আলো জ্বালায়। তখন বড়দের বাচ্চাগুলোর কথা মনে পড়ে আর সেদিনের মতো তারা আর কোনো কথা বলে না। আর যখন ঘরটা আলোয় ভরে ওঠে, শিশুরা তখন অন্ধকারে ছেয়ে যায়। সে জানে প্রতিবার বাইরের অন্ধকারের একটু কাছাকাছি যাবার সময় এমনই হয়। বাইরের অন্ধকার হলো সেই জিনিস যা নিয়ে বড়রা কথা বলেছিল। এটা সেই জিনিস তারা যেখান থেকে এসেছে। এটা সেই জিনিস তারা যা ভোগ করে। শিশুটা জানে তারা আর কথা বলবে না কারণ সে যদি খুব বেশি করে জানে তাদের ভাগ্যে কী ঘটবে, সেও সেটা শীঘ্র খুব বেশি করেই জানবে, তার ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে সেই সম্বন্ধে।

মার সঙ্গে শেষবার যখন কথা বলেছিলাম, আমার মনে পড়ে, তখন আমি খুব অস্থির ছিলাম। আমি বেরিয়ে যেতে চাই আর তখনই ইসাবেলকে দেখি। তখনও আমরা বিয়ে করিনি এবং আমাদের দ্বিধা কাটাতে তখনও আমাকে অনেক খাটতে হয়।

মা ওখানটাতে বসে ছিলেন, অন্ধকারে, জানালার পাশে। তিনি গুনগুন করে পুরনো দিনের চার্চের গান গাইছিলেন, প্রভু, তুমি আমাকে অনেক দূর থেকে এনেছো। সনি আশপাশেই কোথাও ছিল। মা বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

“আমি জানি না”—তিনি বলেন, “আবার যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে এখান থেকে চলে যাব। তবে আমি আশা করি আমি তোমাকে যা যা শেখাতে চেষ্টা করেছি তা সব সময় মনে রাখবে।”

“ওভাবে বলো না”—আমি বলি আর হাসি। “তুমি আরো অনেক দিন এখানে থাকবে।”

সেও হাসে, কিন্তু কিছুই বলে না। দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। আর আমি বলি, “মা অযথা চিন্তা করো না। আমি সব সময় তোমার কাছে লিখব, আর চেকও পেতে থাকবে ...”

“আমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে চাইছি”—হঠাৎই, তিনি বলেন। “আমার যদি কিছু একটা হয় ওর দেখাশোনা করবে এমন কারো কাছে যাবার জায়গা থাকবে না।”

“মা-মা”—আমি বলি, “তোমার বা সনির কিছুই হবে না। সনি ঠিক আছে। ও খুব ভালো ছেলে আর ওর বিচারবুদ্ধিও খুব ভালো।”

“ও ভালো ছেলে প্রশ্নটা সেখানে নয়”—মা বলেন, “ওর বিচারবুদ্ধি ভালো সেটাও নয়। ও খারাপ ছেলেও নয়, এমনকি বোবা কালাও নয় যে বোকা হবে।” আমার দিকে তাকিয়ে, তিনি থামেন। “এক সময় তোমার বাবার একজন ভাই ছিল।” তিনি জানালার বাইরে তাকান। কথাটা বলে এমনভাবে হাসেন যেন ব্যথাটা আমাকে অনুভব করাতে চাইছেন। “এটা তুমি কখনোই জানতে না, জানতে কি?”

“না”—আমি বলি, “কখনোই জানতাম না তো” এবং তার মুখের দিকে তাকাই।

“হুম”—তিনি বলেন, “তোমার বাবার একজন ভাই ছিল।” তিনি আবারও জানালার বাইরে তাকান। “আমি জানি তুমি তোমার বাবাকে কখনোই কাঁদতে দেখোনি। কিন্তু আমি দেখেছি—বহুবার, যত বছর ধরে তার সঙ্গে রয়েছি।”

আমি জিজ্ঞেস করি, “তার ভাইয়ের কী হয়েছিল? কেন সবাই তাকে নিয়ে কখনো কোনো কথা পর্যন্ত বলেনি?”

এই প্রথম মাকে দেখতে আমার বুড়ো মনে হচ্ছিল।

“ওর ভাই খুন হয়”—তিনি বলেন, “তখন সে বয়সে তোমার চেয়ে সামান্য ছোট। আমি ওকে চিনতাম। ও খুব চমৎকার একটা ছেলে ছিল। ও খানিকটা দুষ্টু ছিল ঠিকই, তবে কখনো কারো কোনো ক্ষতি করেনি।”

এরপর তিনি থামেন এবং ঘরটা নীরব হয়ে পড়ে, একেবারে রোববারের সন্ধ্যার মতো। মা বাইরে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে থাকে।

"ও মিলে কাজ করত"—তিনি বলেন, "এবং, সব তরুণদের মতোই, ও শনিবারের রাতটাই কেবল নিজের মতো করে কাটাত। শনিবার রাতে ও আর তোমার বাবা বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে বেড়াত, নাচে বা এরকম কিছুতে যেত, অথবা চেনা জানা লোকেদের সঙ্গে বসে থাকত, আর তোমার বাবার সেই ভাই গান গাইত, ওর গলা ছিল খুবই চমৎকার, আর নিজেই নিজের গিটারটা বাজাত। ভালো, সেই শনিবার রাতে, ও আর তোমার বাবা কোন একটা জায়গা থেকে বাড়ি ফিরছিল, আর ওরা দুজনেই তখন সামান্য মাতাল ছিল, আর সেইরাতে আকাশে একটা চাঁদও ছিল, সেটা ছিল দিনের মতোই উজ্জ্বল। তোমার বাবার ভাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিটারটা কাঁধে নিয়ে আপন মনে শিস দিতে থাকে। ওরা একটা টিলা থেকে নেমে আসছিল আর ওদের নিচের রাস্তাটা রাজপথ থেকে ঘুরে ভেতরের দিকে এসেছে। ভালো, তোমার বাবার সেই ভাই সব সময়ই খানিকটা ছটফটে স্বভাবের ছিল, সে সেই টিলা থেকে দৌড়ে নামার সিদ্ধান্ত নেয়, আর কাজটা সে করেও ছাড়ে, তার পেছনের ঝুলন্ত গিটারটা থেকে তখন ঢং ঢং করে শব্দ বেরুচ্ছিল, এবং সে রাস্তার ওপারে চলে যায়, আর তারপর একটা গাছের আড়ালে জল বিয়োগ করে। আর তোমার বাবা তখন ওর সঙ্গে মজা করছিল, আর সে তখনও পাহাড় থেকে নামছিল, খানিকটা ধীরে। এরপর সে একটা মোটর গাড়ির শব্দ শুনতে পায় আর সেই মুহূর্তেই তার ভাই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসে, চাঁদের আলোয়। এবং সে রাস্তা পার হতে থাকে। আর তোমার বাবা দৌড়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে, ও জানায় কেন তা করেছে সেটা তার জানা ছিল না। গাড়িটা ছিল একদল সাদা মানুষে ঠাঁসা। ওরা সবাই ছিল মাতাল, আর যখনই ওরা তোমার বাবার ভাইকে দেখতে পায়, সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভয়ানক এক চিৎকার করে সোজা ওর দিকে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। ওরা আসলে মজা করছিল, শুধু ওকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছিল, ওরা ওরকম প্রায়ই করে থাকে, সেটা তোমার জানা। কিন্তু সে সময় ওরা ছিল মাতাল। আর আমার ধারণা সেই ছেলেটাও ছিল মাতাল, আর ভয়ে হিতাহিত জ্ঞান পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। তখনই সে লাফিয়ে সরে যেতে চায়, কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তোমার বাবা বলেছে সে তার ভাইয়ের চিৎকার শুনেছে, যখন গাড়িটা ওকে চাপা দিয়ে ওর ওপর দিয়ে চলে যায়, আর সে গিটারের কাঠগুলোর ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পায়, আর তার ছেঁড়ার শব্দ, আর সে সাদা লোকেদের চিৎকার শুনতে পায়, আর গাড়িটা চলতেই থাকে, আর সেটা আজও থামেনি। আর যখন তোমার বাবা পাহাড় থেকে নেমে আসে, তখন তার ভাই একতাল মণ্ড আর রক্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

মায়ের চেহারার ওপর চোখের জল চক্ চক্ করছিল। আমার আর কিছুই বলার থাকে না।

"কথাটা সে কখনো বলেনি"—সে বলে, "কারণ আমি তোমাদের মতো বাচ্চা ছেলেদের কাছে ওকে তা কখনোই বলতে দেইনি। সেই রাতে তোমার বাবা একেবারে পাগলের মতো হয়ে যান এবং এরপর আরো অসংখ্য রাত ওর সেভাবেই কাটে। ও বলে গাড়ির আলোটা চলে যাবার পর সেই সড়কটার মতো অন্ধকার কোনো কিছু সে তার সারা জীবনেও দেখেনি। আশপাশে কোনো কিছু, রাস্তার ওপর আর কোনো লোক ছিল না, শুধু তোমার বাবা, ও তার ভাই আর সেই ভাঙ্গা গিটারটা ছাড়া। ও,

হ্যাঁ। তোমার বাবা আর কখনোই পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। সেদিন থেকে নিশ্চিত না হবার পরও তবু সব সাদা লোককে সে তার ভাইয়ের হত্যাকারী মনে করছে যেহেতু সে এমনই একজন লোককে তার ভাইকে খুন করতে দেখেছে।”

সে থামে এবং নিজের রুমালটার দিকে তাকিয়ে থাকে আর চোখ মুছে আমার দিকে তাকায়।

“আমি তোমাকে এসব বলিনি”—তিনি বলেন, “যাতে কাউকে অযথা ভয়, কটু কথা বা ঘৃণা না করো। এখন তোমাকে কথাটা বললাম কারণ তোমারও একটা ভাই আছে। আর পৃথিবীটা মোটেই বদলে যায়নি।”

আমার ধারণা আমি এটা বিশ্বাস করছি না। আমার ধারণা তিনি সেটা আমার চেহারার মাঝে দেখতে পেয়েছেন। তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে আবারও জানালার দিকে তাকিয়ে, সেই রাস্তার মাঝে কিছু একটা খুঁজতে থাকেন।

“তবে আমি আমার ত্রাণকর্তার প্রশংসা করি”—শেষে তিনি বলেন, “যে তিনি তোমার বাবাকে আমার পাশে একই বাড়িতে রেখেছেন। আমি তাকে বলিনি আমার দিকে কোনো ফুল ছুঁড়ে দিতে, বরং, আমি ঘোষণা করি, তিনি আমাকে খুবই হতাশ করেছেন এটা জানান দিয়ে যে আমি তোমার বাবাকে এই বিশ্ব থেকে নিরাপদ থাকতে সহায়তা করেছি। তোমার বাবা সব সময় বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর, শক্তিমান লোকের মতো আচরণ করেছে। আর সবাই তাকে সেভাবেই দেখেছে। তবে সে যদি ওখানে আমাকে না পেত তবে—তার চোখের জলই দেখতে হতো!”

তিনি আবারও কাঁদতে শুরু করেন। তখনও আমি নড়তে পারছিলাম না। আমি বলি, “স্রষ্টা, স্রষ্টা, বিষয়টা যে এরকম সেটা আমি মোটেই জানতাম না।”

“ওহ, সোনা”—তিনি বলেন, “এমন আরো অনেক কিছুই আছে যা তোমার জানা নেই। তবে সেসব তোমাকে খুঁজে নিতে হবে।” তিনি জানালার কাছ থেকে উঠে আমার কাছে আসেন। “তোমার ভাইকে দেখে রাখতে হবে”—তিনি বলেন, “ওকে পড়ে যেতে দিও না, ওর যাই হোক না কেন বা ওর কাছ থেকে যতই খারাপ ব্যবহার পাও না কেন। তুমিও ওর সঙ্গে বহুবার বার দুষ্টামি করবে। তবে ভুলে যেও না আমি তোমাকে কী বলেছি, শুনতে পাচ্ছো?”

“আমি ভুলব না”—আমি বলি। “তুমি চিন্তা করো না, আমি ভুলব না। আমি সনির কিছুই হতে দেব না।”

আমার মা হেসে ওঠেন যেন তিনি আমার চেহারায় কিছু একটা দেখতে পেয়ে মজা পাচ্ছেন। এরপর, “তুমি হয়ত কোনো কিছু থামাতে পারবে না। তবে জানান দিতে পারবে তুমি ওর পাশে রয়েছো।”

দুদিন পর আমি বিয়ে করি, এবং এরপর চলে আসি। আর আমার মনের ভেতর তখন ভারি একটা বোঝা এবং বিশেষ ছুটিতে জাহাজে করে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাড়ি ফেরার আগপর্যন্ত মায়ের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতিটা ভুলে থাকি। আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর, আমি আর সনি শূন্য রান্না ঘরটায় বসে থাকার সময়, ওর খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করি।

“তুমি কী করতে চাও?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“আমি একজন মিউজিসিয়ান হতে চাই”—সে বলে।

এরই মধ্যে ওর গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায়, আমার দূরে থাকার সময়, জুক বক্সের তালে নেচে কে কোনটা বাজাচ্ছে এবং সেটা দিয়ে তারা আর কী করছে তার খোঁজ নিতে থাকে, আর আপনা থেকেই একটা ড্রাম সেট যোগাড় করে ফেলে।

“বলতে চাইছো, তুমি একজন ড্রামার হতে চাও?” কোনোভাবে আমার ভেতরে এমন একটা অনুভূতি কাজ করছিল অন্য কারো জন্য ড্রামার হওয়াটা ঠিক আছে তবে সেটা আমার ভাই সনির জন্য নয়।

“আমার মনে হয় না”—খুব গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে, ও বলে, “যে কখনোই আমি ভালো ড্রামার হতে পারব। তবে আমার মনে হয় আমি একটা পিয়ানো বাজাতে পারব।”

মিনিট খানেক ধরে ও রান্নাঘরে পায়চারি করে। ও আমার সমান লম্বা। সবে দাঁড়ি কামাতে শুরু করেছে। হঠাৎই আমার মনে হতে থাকে আমি আদৌ ওকে চিনি না।

ও টেবিলের সামনে এসে থামে এবং আমার সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেয়। আমার দিকে উপহাসের দৃষ্টিতে তাকায়, সকৌতুক উপেক্ষার ভঙ্গিতে, একটা ঠোঁটে পুরে দেয়। “কিছু মনে করবে?”

"তুমি কি এরইমধ্যে ধূমপান শুরু করে দিয়েছো?"

ও সিগারেটটা ধরায় আর মাথা নেড়ে, ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে আমাকে দেখতে থাকে। "আমি কেবল দেখতে চাইছি তোমার সামনে সিগারেট খাবার সাহস আমার আছে কিনা।" দেঁতো হাসি হেসে ও ছাদ বরাবর বিশাল একটা ধোঁয়ার কুণ্ডুলি ছাড়ে। "কাজটা খুবই সোজা।"

আমি সেটা অনুমোদন করি না। এতটা গুরুতরভাবে কখনোই আমি বড় ভাইয়ের ভূমিকা পালন করিনি, কখনোই এতটা বিরলভাবে, তাই সানির কাছে অন্য কিছু জানতে চাই। আমি এমন কিছু একটার উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম সেটা কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা আমার জানা ছিল না, বুঝতে পারছিলাম না আমার কী করা উচিত। তাই খানিকটা ভ্রু কুচকে জিজ্ঞেস করি: "তুমি কি ধরনের মিউজিসিয়ান হতে চাও?"

সে দাঁত বের করে হাসে। "তোমার ধারণা কত ধরনের হতে পারে?"

"একটু সিরিয়াস হও"—আমি বলি।

মাথাটা পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে, সে হেসে ওঠে, এবং আমার দিকে চেয়ে থাকে।

"আমি সিরিয়াস।"

"ঠিক আছে, তাহলে যীশুর দিব্যি, ছেলেমানুষী বন্ধ করো এবং একটা সিরিয়াস প্রশ্নের জবাব দাও। বলতে চাইছি, তুমি কি কনসার্ট পিয়ানিস্ট হতে চাও, তুমি কি ক্লাসিক্যাল মিউজিক করতে চাও নাকি সবই, নাকি—বা কোনটা তাহলে?" আমার কথা শেষ হবার অনেক আগে থেকেই ও আবারও হাসতে থাকে। "যীশুর দোহাই, সনি!"

ও ধাতস্থ হয়, তবে খানিকটা অবাধ্যের মতন। "আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমাকে মনে হচ্ছে খুবই—ভীত!" এবং আবারও ও চুপ মেরে যায়।

"ভালো, তুমি হয়ত একে এখন মজা বলে মনে করতে পারো, সোনা, কিন্তু যখন এটা দিয়ে জীবন চালাতে হবে তখন এটাকে আদৌ ততটা মজার বলে মনে হবে না, আমাকে সেকথা বলতে দাও।" আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম কারণ আমি জানতাম ও আমাকে নিয়ে হাসছে আর এটা জানতাম না কেন ও হাসছে।

"না"—ও বলে, এবার সে খুবই শান্ত, এবং ভীত, সম্ভবত, এই জন্য যে এরই মধ্যে ও আমাকে যথেষ্ট আঘাত দিয়ে ফেলেছে, "আমি ক্লাসিক্যাল পিয়ানিস্ট হতে চাই না। ওতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।

আমি বোঝাতে চাইছি”—ও থামে, শক্ত করে আমার দিকে তাকিয়ে, যেন ওর চোখ দুটা আমাকে তা বোঝাতে সাহায্য করছে, এবং এরপর অসহায়ের মতো ইশারা করে, যেন সম্ভবত তার হাত দুটা আমাকে বুঝতে সাহায্য করবে—“আমি বোঝাতে চাইছি, আমার এখনো অনেক কিছু শেখা বাকি, আর আমাকে সব কিছুই শিখতে হবে, তবে, আমি বোঝাতে চাইছি, আমি জ্যাজ বাজাতে চাই”—সে বলে।

ভালো, কথাটা আগের মতো অতটা ভারি বা বাস্তব বলে মনে হয় না, সন্ধ্যেবেলায় সনির মুখে যেমনটা শুনতে পেয়েছিলাম। আমি শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থাকি আর খুব সম্ভবত তখন আমার ভ্রূযুগল সত্যি সত্যি কুঁচকে আসে। আমার মাথায় আসছিল না লোকেরা যখন ডান্স ফ্লোরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নাচবে তখন ও কেন ক্লাউনের মতো নাইটক্লাবের মঞ্চে সময় কাটাতে চাইছে। কোননা কোনোভাবে—এ কাজে ওকে অযোগ্য বলেই মনে হচ্ছিল। আমি আগে কখনোই এ নিয়ে ভাবিনি, এ কাজে ওকে কেউ বাধ্যও করেনি, তবে আমার মনে আছে একটা ক্লাসে সবসময় আমি জ্যাজ মিউজিসিয়ানদের রাখতাম যাকে ড্যাডি বলতেন, ‘সু সময়ের জনতা’।

“তুমি সিরিয়াস?”

“দোযখ, হ্যাঁ, আমি সিরিয়াস।”

ওকে আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি অসহায়, বিরক্ত এবং আশাহত দেখায়।

আমি উপকারীর মতো, পরামর্শের ভঙ্গিতে বলি: “মানে—লুইস আমর্সস্টংয়ের মতো?” ওর চেহারাটা দেখতে এমন হয়ে আসে যেন আমি ওকে কষে একটা ঘুষি মেরেছি। “না, আমি সেরকম পুরাতন বাজে কারো কথা বলছি না।”

“ভালো, দেখো, সনি, আমি দুঃখিত, পাগল হয়ে যেও না। আমি কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এমন কারো নাম বলো—যাকে তুমি জানো, এমন একজন জ্যাজ মিউজিসিয়ান যাকে তুমি শ্রদ্ধা করো।”

“বার্ড।”

“কে ?”

“বার্ড ! চার্লি পার্কার! ওরা কি তোমাকে ছাইয়ের আর্মিতে কিছু শেখায়নি?”

আমি একটা সিগারেট ধরাই। আমি অবাক হই আর তারপর এটা বুঝতে পেরে খানিকটা মজাও পাই যে আমি তখন মৃদু কাঁপছিলাম। “আমি এর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম”—আমি বলি। “আমাকে ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাতে হবে। এবার বলো দেখি। এই পার্কার লোকটা কে?”

“তিনি বর্তমানের বিখ্যাত জ্যাজ মিউজিসিয়ানদের একজন”—চাপা ক্রোধে ফুসে উঠে সনি বলে, ওর হাতদুটো তখন পকেটে, আর আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল। “বোধ হয় বিখ্যাত বলেই”—তেতো স্বরে আরো বলতে থাকে, “সম্ভবত তুমি কখনোই তার কথা শোননি।”

“ঠিক আছে”—আমি বলি, “আমি মূর্খ। এই জন্য দুঃখ হচ্ছে। আমি বাইরে যাচ্ছি আর এখনই বিড়ালটার সব রেকর্ড কিনে আনছি, তাহলে হবে?”

“এতে আমার কিছু যাবে আসবে না”—সনি বলে, “তুমি কী শুনবে তাতে আমার কী। আমাকে বাধা দিতে এসো না।”

আমি বুঝতে শুরু করি ওকে আগে কখনো এরচেয়ে বেশি বিচলিত দেখিনি। মনে অন্য একটা অংশ দিয়ে আমি ভাবছিলাম যে এমনটা আসলে বাচ্চা ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আর তা খুব জোরে আঘাত হানার মতো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না, আমার মনে হয় না এটা জিজ্ঞেস করলে কোনো ক্ষতি হবে: “এতে কি অনেক সময় লাগবে না? তুমি কি এটা করে চলতে পারবে?”

ও আমার দিকে ফিরে এবং রান্না ঘরের টেবিলের ওপর, আধাআধি বসে, আধাআধি ঝুঁকে আসে। “সব কিছুতেই সময় লাগে”—ও বলে, “আর—আমি নিশ্চিত, এর সাহায্যে আমি খুব ভালোভাবেই চলতে পারব। তবে মনে হচ্ছে আমি তোমাকে বোঝাতে পারছি না যে এই একটা জিনিসই আমি করতে চাই। ”

“ঠিক আছে, সনি”—আমি নম্রভাবে বলি, “তুমি জানো সবাই যা করতে চায় সব সময় সেটা করতে পারে না—”

“না, আমার সেটা জানা নেই”—আমাকে অবাক করে সনি বলে ওঠে। “আমার মনে হয় সবাই যা চায় সেটাই তার করা উচিত, না হলে ওরা সবাই কেন বেঁচে আছে?”

“তোমাকে অনেক বড় হতে হবে”—আমি হতাশার সঙ্গে বলি, “এখন তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার সময়।”

“আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়েই ভাবছি”—কঠোর স্বরে সনি বলে। “সব সময়ই আমি এটা নিয়ে ভাবি।”

আমি এ নিয়ে কথা বলা বাদ দেই। সিদ্ধান্ত নেই, ও যদি মত না বদলায় তাহলে এ নিয়ে পরেও কথা বলা যাবে। “এই ফাঁকে”—আমি বলি, “তোমাকে স্কুল শেষ করতে হবে।” আমরা এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি ও ইসাবেল এবং তার আত্মীয় স্বজনদের কাছে গিয়ে থাকবে। আমি জানি এটা ওর জন্য খুব একটা ভালো ব্যবস্থা হবে না কারণ ইসাবেলের আত্মীয়েরা খানিকটা নাকউঁচু স্বভাবের এবং বিশেষত তাদের কেউই চায়নি ইসাবেল আমাকে বিয়ে করুক। তবে এছাড়া আর কী করা যেতে পারে সেটা আমার মাথায় আসছিল না। “এবং ইসাবেলের কাছে তোমাকে রেখে আসতে এখন আমাদের সেখানে যেতে হবে।”

তারপর একটা দীর্ঘ নীরবতা নেমে আসে। ও রান্না ঘরের টেবিল থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। “এটা একটা ভয়ানক চিন্তা। তুমি নিজেই সেটা জানো।”

“এর চেয়ে ভালো কোন বুদ্ধি কি তোমার মাথায় আছে ?”

মিনিট খানেক ধরে ও রান্নাঘরে পায়চারি করে। ও আমার সমান লম্বা। সবে দাঁড়ি কামাতে শুরু করেছে। হঠাৎই আমার মনে হতে থাকে আমি আদৌ ওকে চিনি না।

ও টেবিলের সামনে এসে থামে এবং আমার সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেয়। আমার দিকে উপহাসের দৃষ্টিতে তাকায়, সকৌতুক উপেক্ষার ভঙ্গিতে, একটা ঠোঁটে পুরে দেয়। “কিছু মনে করবে?”

“তুমি কি এরইমধ্যে ধূমপান শুরু করে দিয়েছো?”

ও সিগারেটটা ধরায় আর মাথা নেড়ে, ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে আমাকে দেখতে থাকে। “আমি কেবল দেখতে চাইছি তোমার সামনে সিগারেট খাবার সাহস আমার আছে কিনা।” দেঁতো হাসি হেসে ও ছাদ বরাবর বিশাল একটা ধোঁয়ার কুণ্ডুলি ছাড়ে। “কাজটা খুবই সোজা।” ও আমার চেহারার দিকে তাকায়। “এবার, এসো। আমি বাজি ধরতে পারি তুমি আমার বয়সেই সিগারেট ধরেছিলে, সত্যি করে বলো।”

আমি কিছুই বলিনি কিন্তু সত্যটা আমার চেহারাই বলে দিচ্ছিল, আর তাতেই ও হেসে ওঠে। কিন্তু ওর এবারের হাসিতে খুব আঁটসাঁট কেমন যেন একটা ভাব ছিল। “নিশ্চয়। আর আমি বাজি ধরতে পারি তুমি আমাকে পুরোপুরি অনুসরণ করোনি।”

ও আমাকে খানিকটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। “সে যাক”—আমি বলি। “আমরা এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি তুমি ইসাবেলের কাছে যাবে এবং সেখানেই থাকবে। এখন হঠাৎ করে আবার কী হলো?”

“সিদ্ধান্তটা তুমি নিয়েছো”—ও যুক্তি দেখায়। “আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি।”

ও আমার সামনে এসে থামে, স্টোভের দিকে ঝুঁকে, আলতো করে হাত ভাঁজ করে। “দেখো, ভাই। আমি আর হারলেমে থাকতে চাই না, সত্যিই চাই না।” খুবই স্থির স্বরে কথাটা বলে। আমার দিকে তাকায়, তারপর আবারও জানালার দিকে যায়। ওর চোখে কিছু একটা ছিল যা আগে কখনোই দেখা হয়ে ওঠেনি, কোনো চিন্তাবিষ্টতা, ওর নিজস্ব কোনো দুশ্চিন্তা। ও একহাতের পেশী ঘষে। “এখান থেকে আমার চলে যাবার সময় হয়েছে।”

“তুমি কোথায় যেতে চাও সনি?”

“আমি আর্মিতে যোগ দিতে চাই। বা নেভিতে। যেকোন একটা কিছু হলেই চলবে। আমি যদি বলি আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, ওরা সবাই তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করবে।”

তখন নিজেকে পাগল বলে মনে হতে থাকে। খুব বেশি ভড়কে গিয়েছিলাম বলেই এমনটা মনে হচ্ছিল। “তোমার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আস্ত একটা বোকা, তুমি কেন আর্মিতে যেতে চাইছো?”

“এইমাত্রই তো তোমাকে বললাম। হারলেম থেকে বের হবার জন্য।”

“সনি এখনো তুমি স্কুল শেষ করোনি। আর সত্যিই যদি তুমি একজন মিউজিসিয়ান হতে চাও, তাহলে কিভাবে আশা করতে পারো আর্মিতে গিয়ে সেটা শিখতে পারবে?”

ও আমার দিকে তাকায়, কথার ফাঁদে পড়ে ফুসতে থাকে। “কোন একটা উপায় নিশ্চয় হবে। কোনো না কোনোভাবে আমি কাজটা করতে পারব। যেভাবেই হোক, বেরিয়ে আসার পর আমি জি.আই. বিল অবশ্যই পাব।”

“যদি আদৌ বেরিয়ে আসতে পারো।” আমরা একে অপরের দিকে তাকাই। “সনি, দয়া করে একটু বুঝতে চেষ্টা করো। আমি জানি পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল নয়। তবে আমারা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব।”

“স্কুলে আমি কিছুই শিখব না”—সে বলে। “এমনকি যখন সেখানে যেতাম তখনও।” সে আমার কাছ থেকে সরে যায় এবং জানালাটা খোলে আর সিগারেটটা সরু গলির দিকে ছুঁড়ে মারে। আমি ওর পেছনটা দেখি। “অন্তত, আমি কিছু না শিখলেও, তুমি আমাকে শেখাতে চাইছো।” সে জানালাটা এতটাই

সজোরে বন্ধ করে যে আমার মনে হচ্ছিল ওর কাচগুলো উড়ে এসে আমার গায়ে পড়বে। “আর আমি এইসব কটু গন্ধওয়ালা ময়লা ক্যানের কারণে অসুস্থ !”

“সনি”—আমি বলি, “আমি জানি তোমার কেমন লাগছে। তবে এখনই যদি স্কুল শেষ না করো তাহলে ভবিষ্যতে এর জন্য তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।” আমি ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরি। “আর তুমি কেবল আরো একটা বছর পাবে। এটা খুব একটা খারাপ হবে না। আর আমি ফিরে আসছি আর দিব্যি দিয়ে বলছি তুমি যা করতে চাও তার জন্য তোমাকে সাহায্য করব। কেবল আমার ফিরে আসা পর্যন্ত লেগে থাকতে চেষ্টা করো। দয়া করে তুমি কি সেটা করবে? আমার জন্যে?”

সে এর কোনো জবাব দেয় না আর আমার দিকেও তাকায় না।

“সনি। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?”

ও সরে যায়। “আমি তোমার কথা শুনেছি। কিন্তু আমার কোনো কথা তুমি কখনোই শোননি।”

এর জবাবে কী বলতে হবে আমার জানা ছিল না। সে জানালার বাইরে তাকায় এবং তারপর আমার দিকে। “ঠিক আছে”—কথাটা বলে ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। “আমি চেষ্টা করব।”

তারপর ওকে সামান্য উৎসাহ দিতে, আমি বলি, “ইসাবেলের ওখানে ওদের একটা পিয়ানো আছে। তুমি সেটাতে চর্চা করতে পারবে।”

আর সত্যি সত্যি কথাটা ওকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই উল্লাসিত করে।

“ঠিকই তো”—ও বলে, নিজেকে বলে। আমি তো এটা ভুলেই গিয়েছিলাম।” ওর চেহারা খানিকটা শিথিল হয়। কিন্তু সেখানে তখনও চিন্তা খেলা করছিল, যেভাবে আগুনের সামনে তাতে আলো ছায়া খেলা করে।

কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওর পিয়ানো বাজাবার কথা কখনোই শুনতে পাব না। প্রথম দিকে, ইসাবেল আমাকে লিখে, জানায় সনি তার মিউজিক নিয়ে কতটা একনিষ্ঠ আর কত আগেভাগে সে স্কুল থেকে চলে আসে, বা স্কুলের সময়টাতে আর যেখানেই থাকুক না কেন বাড়ি ফিরে এসে সোজা পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসে আর রাতের খাবার সময় হবার আগ পর্যন্ত সেখানে থাকে। আর, রাতের খাবারের পর, আবারও সে পিয়ানোর কাছে ফিরে যায় তারপর সবাই বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকে। শনিবার আর রোববার সারাদিন সে পিয়ানোর কাছে থাকে। তারপর সে একটা রেকর্ড প্লেয়ার কিনে এনে সেটাতে গান শুনতে শুরু করে। সে একটা রেকর্ডই বারবার শুনতে থাকে, কখনো কখনো দিনভর, আর পিয়ানোতে সেই সুরটা তোলে। অথবা সে রেকর্ডের কর্ড, বাঁক, বা ধীর লয়ের কোনো

একটা অংশ বাজায়, তারপর সেটা পিয়ানোতে তোলে। তারপর আবারও রেকর্ডে ফিরে যায়। তারপর পিয়ানোতে।

ভালো, তবে আমি জানি না ওরা সবাই ব্যাপারটাকে কিভাবে নিচ্ছে। শেষে ইসাবেল স্বীকার করে এটা আসলে কারো সঙ্গে থাকা নয় বরং শব্দের সঙ্গে বসবাস করা। আর ওর কাছে এইসব শব্দের কোনো মানে নেই, ওদের কারো কাছেই—স্বভাবতই। তাই ওদের বাড়িতে থাকা সেই উপস্থিতি ওদের বড় বেশি যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হতে পারে সনি কোনো দেবতা বা দানব। সে এমন একটা পরিবেশে গিয়েছে, যা তার সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না। ওরা তাকে খাওয়ায়, আর সে খায়, নিজে থেকেই গোসল করে, ওদের দরজা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে আসে আবার ভেতরে ঢোকে; অবশ্যই সে মোটেই নোংরা, অস্বস্তিকর বা অভদ্র নয়, সনি এসবের কোনোটাই নয়; তবে সে কোনো একটা ধোঁয়াশা, কোনো একটা আগুনের পরতে মোড়া, এই দৃষ্টিভঙ্গির পুরোটাই তার নিজস্ব; আর তার কাছে পৌঁছাবার কোনো পথই কারো জন্যে খোলা ছিল না।

সেই সঙ্গে তখনও সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠেনি, তখনও সে একটা শিশু, এবং ওরা তার জন্য সব ধরনের উপায় খুঁজে বেড়াতে থাকে। অবশ্যই ওরা তাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে না। এমনকি ওরা পিয়ানোর বোদ্ধাও হয়ে উঠতে পারে না কারণ এ ব্যাপারে ওদের জ্ঞানের পরিসর খুবই সীমিত, যেমনটা হাজার মাইল দূর থেকে, আমি বুঝতে পারছিলাম, যে সনি তার জীবনের খাতিরেই সেই পিয়ানোটা বাজাচ্ছিল।

কিন্তু সে স্কুলে যেত না। একদিন স্কুল বোর্ড থেকে একটা চিঠি আসে আর ইসাবেলের মা সেটা পায়—ওরকম আরো বেশ কয়েকটা চিঠি এর আগেও এসেছিল, যার সবগুলোই সনি ছিঁড়ে ফেলে। সেদিন, সনি যখন বাড়ি ফিরে আসে, ইসাবেলের মা তাকে চিঠিটা দেখায় এবং জিজ্ঞেস করে সারা দিন সে কোথায় থাকে। এবং সবশেষে তিনি জানতে পারেন সে গ্রিনউইজ ভিলেজে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ একটা মেয়ের ফ্ল্যাটে, মিউজিসিয়ান এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সময় কাটায়। এবং এটা তাকে আতঙ্কিত করে আর তাতে করে তিনি ওর সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করে দেন আর এর ফলে, একসময়—যদিও সেদিন থেকে তিনি তা মানতে অস্বীকার করেন—সনির জন্য তারা যে ত্যাগ স্বীকার করে তাকে একটা উপযুক্ত ঘর উপহার দিলেও সে মোটেই তা বুঝে উঠতে পারেনি।

সেদিন থেকে সনি আর পিয়ানো বাজায় না। সন্ধ্যায় ইসাবেলের মা শান্ত হন কিন্তু বাড়িতে যে বৃদ্ধ ছিলেন তিনি ওর গায়ে হাত তুলে বসেন, এবং ইসাবেল নিজেও। ইসাবেল জানায় সে শান্ত থাকার জন্য সর্বত চেষ্টা করেছে তবে সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং কাঁদতে শুরু করে। বলে, সে শুধু সনির

মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওকে দেখে ওর ভেতরের ওলট পালট ইসাবেল বুঝতে পারছিল। আর যা ঘটেছিল তাতে করে তারা ওর অলীক কল্পনা ভেদ করে ওর কাছে পৌঁছতে পারে। যদিও তাদের আঙুলগুলো আর সব মানুষের থেকেও যেকোন সময়ের চেয়ে হাজারগুণ ভদ্র ছিল। তাতে করে সে প্রায় বুঝতেই পারেনি যে ওরা ওকে উলঙ্গ করে ছেড়েছে আর সেই উলঙ্গপনার ওপর থুতু ছিটিয়েছে। তাই ওকে ওর দেখতে হয়, সেই সঙ্গীত, যা তার কাছে জীবন মরণ, তা ওদের জন্য যন্ত্রণার এবং সেটা তাদের যথেষ্ট ভুগিয়েছে। এর কারণ আসলে ও নয়, বরং আমি। আজকে এটাকে ও আগের চেয়ে আরো ভালোভাবে নিতে পারত, তবে এখনো ও তাতে অতটা দক্ষ নয়, খোলা মনে বলতে গেলে, আমি এমন কাউকে চিনি না যে সেটা পেরেছে।

পরের কয়েক দিনের নীরবতা, শুরু থেকে ও গানে গানে যে শব্দ করত তার চাইতেও জোরালো হয়ে দেখা দেয়। একদিন সকালে, কাজে বেরুবার আগে ইসাবেল কিছু একটা দরকার হওয়ায় ওর ঘরে যায় এবং হঠাৎই বুঝতে পারে ওর সেই রেকর্ডগুলোর একটাও সেখানে নেই। এবং নিশ্চিত হয় ও চলে গেছে। এবং আসলেই ও চলে এসেছিল। নৌ-বাহিনীর সাহায্যে যতদূর যাওয়া সম্ভব ও ততদূরে চলে যায়। শেষে গ্রিসের কোথাও থেকে আমাকে একটা পোস্টকার্ড পাঠালে আমি জানতে পারি সনি তখনও বেঁচে আছে। দুজনে আবারও নিউইয়র্ক ফিরে যাবার আগে আমাদের আর দেখা হয় না আর ততদিনে দীর্ঘকালীন যুদ্ধটাও শেষ হয়ে গেছে।

তোমার ক্ষুধা লেগেছে?”

“না।” বিয়ারের ক্যান হাতে ও বসার ঘরে ফিরে আসে। “তুমি কি আজকে রাতে আমার সঙ্গে কোথাও যেতে চাও?”

বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে বলব, সম্ভবত তাই আর না বলা হয়ে ওঠে না।

“অবশ্যই, কোথায়?”

ও সোফায় বসে নোটবুকটা নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকে। “আমি গ্রামের একটা জায়গাতে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে বসতে যাচ্ছি।”

“মানে, আজকে রাতে তুমি বাজাবে?”

“ঠিক ধরেছো।” ও ওর বিয়ারে একটা চুমুক দেয় এবং জানালার কাছে ফিরে আসে। পাশ থেকে আমাকে দেখে। “তুমি যদি সহ্য করতে পারো।”

“আমি চেষ্টা করব”—আমি বলি

ও তখন পূর্ণবয়স্ক, অবশ্যই, তবে আমি সেটা দেখতে ইচ্ছুক ছিলাম না। ও প্রায়ই বাড়ি আসত, তবে প্রতিবার দেখা হবার সময় আমাদের মাঝে ঝগড়া হতো। ওর বাঁধন ছাড়া আর সব সময় মনমরা ভাব করে থাকাটা আমার মোটেই পছন্দ হতো না আর ওর বন্ধুদের আর জীবনের প্রয়োজনে গান করাটাও আমি পছন্দ করতাম না। আমার কাছে সেটা বাঁধের মতো গোলমেলে ঠেকত।

তারপর আমাদের মাঝে ঝগড়া বাঁধে, প্রচণ্ড একটা ঝগড়া, আর তারপরের মাসগুলোতে ওর দেখা পাই না। পরে ওকে দেখতে যাই, গ্রামের যে সাজানো ভাড়া ঘরে ও থাকে, আর আমি ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। কিন্তু ওই ঘরের ভেতর তখন আরো অনেক লোক ছিল আর সনি ওর বিছানায় শুয়ে ছিল আর ও আমার সঙ্গে নিচেও নামেনি, আর ও অন্য লোকগুলোর সঙ্গে এমন আচরণ করছিল যেন ওরা ওর পরিবারের লোক আর আমি ওর কেউ না। তাই আমি রেগে যাই এবং তারপর সনিও রেগে যায়, আর আমি ওকে বলি ও যেমন করে বেঁচে আছে সেটা মরে বেঁচে থাকার মতন। এরপর ও উঠে দাঁড়ায় এবং আমাকে বলে জীবনেও যাতে ওকে নিয়ে আর কোনো দুশ্চিন্তা না করি, কেননা আমার কাছে ও মরেই গেছে। তারপর ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে দরজা দিয়ে বের করে দেয় আর অন্যেরা তখন এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন কিছুই হয়নি এবং ও আমার পেছন থেকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। আমি দরজাটার দিকে তাকিয়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। শুনতে পাই ভেতরে কেউ একজন হাসছে তারপর আমার চোখে গড়গড় করে জল নেমে আসে। আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসি, আপনা আপনি ফুঁপিয়ে গাইতে শুরু করি, আমাকে তোমার দরকার হবে, সোনা, এমন শীতল বৃষ্টিময় কোনো এক দিনে।

বসন্তে আমি সনির সমস্যাটা জানতে পারি। শরতে ছোট্ট গ্রেস মারা যায়। ও ছিল খুব সুন্দর একটা মেয়ে। কিন্তু মাত্র দুবছর বেঁচে ছিল। ও পলিওতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। দুদিন ধরে সামান্য জ্বর ছিল, তবে এর বেশি কিছু মনে হয়নি তাই আমরা ওকে বিছানায় শুইয়ে রাখি। আর আমরা ডাক্তারও ডাকতাম, তবে তার আগেই জ্বরটা পড়ে যায়, ওকে সুস্থ বলে মনে হয়। তাই আমরা ভাবি বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছিল। তারপর একদিন, ও উঠে, খেলতে শুরু করে। ইসাবেল ছিল রান্না ঘরে, সে দুপুরের খাবার তৈরি করছিল, যাতে দু ছেলে স্কুল থেকে ফিরেই খেতে বসতে পারে। আর তখনই সে বসার ঘরে গ্রেসের পড়ে যাবার শব্দ শুনতে পায়। যখন অনেকগুলো ছেলে মেয়ে থাকে তখন তাদের কেউ একজন পড়ে গেলে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যাওয়া হয় না, যদি না তারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। আর, সে সময়, গ্রেস চুপ ছিল। যদিও, ইসাবেল জানায়, সেই প্রকাণ্ড শব্দটা সে শুনেছে এবং তারপর সেই নীরবতা, ওর কিছু একটা হয়েছে এটা ভেবে সে ভীত হয়ে পড়ে। এবং সে বসার ঘরের দিকে দৌড়ে যায় আর সেখানে ছোট্ট গ্রেস উপুড় হয়ে কুঁকড়ে মেঝেতে পড়ে ছিল, আর একারণেই নিঃশ্বাস নিতে পারেনি বলে সে চেঁচাতে পারেনি। আর যখন সে চেঁচিয়ে ওঠে, শব্দটা ছিল খুবই ভয়ানক, ইসাবেল বলে, জীবনে সে এরকম চিৎকার আগে কখনো শোনেনি, আর মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখার সময় সে এরকম করে। পরে কখনো কখনো শ্বাসরুদ্ধকর মৃদু গোঙানি শুনে বহুবার

আমার ঘুম ভাঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে জাগিয়ে জড়িয়ে ধরি, ইসাবেল তখন আমাকে আঁকড়ে ধরে এমনভাবে কাঁদতে থাকে যেন প্রাণঘাতী কোনো ব্যথায় কাহিল হয়ে পড়েছে।

যেদিন ছোট্ট গ্রেসকে কবর দেই সেদিন আমার মনে হয় সনিকে খবরটা জানানো উচিত। আমি বসার ঘরে অন্ধকারে একা একা বসে ছিলাম, আর হঠাৎই আমার সনির কথা মনে পড়ে। আমার সমস্যাটা ওকে জীবন্ত করে তোলে।

একদিন রোববার বিকেলে, যখন সনি আমাদের সঙ্গে থাকত, বা, আমাদের ঘরে ছিল, প্রায় দুসপ্তাহের মতো, তখন একদিন সনির ঘরটা একটু ঘেঁটে দেখতে বসার ঘরে উদ্দেশ্যহীন পায়চারি করে ক্যান বিয়ারে চুমুক দিয়ে সাহস সঞ্চয় করে নিচ্ছিলাম। ও তখন বাইরে ছিল, আমি বাড়ি থাকার সময়টাতে ও স্বভাবতই বাইরে থাকত, আর তখন ইসাবেল বাচ্চাদের নিয়ে তাদের নানা নানুর কাছে গিয়েছে। হঠাৎ আমি বসার ঘরের জানালার সামনে স্থির দাঁড়িয়ে, সাত নম্বর অ্যাভিনিউর দিকে তাকাই। সনির ঘরটা ঘেঁটে দেখার চিন্তাটা তখনও মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তখনও জানতাম না জিনিসটা খুঁজে পাবার পর আমি সেটা নিয়ে কী করব। অথবা যদি সেটা না পাই।

আমার অন্যপাশের হাঁটাপথে, বারবিকিউ জয়েন্টে প্রবেশ পথের কাছে, কয়েকজন লোক পুরাতন দিনের মতো জড়ো হয়ে আড্ডা মারছিল। বারবিকিউর বাবুর্চি, সাদা রঙের একটা নোংরা অ্যাপ্রোন পরেছিল, তার ঢলে পড়া চুলগুলো ম্লান রোদের আলোয় লালচে আর ধাতব বলে মনে হচ্ছিল, আর ঠোঁটে গুঁজে রাখাছিল একটা সিগারেট, লোকটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল। বাচ্চা আর কয়েকজন বুড়ো ওদের সেই জটলার মাঝদিয়ে যাতায়াত করছিল এবং পাশেই দাঁড়িয়ে থেকে কয়েকজন বৃদ্ধ আর এক জোড়া সুন্দরী মহিলা অ্যাভিনিউ জুড়ে ঘটতে থাকা চলমান সব কিছুর দিকে এমনভাবে নজর রাখছিল, যেন তারাই একে অর্জন করে নিয়েছে বা এর দ্বারা অর্জন করেছে। ভালো, তারা সেটা দেখছে। জটলার মাঝে কালো তিন বোন ও এক ভাই ছিল। তারা খঞ্জনী বাজিয়ে তাদের বাইবেল থেকে আপন মনে গাইছিল। ভাইটি সাক্ষ্য দিচ্ছিল আর দু বোন তখন একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, যেন আমেন বলছে, এবং তৃতীয় বোন তার খঞ্জনীটা বাড়িয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করে আর কয়েকজন লোক তাতে মুদ্রা ফেলে। এরপর ভাইটির সাক্ষ্য শেষ হয় এবং যে বোনটি মুদ্রা সংগ্রহ করছিল সে এসে সেগুলো জড়ো করে তার লম্বা জামাটার পকেটে চালান করে। এরপর সে খঞ্জনীটা দিয়ে বাতাসে আর অন্য হাতে আঘাত করতে করতে দুহাত তুলে ধরে, গাইতে শুরু করে। এবং বাকি দুবোন আর ভাইটি তার সঙ্গে যোগদেয়।

হঠাৎ দেখে অবাক হই, যদিও জীবনভর আমি এইসব পথসভা দেখে আসছি। অবশ্য যে কেউ সেদিকে তাকাবে সেই অবাক হবে। তবু, ওরা বিরতি দেয় এবং দেখে আর শোনে আর জানালার কাছে স্থির

দাঁড়িয়ে থাকে। "এই হলো জিয়নের প্রাচীন জাহাজ"—ওরা গায় আর খঞ্জনী হাতে থাকা বোনটা একটানা ঝনঝন করে তাল ধরে, "এটা হাজার হাজার জনকে উদ্ধার করেছে!" সেই শব্দের আওতার মাঝে থাকা কেউই এই স্বর প্রথম শুনছে না, তাদের একজনকেও উদ্ধার করা হয়নি। এদের কেউই তাদের আশপাশে উদ্ধার কাজের খুব বেশি কিছু কখনোই দেখতে পায়নি। এদের কেউই আলাদা করে এই তিন বোন এবং ভাইয়ের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না, এরা সবাই ওদের সম্পর্কে অনেক বেশি জানে, জানে ওরা কোথায় থাকে, এবং কিভাবে। খঞ্জনী হাতে থাকা মেয়ে লোকটা, যার গলার স্বর বাতাসকে ছাপিয়ে যায়, যার চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে আছে, সে কাছে যে মহিলা দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে তার কাছ থেকে খানিকটা দূরে অবস্থান করে, সেই মহিলার পুরু খসখসে ঠোঁট দুটার মাঝে একটা সিগারেট আঁটা, তার চুলগুলো কোকিলের বাসার মতো, মুখটা অজস্র আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ফুলে আছে, আর কালো চোখ জোড়া কয়লার মতো জ্বলজ্বল করছে। খুব সম্ভবত ওরা দুজনেই তা জানে, কেন কখন কোনটা করতে হবে, কালেভদ্রে, ওরা একে ওপরকে সম্বোধন করে, ওরা একে ওপরকে বোন বলে ডাকে। গানের স্বরে বাতাস ভরাট হয়ে এলে দেখতে থাকা, শুনতে থাকা মুখগুলোতে একটা পরিবর্তন আসে, চোখগুলো কিছু একটার দিকে তাকিয়ে থাকে; মনে হতে থাকে সঙ্গীতের গরল তাদেরকে সত্যিসত্যি প্রভাবিত করেছে; এবং সময়টাকে একেবারে গুমোট, বৈরি বলে মনে হয়, ভগ্ন মুখগুলো যেন তাদের আগের অবস্থাতে ফিরে যায়, ঠিক শেষবার যখন স্বপ্ন দেখেছিল সেই অবস্থাতে। বারবিকিউ বাবুর্চি আধো মাথা ঝাঁকায় আর হাসে তাতে করে ঠোঁটের সিগারেটটা নিচে পড়ে হারিয়ে যায়। ভাংতির জন্য আসা একটা লোক তার পকেট হাতড়ায় এবং নোটটা হাতে ধরে ব্যগ্রতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন অ্যাভিনিউর কোথাও কারো সঙ্গে দেখা করার কথা মনে পড়ল। তাকে অনেকটাই ক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। এরপর আমি সনিকে দেখতে পাই, ভিড়ের একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতে বড় একটা সবুজ রঙের নোটবুক, আর তাতেই সে আমার নজর কাড়তে সক্ষম হয়, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে ওকে দেখতে একেবারে একটা স্কুলছাত্র বলে মনে হচ্ছিল। তামাটে সূর্যটা ওর ত্বকে একটা তামাটে আভা এনে দিয়েছিল, স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ও খুব মৃদু করে হাসছিল। তারপর গানটা থামে, খঞ্জনীটা আবারও মুদ্রা সংগ্রহের থালায় পরিণত হয়। ক্ষেপাটে লোকটা তাতে একটা মুদ্রা ফেলে মিলিয়ে যায়, সেই মহিলা দুজনও, আর সনি মৃদু হেসে মেয়ে লোকটার দিকে সরাসরি তাকিয়ে, সেই থালা থেকে ভাংতি পয়সা তুলে নেয়। সে সড়ক পেরিয়ে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে। খুব ধীর পায়ে হাঁটে, ঠিক হারলেমের আধুনিক লোকেদের মতো, কেবল ওর আগের আধো-হতবুদ্ধি ভাবটা তখনও রয়েছে। আগে সেটা কখনোই আমার চোখে পড়েনি।

আমি স্বস্তি আর উৎকন্ঠা এই দুটা জিনিস এক সঙ্গে মনের মাঝে পুষে, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। সনি আমার দৃষ্টির আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আবারও গেয়ে ওঠে। এবং যখন ওর চাবিটা তালা খুলে তখনও ওরা গাইছিল।

"এই"—ও বলে।

"এই"—তোমাকে বলছি। তুমি কি বিয়ার চাও?"

“না। ঠিক আছে, চাইলে দিতে পারো।” কিন্তু ও জানালার কাছে এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে, বাইরে তাকায়। “কী গরম স্বর”—ও বলে।

ওরা তখন গাইছিল—যদি শুনতে পেতাম আমার মা আবারও প্রার্থনা করছে!

“হ্যাঁ”—আমি বলি, “এবং সে ওই খঞ্জনীটা বাজাচ্ছে।”

“কিন্তু গানটা কী ভয়ানক”—ও বলে, হেসে ওঠে। সোফাতে নোটবুকটা রেখে রান্না ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

“ইসাবেল আর বাচ্চারা সব কোথায় ?”

“মনে হয় নানা নানুকে দেখতে গেছে। তোমার ক্ষুধা লেগেছে?”

“না।” বিয়ারের ক্যান হাতে ও বসার ঘরে ফিরে আসে। “তুমি কি আজকে রাতে আমার সঙ্গে কোথাও যেতে চাও?”

বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে বলব, সম্ভবত তাই আর না বলা হয়ে ওঠে না।

“অবশ্যই, কোথায়?”

ও সোফায় বসে নোটবুকটা নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকে। “আমি গ্রামের একটা জায়গাতে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে বসতে যাচ্ছি।”

“মানে, আজকে রাতে তুমি বাজাবে?”

“ঠিক ধরেছো।” ও ওর বিয়ারে একটা চুমুক দেয় এবং জানালার কাছে ফিরে আসে। পাশ থেকে আমাকে দেখে। “তুমি যদি সহ্য করতে পারো।”

“আমি চেষ্টা করব”—আমি বলি।

ও একা একাই হাসে এবং আমরা দুজনেই রাস্তার ওপাশে ভিড়ের দিকে তাকাই। তিন বোন আর এক ভাই এক সঙ্গে মাথা নুইয়ে গাইছে—আবারও দেখা হওয়া পর্যন্ত প্রভু যেন তোমার সঙ্গে থাকেন। ওদের ঘিরে থাকা মুখগুলো তখন খুবই শান্ত। এরপর গানটা শেষ হয়। ছোট্ট ভিড়টা মিলিয়ে যায়। আমরা তখন দেখি তিন বোন আর সেই একা লোকটা সড়ক ধরে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে।

“মহিলা আগে যখন গেয়েছিল”—হঠাৎ, সনি বলে ওঠে, “তার স্বর মিনিট খানেকের জন্য আমাকে হেরোইনের স্বাদ কেমন তা বুঝতে সাহায্য করেছিল—যখন সেটা শিরার ভেতরে থাকে। এটা একই সঙ্গে তোমাকে এক ধরনের শীতলতা এবং উষ্ণতার অনুভূতি দেবে। এবং দূরের। এবং—এবং নিশ্চিত। ” ইচ্ছে করেই ও আমার দিকে না তাকিয়ে বিয়ারে চুমুক দেয়। আমি ওর মুখটা দেখি। “এটা তোমাকে পরশ দেবে—নিয়ন্ত্রণের। কখনো সখনো তোমার এমন অনুভূতি হয়েছিল।”

“হয়ে ছিল কি?” আমি ধীরে আরাম চেয়ারে বসি।

“কখনো সখনো।” ও সোফার কাছে গিয়ে আবারও নোটবুকটা হাতে তুলে নেয়। “কিছু লোক করে।”

“বাজাবার”—আমি জিজ্ঞেস করি, “জন্যে?” আমার গলার স্বর ছিল খুবই বিশ্রী, ঘৃণা আর ক্ষোভে ভরা।

“ভালো”—ও প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার চোখে আমার দিকে তাকায়, যেন সত্যিসত্যি, সে আশা করেছে তার চোখ দুটা আমাকে এমন কিছু বলছে সেটা ছাড়া অন্যকিছু বলা সম্ভব নয়—“ওরা এমনই মনে করে। এবং যদি তারা এমনই মনে করে—!”

“আর তোমার কী মনে হয়?” আমি জিজ্ঞেস করি।

আমি আরো বেশি কিছু বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। আমি কথা বলতে চাই ইচ্ছাশক্তি এবং জীবন কেমন করে—ভালো, সুন্দর হতে পারে। আমি বলতে চাই এর সবটা ভেতরেই থাকে; তবে আগে কি ছিল না? অথবা, বরং, সেটাই কি সত্যিকার সমস্যা ছিল না? আর আমি অঙ্গীকার করতে চেষ্টা করি যে আর কখনোই ওকে আবারও হেরে যেতে দেব না। কিন্তু এর সবই—ফাঁকা বুলি আর মিথ্যা বলে মনে হয়

ও সোফায় বসে এবং বিয়ারের ক্যানটা মেঝেতে রাখে। “আমি জানি না”—ও বলে, এবং আমি নিশ্চিত নই ও কি আমার প্রশ্নের জবাব দিল নাকি নিজের ভাবনা হাতড়ে বেড়ালো। ওর মুখ দেখে তা বোঝা যায় না। “বাজাবার সঙ্গে এর খুব একটা সম্পর্ক নেই। একে এর মাঝেই দাঁড়াতে হয়, অন্তত একে সক্ষম হতে হয়। যেকোন পর্যায়ে।” ও ভ্রু কুঁচকায় এবং হাসে। “ঝাঁকিয়ে গানের কলি বের করতে। ”

"কিন্তু তোমার সেই বন্ধুরা"—আমি বলি, "ওদের দেখে মনে হয় ঝাঁকিয়ে ওরা দ্রুত নিজেদেরই টুকরো করে ছাড়ছে।"

"হতে পারে।"

সে নোটবুকটা নিয়ে খেলতে শুরু করে। এবং আমাকে এমন কিছু একটা বলে যাতে আমি আমার জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখি, যাতে সনি ভালো মতো কথা বলতে পারে, যাতে আমি শুনি। "কিন্তু তুমি কেবল একজনের কথা জানো যে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। কেউ কেউ ভাঙ্গেনি—অথবা অন্তত ওরা এখন পর্যন্ত তার ছোঁয়া পায়নি এবং শুধু এটাই আমাদের যে কেউ বলতে পারে।" ও থামে। "এবং কেউ কেউ আছে যারা কেবল বেঁচে থাকে, সত্যি সত্যি দোযখে বসবাস করে আর সেটা ওরা জানে আর কী ঘটছে সেটা ওরা দেখে আর ওরা ঠিকঠাক মতো চলে। আমি তা জানি না।" ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নোটবুকটা নামিয়ে রেখে, হাত ভাঁজ করে। "কেউ কেউ, তুমি বলতে পারো তারা ওরকমভাবেই বাজায়, তারা সব সময় কোনো না কোনো কিছুর ওপর থাকে। আর তুমি সেটা চাক্ষুষ দেখতেও পাবে, এটা ওদের জন্য কোনো কিছুকে বাস্তব করে তোলে। কিন্তু অবশ্যই"—ও মেঝে থেকে বিয়ারটা তুলে নেয় এবং তাতে চুমুক দেয় এবং আবারও ক্যানটা নামিয়ে রাখে, "ওরা সেটা চায়ও, তুমি সেটা দেখে এসেছো। এমনকি ওদের কেউ কেউ বলে বেড়ায় ওরা এসব নেয় না—কেউ কেউ, সবাই নয়। "

"আর তোমার কী খবর?" আমি জিজ্ঞেস করি—কিছু করার থাকে না। "তোমার কী খবর? তুমি কী চাও?"

ও উঠে দাঁড়ায় এবং হেঁটে জানালার কাছে যায়। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "আমি"—ও বলে। তারপর: "আগে যখন আমি সিঁড়ির নিচে থাকতাম, এখানে উঠে আসার সময়, সেই মহিলার গান শুনতে পেতাম, সেটা আমাকে হঠাৎই আঘাত করে জানান দিত কতটা দুর্ভোগের মাঝ দিয়ে সে যাচ্ছে—যে এভাবে গাইছে। সেটা বুঝতে হলে তোমাকেও অনেক বেশি ভুগতে হবে।"

আমি বলি: "কিন্তু কষ্ট না পেয়ে তো কোনো উপায় নেই—আছে কি, সনি?"

"আমার বিশ্বাস নেই"—ও বলে এবং হাসে, "কিন্তু সেটা কাউকে চেষ্টা থেকে বিরত রাখবে না।" সে আমার দিকে তাকায়। "রেখেছে কি?" আমি সেই উপহাসের চাহনি দেখে বুঝতে পারি আমাদের মাঝে যা দাঁড়িয়ে গেছে তা সময়ের ক্ষমতা বা ক্ষমাশীলতার বাইরে, এই সত্যটা উপলব্ধি করবার পর আমি

চুপ থাকি—বহুক্ষণ!—কখন ওর সাহায্যের জন্য মানুষের কথা দরকার হয়। ও জানালার দিকে ফিরে। "না, না ভুগে কোনো উপায় নেই। কিন্তু এর মাঝে ডুবে যাওয়া ঠেকাতে তোমাকে সব রকম চেষ্টাই করতে হবে, এর ওপর ভেসে থাকতে, এবং একে দৃশ্যমান করতে—ভালো, তোমার মতো। তুমি ঠিকঠাক কিছু একটা করেছো তার মতো, আর এখন তুমি অধীর হয়ে ভুগছো, "লোকে কেন ভোগে? হতে পারে এর কোনো একটা বা যেকোন কারণ দাঁড় করাবার চাইতে কোনো কিছু করাই আসলে ভালো।"

"কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলাম"—আমি বলি, "যে কষ্ট না পেয়ে আসলে কোনো উপায় নেই। এটাই কি ভালো নয়, এরপর, কেবল—একে গ্রহণ করা?"

"কিন্তু কেউই একে এমনি এমনি মেনে নেবে না"—সনি চিৎকার করে ওঠে, "সেইটাই আমি তোমাকে বলছি! সবাই একে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। তুমি কেবল কিছু কিছু লোক যেমনটা চেষ্টা করে সেটা নিয়ে পড়ে রয়েছো—এটা তোমার কাজ নয়!"

আমার মুখের পশমগুলো চুলকাতে থাকে, মুখটা ভেজা মনে হয়। "কথাটা সত্য নয়"—আমি বলি, "কথাটা সত্য নয়। অন্য লোকেরা যা করে আমি তার পরোয়া করি না, এমনকি ওরা কিভাবে ভোগে আমি তারও পরোয়া করি না। তুমি কিভাবে ভুগছো আমি কেবল সেটা নিয়েই চিন্তিত।" এবং ও আমার দিকে তাকায়। "দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করো"—আমি বলি, "আমি তোমাকে দেখতে চাই না—মরেছো—না ভুগতে চেষ্টা করে।"

"আমি তা করছি না"—আমার মুখের ওপর ও বলে, "না ভুগতে মরার চেষ্টা। অন্তত, কারো আগে নয়।"

"কিন্তু সেটার কোনো দরকার নেই"—হাসতে চেষ্টা করে আমি বলি, "আছে কি? তোমার নিজেকে হত্যা করার।"

আমি আরো বেশি কিছু বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। আমি কথা বলতে চাই ইচ্ছাশক্তি এবং জীবন কেমন করে—ভালো, সুন্দর হতে পারে। আমি বলতে চাই এর সবটা ভেতরেই থাকে; তবে আগে কি ছিল না? অথবা, বরং, সেটাই কি সত্যিকার সমস্যা ছিল না? আর আমি অঙ্গীকার করতে চেষ্টা করি যে আর কখনোই ওকে আবারও হেরে যেতে দেব না। কিন্তু এর সবই—ফাঁকা বুলি আর মিথ্যা বলে মনে হয়।

তাই সেই অঙ্গীকারটা আমি নিজের কাছে করি এবং প্রার্থনা করি যে আমি তা রাখব।

"ভেতরে ভেতরে, এটা কখনো কখনো খুবই ভয়ানক"—ও বলে, "সেটাই আসল সমস্যা। তুমি এসব শীতল, কালো, ভয়ানক পথ ধরে হেঁটে যাবে এবং কথা বলার জন্য সেই পথে জীবন্ত কোন গাধা পর্যন্ত খুঁজে পাবে না, এবং সেখানে ঝাঁকাবার জন্য কিছুই নেই, এবং এর থেকে বেরুবারও কোনো পথ নেই—ভেতরকার সেই ঝড় থেকে। তুমি এর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না এবং তুমি একে ভালোও বাসতে পারবে না, এবং শেষে যখন এর সঙ্গে থাকতে আর বাজাতে চেষ্টা করবে, তখনই কারো না শুনবার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। তাই তোমাকে শুনতে হয়েছে। শুনবার জন্য একটা পথ খুঁজে নিতে হয়েছে।"

এবং এরপর সে হেঁটে জানালার কাছ থেকে সরে আসে এবং আবারও সোফায় এসে বসে, যেন হঠাৎই সব বাতাস মিলে একসঙ্গে ওকে ঠেলতে শুরু করেছে। "কখনো কখনো বাজাবার জন্য তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে, এমনকি নিজের মায়ের গলাটা পর্যন্ত কাটতে দ্বিধা করবে না।" ও হাসে এবং আমার দিকে তাকায়। "নতুবা তোমার ভাইয়ের।" তারপর গম্ভীর স্বরে বলে। "নতুবা তোমার নিজেরটা।" তারপর বলে: "চিন্তা করো না, আমি এখন ঠিক আছি এবং আমি মনে করি আমি ঠিকই থাকব। কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না—আমি কোথায় ছিলাম। আমি কেবল বাস্তব কোনো জায়গায় থাকার কথা বোঝাচ্ছি না, বলতে চাইছি আমি কোথায় ছিলাম এবং আমি কী করেছি।"

"তুমি কী করেছো, সনি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

সে হাসে—তবে সোফায় পাশ ফিরে বসে, কনুই পেছনে হেলান দিয়ে রেখে, আঙ্গুলের সাহায্যে মুখ আর থুতনি জুড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, আমার দিকে তাকাচ্ছে না। "আমি এমন কিছু একটা ছিলাম যা আমি চিনে উঠতে পারিনি, জানতামও না আমি তা হতে পারি। জানতাম না কেউ তা হতে পারে।" ভেতরের দিকে তাকিয়ে, ও থামে, একই সঙ্গে ওকে অসহায় যুবক আর বৃদ্ধের মতো মনে হয়। "এখন আমি এটা নিয়ে কথা বলছি না তার কারণ নিজেকে আমার দোষী বলে মনে হচ্ছে বা সেরকম কিছু একটা—হতে পারে সেটা পারলে অনেক ভালো হতো, আমি জানি না। যাই হোক, সত্যি বলতে কি আমি এটা নিয়ে কথা বলতে পারছি না। তোমার সঙ্গে নয়, কারো সঙ্গে নয়"—এবং এবার সে ঘুরে আমার দিকে মুখ করে। "কখনো কখনো, তুমি জানো, এবং বাস্তবে আমি যখন সবচেয়ে বেশি পৃথিবীর বাইরে থাকি, আমার মনে হয় আমি এর ভেতরে রয়েছি, যেন আমি এর সঙ্গে রয়েছি, সত্যি, এবং আমি বাজাতে পারি অথবা সত্যিই আমি বাজাতে পারি না, এটা কেবল আমার ভেতর থেকে বেরয়, এটা ওখানেই ছিল। আর আমার জানা নেই কী করে বাজিয়েছি, সেটা নিয়ে এখন ভাবছি, কিন্তু

কেমন করে আমি জানলাম আমি ভীষণ রকমের একটা জিনিস করেছি, সেই সময়, কখনো কখনো, লোকেদের দিকে। অথবা ওদের দিকে কিছুই করিনি—এটা এমন ছিল যেন ওরা বাস্তব ছিল না।" সে বিয়ারের কৌটাটা তুলে নেয়; সেটা ছিল ফাঁকা; সে তার দুহাতের মাঝে সেটা পাকায়: "এবং অন্যান্য সময়—ভালো, আমার একটু স্থিরতা দরকার ছিল, ঠেস দেবার জন্য আমার একটা চমৎকার জায়গার দরকার ছিল, শুনবার জন্য একটা পরিচ্ছন্ন জায়গা—এবং আমি সেটা পাইনি, এবং আমি—পাগল হয়ে যাই, নিজের প্রতি ভয়ানক সব কাজকারবার করতে শুরু করি, নিজের কাছে ভয়ানক হয়ে উঠি।" সে দুহাত দিয়ে বিয়ারের কৌটাতে চাপ দিতে থাকে, আমি সেই ধাতব গোঙানি শুনতে পাই। সেটা চকচক করছিল, যখন ও সেটা নিয়ে খেলছিল, একটা ছুরির মতো, এবং আমার ভয় হচ্ছিল ও হয়ত হাত কেটে ফেলবে, তবু আমি কিছুই বলি না। "ওহ ভালো। আমি কখনোই তোমাকে বলতে পারিনি। আমি কোনো কিছুর তলানিতে ছিলাম, দুর্গন্ধে, ঘামে ভিজে, কেঁদে কাঁপতে কাঁপতে আমি তার গন্ধ শুঁকি, তুমি জানো? আমার দুর্গন্ধ, আর আমার মনে হয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পরলে আমি মরে যাব এবং একইভাবে আমি এও জানতাম যে যা কিছুই করছি তাতে করে এর মাঝে আরো বেশি নিজেকে বন্দী করে ফেলছি। আর আমি জানতাম না।"

সে থামে, তখনও বিয়ারের কৌটাটাকে চ্যাপ্টা করছে, "আমি জানতাম না, এখনো পর্যন্ত আমি জানি না, কিছু একটা আমাকে বলছিল নিজের দুর্গন্ধ শুঁকা হয়ত ভালো কিছুই হবে, কিন্তু আমার মনে হয়নি আমিও সেটাই করতে চেষ্টা করেছি—এবং—কে এর বিরোধিতা করতে পারত?" এবং হঠাৎই সে দুমড়ানো বিয়ারের কৌটাটা ফেলে দিয়ে, আমার দিকে ছোট্ট একটা হাসি দেয়, স্থির হাসি, এবং তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, এমনভাবে জানালার দিকে এগিয়ে যায় যেন চুম্বকের আস্ত একটা পাথর। আমি ওর মুখটা দেখি, ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। "মা যখন মারা যান কথাটা তোমাকে বলতে পারিনি—কিন্তু আমি হারলেম ছাড়তে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম মাদক ছাড়বার জন্যে। এবং তারপর, যখন আমি দূরে চলে যাই, সত্যি বলতে কি, একারণেই আমি দূরে চলে গিয়েছিলাম। যখন আমি ফিরে আসি, ততদিনে কোনো কিছুই বদলায়নি, আমিও বদলাইনি, আমার কেবল—বয়স বেড়েছে।" এবং ও থামে, জানালার শার্সির ওপর আঙুল দিয়ে আঘাত করতে থাকে। সূর্যটা মিলিয়ে গেছে, খুব শীঘ্র চারদিকে আঁধার নেমে আসবে। আমি ওর মুখটা দেখি। "এটা আবারও ফিরে আসতে পারে"—ও বলে, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর আমার দিকে ফিরে। "এটা আবারও ফিরে আসতে পারে"—ও আবারও বলে। "আমি কেবল তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাইছি।"

"ঠিক আছে"—শেষে, আমি বলি। "তাই এটা আবারও ফিরে আসতে পারে। ঠিক আছে।"

ও হাসে। কিন্তু হাসিটা বিষাদময়। "আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম"—ও বলে।

"হ্যাঁ"—আমি বলি। "আমি সেটা বুঝতে পেরেছি।"

"তুমি আমার ভাই"—আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে, এবং একটুও না হেসে, সে বলে।

"হ্যাঁ"—আমি আবারও বলি, "হ্যাঁ। আমি সেটা বুঝতে পেরেছি।"

ও জানালার দিকে ঘুরে, বাইরে তাকায়। "সব ঘৃণা ওইখানে নিচে"—ও বলে, "সব ঘৃণা এবং রহস্য আর ভালোবাসা। এটা একটা বিস্ময় যে এটা অ্যাভিনিউটাকে উড়িয়ে দূরে সরিয়ে দেয় না।"

আমরা ডাওন টাওনের অন্ধকার পথ পেরিয়ে কাছের একমাত্র নাইটক্লাবে যাই। সরু, কোলাহলময়, লোকজনে ঠাসা বারের বড় কামরার প্রবেশ পথ ঠেলে ভেতরে ঢুকি, যেখানে গানের মঞ্চ। ঘরটার আলো খুব কম হওয়ায়, কিছু দেখতে না পেয়ে, কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর, "হ্যালো, বয়"—কেউ একজন বলে ওঠে আর প্রকাণ্ড একটা কালো লোক, সনি বা আমার থেকে অনেক বড়, আলোর ঝলকানির মাঝে হঠাৎ করেই কোথা থেকে যেন এসে হাজির হয় এবং সনির কাঁধ ঘিরে একটা হাত রাখে। "আমি এখানেই বসে ছিলাম"—সে বলে, "তোমার অপেক্ষায়।"

লোকটার গলার স্বরও খুব ভারী, এবং অন্ধকারে মাথাগুলো আমাদের দিকে ফিরে।

সনি দাঁত বের করে হাসে এবং টেনে খানিকটা দূরে সরে যায়, আর বলে, "ক্রেওলে এইটা হচ্ছে আমার ভাই। আমি তোমাকে ওর কথা বলেছি।"

ক্রেওলে আমার সঙ্গে হাত মেলান। "তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি খুবই খুশি, বাবা"—সে বলে, আর এটা খুবই স্পষ্ট যে সনির কারণে সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে পেরে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। এবং সে হেসে বলে, "আপনারা আপনাদের পরিবারে সত্যিকারের একজন মিউজিসিয়ান পেয়েছেন"—এবং তিনি সনির কাঁধ থেকে হাতটা সরান এবং মমতার সঙ্গে, হাতের উল্টো পাশটা দিয়ে, হালকা করে, ওকে চাপড় মারেন।

সে যা বাজাতে চায় তাকে সেটাই বাজাতে জানতে হয়। এবং একটা পিয়ানো কেবলই একটা পিয়ানো। এটা অনেকগুলো কাঠ আর তার আর ছোট বড় কয়েক গোছা হাতুড়ি আর হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। যদি একে নিয়ে খুব বেশি কিছু করার ইচ্ছে থাকে তাহলে সেটা আপনাকে নিজের চেষ্টার মাধ্যমেই খুঁজে নিতে হবে, চেষ্টার মাধ্যমে এবং কেবল এর মাধ্যমেই একে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নেয়া সম্ভব

"ভালো, এবার আমি সবটা শুনলাম"—পেছন থেকে কেউ একজন বলে ওঠে। এটা ছিল অন্য একজন মিউজিসিয়ান এবং সনির বন্ধু, দেখতে একেবারে কয়লার মতো কালো, চাহনি উচ্ছল, গড়নে একেবারে খাটো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে একেবারে বুকের ভেতর থেকে ফিসফিস করে, সনি সম্পর্কে সবচেয়ে ভয়ানক গোপন একটা কথা বলতে শুরু করে, তার দাঁতগুলো লাইট হাউজের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল আর তার হাসিটা ভূমিকম্প শুরুর মতো মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল। আর তাতে করে এটা বোঝা যায় যে বারের প্রত্যেকে বা কমবেশি সবাই সনির সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত, এদের কেউ কেউ মিউজিসিয়ান, এখানে কাজ করে, বা কাছাকাছি কোথাও থাকে, বা এখানে কাজ করে না, কেউ কেউ কেবল লাভের আশায় ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে এসেছে এবং কেউ কেউ শুধু সনির বাজানো শুনতেই এখানে এসেছে। তাদের সবার সঙ্গেই আমি পরিচিত হই এবং তাদের সবাই আমার সঙ্গে মার্জিত ব্যবহার করে। যদিও তাদের সবার কাছে এটা স্পষ্ট ছিল, আমি কেবল সনির ভাই। এখানে, আমি সনির জগতের ভেতর। অথবা, বরং বলা যায়: সনির রাজত্বে। এখানে, এমন প্রশ্নও আসতে পারে না, আদৌ তার শিরায় রাজ রক্ত বইছে কিনা।

খুব শীঘ্রই ওরা বাজাতে শুরু করে এবং ক্রেওলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার কোণের দিকে একটা টেবিল ঘিরে বসে। এরপর আমি ওদের দেখতে থাকি, ক্রেওলে এবং কালো বেটে লোকটা এবং সনি আর অন্যদের, যখন ওরা মঞ্চের একেবারে নিচে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছিল। মঞ্চের আলো ছাপিয়ে এসে খানিকটা ওদের ওপরও পড়ছিল এবং, তাতে করে ওদের হাসি, অঙ্গভঙ্গি আর নড়াচড়া চোখে পড়ছিল, তারপরও আমার মনে হচ্ছিল খুব শীঘ্র আলোর বৃত্তের মাঝে পা না রাখতে ওরা সব থেকে বেশি সতর্ক ছিল: তাই ওরা আলোক বৃত্তের মাঝ দিয়ে না বুঝেই এমনভাবে চলাচল করছিল, যেন ওরা একে একে শিখার মাঝে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এরপর, আমি ওদের একজনকে দেখতে পাই, সেই ছোট্ট, কালো লোকটা, আলোর ভেতর দিয়ে, মঞ্চ অতিক্রম করে এবং তার ড্রামস নিয়ে ভাঁড়ামি শুরু করে। এরপর—কৌতুক করে এবং একই সঙ্গে খুব আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে—ক্রেওলে সনির হাত ধরে এবং তাকে পিয়ানোর দিকে নিয়ে যায়। একজন মহিলা সনির নাম ধরে ডেকে ওঠে এবং কয়েক জোড়া হাত হাততালি দিতে শুরু করে। এবং সনিও, কৌতুক করে এবং আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে এবং খুব আবেগী ভঙ্গিতে, আমার মনে হচ্ছিল ও কেঁদে ফেলবে, তবে তা লুকাতে বা দেখাবার চেষ্টা না করে, একজন পুরুষের মতো, দাঁত বের করে হাসে এবং তার দুহাত বুকে রাখে এবং কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে সবাইকে অভিবাদন জানায়।

এরপর ক্রেওলে বেজ বেহালার কাছে যায় এবং একটা রোগা, আর খুব ফর্সা চামড়ার বাদামি লোক লাফিয়ে মঞ্চে উঠে তার বিষাণটা হাতে তুলে নেয়। এভাবে যে যার জায়গায় অবস্থান নেয় এবং মঞ্চ আর ঘরের পরিবেশ বদলে টানটান হয়ে ওঠে। কেউ একজন মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে যায় এবং একে একে সবার নাম ঘোষণা করে। তারপর চারদিক থেকে নানা ধরনের ফিসফিস শুনতে পাওয়া যায়। বারের কেউ একজন সবাইকে চুপ করতে বলে। পরিচারিকা এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে

থাকে, উদ্বেগের সঙ্গে, শেষবারের মতো ফরমায়েশ নিতে থাকে, ছেলে আর মেয়েরা একে অপরের আরো কাছাকাছি হয়, আর মঞ্চের আলোগুলো, আর ওর ওপরকার সেই চারজন বাজিয়ে, কেমন যেন একটা ধূম্রনীলে পরিণত হয়। তাই ওদের সবাইকে ওখানে দেখতে অন্যরকম লাগছিল। ক্রেওলে শেষবারের মতো পরখ করে নেয়, যেন দেখছিল তার সবগুলো ছানা খাঁচায় ঢুকেছে কিনা, এবং এর পরপরই সে—লাফিয়ে ওঠে এবং বেহালায় ঝংকার তোলে। এবং অন্যরাও বাজাতে শুরু করে।

সঙ্গীত সম্পর্কে আমার যতদূর জ্ঞান অনেক লোক সেসব কানেও শোনেনি। আর তারপরও, কোনো কোনো দুর্লভ সময়ে যখন কোনো কিছু খোলা হয়, আর তার সঙ্গে গান বাজানো হয়, মূলত আমরা তখন যা শুনে থাকি, অথবা মনোযোগ দিয়ে শুনি, তাতে ব্যক্তিগত, নিজস্ব কিছু বিস্মৃত স্মৃতিচারণ থাকে। কিন্তু যারা গান বানায় তাদের এর থেকেও বেশি কিছু শুনতে হয়, তার রিক্ততা থেকে ফুসে ওঠা আর বাতাসে আঘাত হানা আর্তচিৎকারের সঙ্গে লেনদেন করতে হয়। যা তার স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে, এরপর, অন্যকিছু মনে করিয়ে দেয়, সেটা আরো বেশি ভয়ানক কেননা তাতে কোনো শব্দ থাকে না, এবং একই কারণে তাতে বিজয়োন্মত্ততাও থাকে। আর ওর এই বিজয়, যখন ও কোনো কিছুতে জিতে যায়, সেটা একপ্রকারে আমাদেরও জেতা। আমি শুধু সনির মুখের দিকে চেয়ে দেখি। ওর মুখে ঝঞ্ঝার ছাপ, ও খুব পরিশ্রম করেছে, কিন্তু ও তখন বাজাচ্ছিল না। আর ঘটনাক্রমে আমার মনে হতে থাকে, মঞ্চের সবাই ওর জন্য অপেক্ষা করছে, উভয়পক্ষ ওর জন্য অপেক্ষা করছে এবং একসঙ্গে ওকে ঠেলছে। কিন্তু যখনই আমি ক্রেওলেকে দেখতে শুরু করি, আমি বুঝতে পারি যে ক্রেওলেই ওদের সবাইকে পেছন থেকে আঁকড়ে রয়েছে। সে ওদের ওপর অল্পবিস্তর বর্ষণ করছিল। বেহারার বিলাপের সঙ্গে, তালে তালে সমস্ত শরীর দোলাচ্ছিল, আধো চোখ বুজে, সে সব কিছুই শুনলেও, সনির বাজানো শুনছিল। সে সনির সঙ্গে কথা বলে। সে চাইছিল সনি বেলাভূমি ছেড়ে গভীর জলে ডুব দিক। সে ছিল সেই গভীর জলে সনির দ্রষ্টা আর টেনে নিয়ে যাওয়াটা সেই একই জিনিস ছিল না—সে সেখানেই ছিল, আর সে সেটা জানত। আর সে চাইছিল সনিও সেটা জানুক। সে অপেক্ষা করছিল সনি এমন করে বাজাক যাতে ক্রেওলে বুঝতে পারে সনি জলের ভেতরে রয়েছে।

এবং, ক্রেওলে যখন শুনছিল, সনি নড়ে ওঠে, গভীরভাবে, প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে যেমনটা হয়। আমার আগে কখনোই জানার সুযোগ হয়নি গাইয়ে আর তার বাদ্যের মাঝে কী চমৎকার সম্পর্ক হতে পারে। তাকে সেটা অনুভব করতে হয়, যন্ত্রটাকে, নিজের জীবনের দমের ভেতর থেকে। সে যা বাজাতে চায় তাকে সেটাই বাজাতে জানতে হয়। এবং একটা পিয়ানো কেবলই একটা পিয়ানো। এটা অনেকগুলো কাঠ আর তার আর ছোট বড় কয়েক গোছা হাতুড়ি আর হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। যদি একে নিয়ে খুব বেশি কিছু করার ইচ্ছে থাকে তাহলে সেটা আপনাকে নিজের চেষ্টার মাধ্যমেই খুঁজে নিতে হবে, চেষ্টার মাধ্যমে এবং কেবল এর মাধ্যমেই একে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নেয়া সম্ভব।

আর সনি বছর খানেক ধরে পিয়ানোর কাছে ছিল না। আর তার নিজের জীবনের সঙ্গে খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না, এখন যে জীবন তার সামনে প্রসারিত সেটা এরকমও ছিল না, সে এবং পিয়ানোটা তোতলাতে থাকে, কোনো রকমে বেজে ওঠে, ভীত হয়ে, থেমে যায়; অন্যভাবে বেজে, আঁতকে ওঠে, সময়টাকে চিহ্নিত করে, আবারও বাজতে শুরু করে; এরপর মনে হয় দিক খুঁজে পায়, আবারও ভয়ে, থেমে যায়। এবং সনির যে মুখটা আমি দেখি তা আগে কখনোই দেখিনি। সব কিছুই তাতে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবার অবস্থা, সেখানে তার ভেতরে ক্রোধ আর আবেগের মাঝে যে যুদ্ধটা চলছিল তাতে সাধারণত যেসব জিনিস গোপন থাকে তা পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়।

তবু, ক্রেওলের মুখটা এমন দেখাচ্ছিল যেন তারা এইমাত্র প্রথম অংশটা শেষ করতে যাচ্ছে, আমার মনে হতে থাকে কিছু একটা ঘটে গেছে, এমন কিছু যা আমি শুনিনি। এরপর ওরা শেষ করে, ছড়ানো ছিটানোভাবে এদিক সেদিক থেকে করতালি পড়তে শুরু করে, এবং এরপর, তৎক্ষণাৎ কিছু জানান না দিয়েই, ক্রেওলে অন্য কিছু বাজাতে শুরু করে, এটা ছিল একেবারেই বিদ্রূপাত্মক, এটা ছিল—এম আই ব্লু। এবং সে নির্দেশ দেবার পরপরই সনি বাজাতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা ঘটতে শুরু করে। আর ক্রেওলেও বর্ষণ হতে দেয়। সেই শুকনো, খাটো, কালো লোকটা তার ড্রামসে ভয়াবহ কিছু একটা বলতে শুরু করে, ক্রেওলে জবাব দেয়, এবং তার জবাবে ড্রামসটাও বলে ওঠে। এরপর আকুল সুরে বিষাণটা বেজে ওঠে, মিষ্টি আর উঁচু স্বরে, সম্ভবত খানিকটা বিচ্ছেদের সুরে, এবং ক্রেওলে শুনে, মাঝে মধ্যে সুন্দর, শান্ত, পুরনো, আর শুকনো মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে থাকে। তারপর আবারও সবাই একসঙ্গে বাজাতে শুরু করে, আর সনি আবারও সেই পরিবারের একজন সদস্যে পরিণত হয়। ওর মুখ দেখেই আমি সেটা বলে দিতে পারি। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল নিজের আঙুলের নিচে যেন সে একেবারে নতুন একটা পিয়ানো খুঁজে পেয়েছে। মনে হচ্ছিল ও আগেকার সেই জড়তাটা কাটিয়ে উঠেছে। তারপর কিছুক্ষণের জন্য, সনিকে ভার মুক্ত পেয়ে, মনে হচ্ছিল ওরা সবাই ওর সঙ্গে সায় দেয় যে একেবারে নতুন সেই পিয়ানোটা বুঝি গ্যাস।

ক্রেওলে সামনে এগিয়ে এসে সবাইকে মনে করিয়ে দেয় যে তারা যা বাজাচ্ছে তা আসলে ব্লুজ। সে ওদের সবার ভেতরে কোথাও আঘাত করে, সে আমার ভেতরে কোথাও আঘাত হানে, আমাকে, এবং বাজনাটা আরো আঁটসাঁট আর গভীর হয়, সেই বোধ বাতাসে ঝংকার তোলে। ক্রেওলে আমাদের বলতে শুরু করে ব্লুজ বলতে আসলে কী বোঝায়। সেটা আসলে নতুন কোনো কিছু নয়। সে এবং তার ছেলেরা মঞ্চে সেটাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করছে, ধ্বংস, বিনাশ, পাগলামী, এবং মৃত্যু ঝুঁকির পরও, যাতে নতুনভাবে নতুন কিছু আমাদের শোনাতে পারে। যেন, আমরা যেভাবে কষ্ট পাই, ভুগি, এবং আমরা যেভাবে আনন্দিত হই, এবং আমরা যেভাবে জিতে যাই সেইসব গল্পের কোনোটাই আসলে নতুন নয়, যেন, সেটা আমরা সব সময়ই শুনে আসছি। যেন, বলার জন্য আর কোনো গল্প বাকি নেই, এটা কেবল এই আস্ত অন্ধকারের মাঝে দেখতে পাওয়া একমাত্র আলো।

এবং সেই মুখ, সেই শরীর, তারের ওপরকার সেই মজবুত হাতগুলোর অনুসারে, সব দেশেই এই গল্পের অন্য একটা অবয়ব রয়েছে, এবং সব প্রজন্মের কাছে এর নতুন একটা গভীরতা রয়েছে। শোনার চেষ্টা করুন, ক্রেওলে যেন বলছে, একটু শোনার চেষ্টা করুন। এখন এর সবই সনির ব্লুজ। সে সেই খাটো কৃষ্ণাঙ্গ লোকটার ড্রামসকে তা শিখিয়ে ছেড়েছে, বাদামি লোকটার বিষাণটাকে। ক্রেওলে আর সনিকে জলে নামাবার চেষ্টা করছে না। সে কেবল তার এই বাজাবার সফলতা কামনা করছে। এরপর সে পিছিয়ে যায়, খুব ধীরে, এই অপরিমেয় আভাসে বাতাসকে পূর্ণ করে যে সনি এখন নিজের কথা বলছে।

তারপর তারা সবাই সনিকে ঘিরে জড়ো হয় এবং সনি বাজাতে থাকে। মাঝে মধ্যে তাদের কেউ কেউ এর ফাঁকে ফাঁকে বাজিয়ে ওঠে এবং মনে হয় কেউ একজন যেন বলে উঠল, আমেন। সনির আঙ্গুলগুলো চারপাশের বাতাসকে পুরোপুরি জীবন্ত আর ভরপুর করে তোলে, তার জীবনের সাহায্যে। কিন্তু সেই জীবন অন্য আরো অনেককে ধারণ করে। এবং সনি আবার প্রথমে ফিরে যায়, সে আসলে অতিরিক্ত একটা দিয়ে শুরু করে, গানের খোলামেলা কথার সরল উক্তিতে। গানটা ছিল খুবই সুন্দর কেননা তাতে কোনো তাড়া ছিল না এবং কোনো প্রকার বিলাপও না। মনে হচ্ছিল আমি যে যন্ত্রণাময় গানটা শুনছি সেটাকে সে নিজের করে নিয়েছে, আমাদেরও যা পোড়াচ্ছিল তা আমরা নিজের করে নিয়েছিলাম, কেমন করে আমরা সেই শোক এড়াতে পারি। আমাদের ভেতর মুক্তি ওত পেতে ছিল এবং আমি সেটা টের পাই, অবশেষে, তাই সে আমাদের মুক্তিতে সাহায্য করে যদি আমরা তা শুনি, তাই আমাদের ছাড়া সে কখনোই মুক্ত হতে পারে না। তবু ওর মুখে এখন যুদ্ধের কোনো ছাপ নেই। ও কিসের মাঝে দিয়ে গিয়েছে আমি তা শুনি, এবং পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পৌঁছাবার আগপর্যন্ত ওর এই যাত্রা অব্যাহত থাকে। সে একে নিজের করে নিয়েছে: সেই দীর্ঘ পঙতি, যেখানে আমরা কেবল মা বাবাকে চিনতাম। এবং সে তাতে আবারও ফিরে আসে, যেমন করে সব কিছু ফিরে ফিরে আসে, যাতে মৃত্যুর মাঝ দিয়ে, তা চিরজীবী হতে পারে। আমি আবারও আমার মায়ের মুখটা দেখি, আর এই প্রথমবারের মতো, মনে হয়, কিভাবে রাস্তার পাথরগুলোর ওপর হাঁটার সময় সেগুলো তার পায়ের ওপর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। আমি সেই চাঁদের আলো ছাওয়া সড়কটা দেখতে পাই যেখানে আমার বাবার ভাই মারা গিয়েছে। এবং তা আমার স্মৃতিতে কিছু একটা ফিরিয়ে দেয় এবং আমাকে অতীতের মাঝে নিয়ে যায়। আমি আবার আমার ছোট্ট মেয়েটাকে দেখতে পাই এবং আবারও ইসাবেলের চোখের জল অনুভব করি, এবং বুঝতে পারি আমার নিজের চোখ জুড়েও জল ঝরতে শুরু করেছে। এবং তবু আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা কেবল একটা মুহূর্ত, কারণ বাইরে তখনও বাকি বিশ্বটা অপেক্ষা করছে, বাঘের মতো ক্ষুধার্ত, এবং আমাদের ঘিরে যে সমস্যাগুলো প্রসারিত তা আকাশের চেয়েও বিশাল।

তারপর এক সময় তা শেষ হয়। ক্রেওলে এবং সনি হাফ ছেড়ে বাঁচে, দুজনেই ভিজে একাকার, ওরা তবু দাঁত বের করে হাসছে। চারিদিকে প্রচণ্ড করতালি এবং তার অনেকটাই ছিল বাস্তব। অন্ধকারে সেই মেয়েটা এগিয়ে আসে এবং আমি তাকে মঞ্চে পানীয় নিয়ে যেতে বলি। তারপর দীর্ঘ নীরবতা,

ওরা তখন ওপরের সেই ধূম্রনীল আলোতে নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করছিল এবং কিছুক্ষণ বাদে আমি দেখতে পাই সেই মেয়েটা সনির জন্য তার পিয়ানোর ওপর একটা স্কচ আর দুধ রেখে আসে। মনে হচ্ছিল ও সেটা দেখতে পায়নি, কিন্তু আবারও বাজাবার আগে দিয়ে, সে তাতে একটা চুমুক দেয় এবং আমার দিকে তাকায়, এবং মাথা নোয়ায়। এরপর সে সেটা আবারও পিয়ানোর ওপরে রাখে। আমার জন্য, এরপর, ওরা আবার বাজাতে শুরু করলে, কাঁপতে থাকা কাপটা আমার ভাইয়ের মাথার ওপর উজ্জ্বলভাবে নড়তে থাকে।

লেখক পরিচিতি : জেমস আর্থার বাল্ডউইন (২ আগস্ট, ১৯২৪–পহেলা ডিসেম্বর, ১৯৮৭) একাধারে একজন আমেরিকান ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, কবি এবং সমাজ সমালোচক। তার প্রবন্ধ সংগ্রহ ‘নোট অব আ নেটিভ সন’ (১৯৫৫)–এ তিনি বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার আমেরিকার পশ্চিমা সমাজে বিদ্যমান এবং তখনও আলোচিত হয়নি এমন সাম্প্রদায়িক, যৌন এবং নানা ধরনের শ্রেণী বিভেদ এবং এই সংক্রান্ত অনেক অপরিহার্য সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। দ্য ফায়ার নেক্সট টাইম (১৯৬৩), নো নেইম ইন দ্য স্ট্রিট (১৯৭২), এবং দ্য ডেভিল ফাইন্ড ওয়ার্ক (১৯৭৬) তার আরো তিনটি বিখ্যাত প্রবন্ধ সংগ্রহ।

বাল্ডউইনের উপন্যাস এবং নাটক সমূহে কৃষ্ণাঙ্গসহ সমকামী এবং উভকামী পুরুষদের মৌলিক ব্যক্তিগত অনেক প্রশ্ন এবং জটিল সব সামাজিক ও মানসিক পীড়ন এবং ন্যায়সঙ্গত চাওয়া পাওয়া কাহিনী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। একই সঙ্গে এধরনের ব্যক্তিত্বের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে বেশ কিছু আভ্যন্তরীণ বাঁধা বিঘ্নও বর্ণিত হয়েছে। সমকামীদের অধিকারের বিষয়টি আমেরিকা জুড়ে ব্যাপকভাবে সমর্থন পাবার আগেই এসম্পর্কে বল্ডউইন তার বিখ্যাত উপন্যাস, গিওভানি’স রুম (১৯৫৬) লেখেন, এটি তার দ্বিতীয় উপন্যাস। তার প্রথম উপন্যাস, গো টেল ইট ওন দ্য মাউন্টেইন, তার সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম।

সনি’স ব্লুজ গল্পটি বল্ডউইনের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং নির্বাচিত গল্পগুলির একটি। এটি ১৯৫৭ সালে প্রথম ছাপা হয়, পরে গোয়িং টু মিট দ্য ম্যান (১৯৬৫) গল্প সংগ্রহে ঠাঁই পায়। – **অনুবাদক**

লিও'র পৃথিবী | পিয়ের ভিট্টরিও তনদেল্লি | অনুবাদ : সোহরাব সুমন

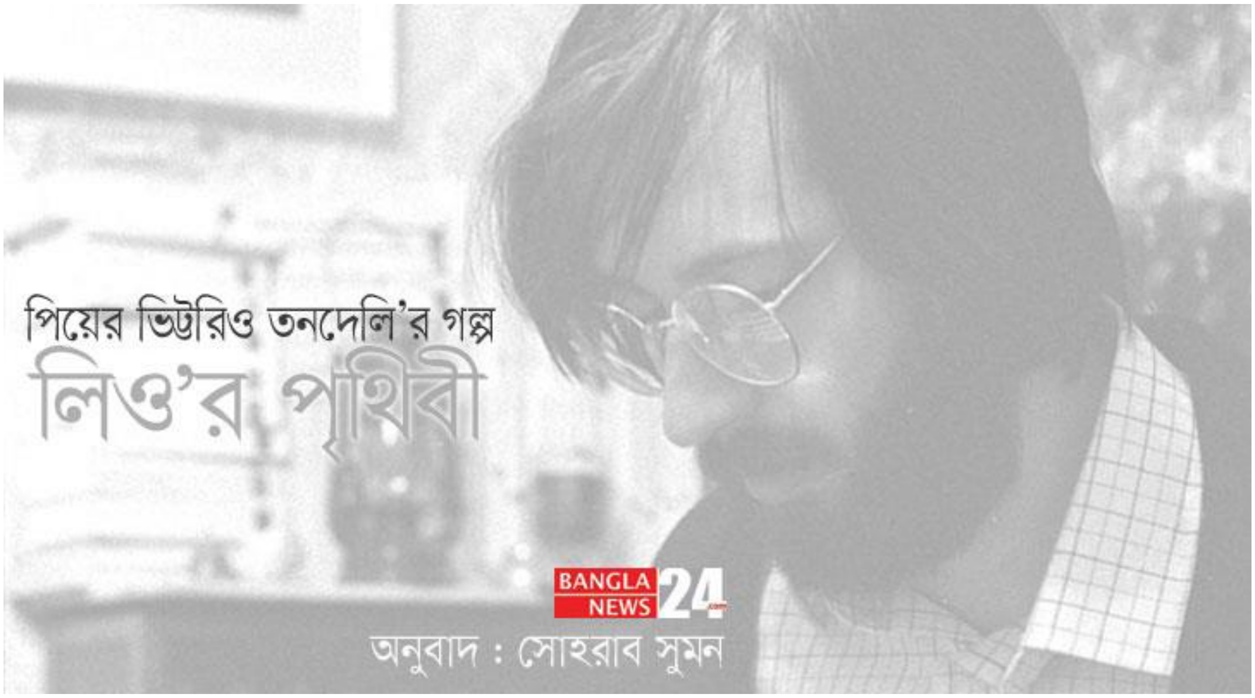

পো উপত্যকার ভাটির এক ছোট্ট শহর। এতে রয়েছে স্তম্ভের সারি, সাধারণের চলাচলের মূল সড়কের পাশে পাথরে বাঁধানো চত্বর, শহরের পৃষ্ঠপোষক সন্তর উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটা চার্চ, একটা রেনেসাঁ প্রাসাদ, একটা দুর্গ, উনিশ শতকের ঘর বাড়ির পুরাতন এক এলাকা, এবং আঠারো শতকের দু একটা দালান। পুরাতন শহরের দেয়াল থেকে সংগ্রহ করা শহরের কাপড়গুলো এখনও অক্ষত রয়েছে। এই শহরেরই মূল চত্বরের বাইরের দিকে মুখ করে থাকা বিশাল একটা পুরাতন বাড়িতে লিও'র জন্ম, বাড়িটা এখনও আছে, কিন্তু খুব বেশিদিন সেটা আর সেখানে থাকছে না। বাড়িটা এখন পরিত্যক্ত। ভাড়াটেরা বাড়িটা ছেড়ে চলে গেছে, কেবল নাপিত ছাড়া নিচতলার সব দোকানদারও তাদের দোকান ছেড়ে দিয়েছে। ভেঙে ফেলার কাজ যথাসময়ের অনেক আগেই শুরু হবে এবং ইতিহাস আর স্থাপত্যশৈলির সঙ্গে সম্পর্কহীন আরও একটা দালান এই শহরে যোগ হতে চলেছে।

নিচু সিলিং, মুখছাড়া জানালা, এবং গোলাপি-কমলা বা নীলচে-সবুজে উত্তরাধুনিক ধাঁচে রঙ করা দুই কি এক কামরার এপার্টমেন্টে ঠাসা একটা দালান। কিন্তু তাতে সে মোটেই বিচলিত নয়। তার বাবা মাও সবকিছু একইভাবে দেখতে অভ্যস্ত। কেবল কয়েদিদেরই জায়গার দরকার। এবং শহরের বাসিন্দা লিও অতীতের প্রতি তার শ্রদ্ধার কারণে সব কিছু যেমন আছে তেমনি রাখার পক্ষে। বিস্ময় নিয়ে সে আশপাশের সব কিছু দেখে, এর অন্যতম উদাহরণ, উনিশ শতকে তৈরি ভক্তিমূলক ছোট ওই উপাসনালয়, সে যেখানে জন্মেছে তার কয়েক ফুট দূরে মূল সড়কের ওপর আজও সেটা অবহেলা আর অনাদরে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যখন ছোট ছিল, লিও'র দাদী তাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে ছোট্ট সেই চার্চের সামনে নিয়ে যেতেন, হাত ধরে তাকে পাশের বেদীটা দেখাতেন, সেই সঙ্গে কুমারী মেরীর মূর্তি আর ফুলদানি। শহরের আর সব জিনিসের মতোই সেখানকার একটা গাছ এতসব পরিবর্তন, উন্নয়ন দেখে দেখে কালের সাক্ষী হয়ে আজও টিকে আছে। এখানকার অনেকেরেই মনে আছে পঁয়ষট্টি ফুট লম্বা এই ফার গাছটা একসময় তাদের বাবা রোপণ করেছিল। পপলার গাছটা লাগাবার কথা লিও'রও মনে আছে, সেটা এখন অনেক লম্বা, কোনও এক অক্টোবরে হাইস্কুল বিল্ডিংয়ের সামনে অন্যান্য গাছের উদ্দেশ্যে ওকে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু গাছের সেই সারি তার মনে আলাদা কোনও অনুভূতি জাগায় না। তবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চ্যাপেল পেরুবার সময় এমনটা হয় না। সেটা তাকে ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন সে ভেতরটা দেখবার জন্য লোহার গ্রিল বেয়ে উঁকি দিত। কিন্তু এখন এর ভেতরটা দেখতে তাকে কোনও সমস্যা পোহাতে হয় না। এখন সে আগের চেয়ে অনেক লম্বা। আর উপাসনালয়টা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি খাটো, গাদাগাদি আর এর অবয়বটাকে অনেক বেশি সুচালো বলে মনে হয়। হতে পারে এটা আগের চেয়ে অনেক বেশি একা। কিন্তু তার কাছে এখনও এটা সময় পরিমাপের একটা উপায় মাত্র।

বৃক্ষ ছাওয়া পথের একপাশে সে তার গাড়িটা থামায়, চ্যাপেল থেকে সেটা খুব বেশি দূরে নয়। দেখতে পায় সেটার সামনে ওরা ধাতব দুটা ময়লার পাত্র রেখেছে, আর চ্যাপেলের একপাশ নানা রকম পোস্টার আর প্লেয়ারে ঢাকা পড়ে আছে। এটা তাকে তার বাস্তবতা অটুট রাখার অনুভূতি, অথবা সে যা জানে বা পছন্দ করে সে সম্পর্কে সচেতন করে, খুব বুঝতে পারে অন্যদের থেকে তা অনেক আলাদা। সে পুরোপুরি নিশ্চিত চ্যাপেলের ভেতরকার ধর্মীয় চিত্রকর্ম, ফুলদানি, এবং কুমারী মেরীর নামাঙ্কিত জংধরা গ্রিল সম্পর্কে যদি সঙ্গী অন্য নাগরিকদের কাউকে জিজ্ঞেস করে—কয়েক হাজার জনকে—তাহলে তাদের কেউই তাকে সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবে না। এমন কি, হতে পারে তার মাও এসবের কিছুই জানেন না। সে বুঝতে পারে, যে শহরটাতে সে জন্মেছে তাকে সে যেভাবে জানে বোঝে তা একেবারেই আলাদা। এখনও দূর থেকে বিচ্ছিন্ন সেই শহরটাকে সে খুব আবেগের সঙ্গে স্মরণ করে।

তার জন্মের সময়কার আশপাশের ঘরদোর সব হারিয়ে গেছে, তখন যে চ্যাপেলটার ভেতর দৃশ্য দেখবার জন্য সে বেয়ে উঠত সেসব ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, পুরাতন সেইসব পাথরের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, এর সঙ্গে তার ছেলেবেলার ভালোবাসার মানুষদেরই কেবল মৃত্যু হয়নি, বলতে গেলে তার নিজের ভেতরটাও একপ্রকার মরে গেছে। নতুন প্রজন্ম ছোট্ট এই জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারবে না, জায়গাটার ইতিহাসের সঙ্গে যারা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে রয়েছে—তাদের কোনও চিহ্ন এখানে থাকবে না, কেউ কখনও তাদের কথা মনে রাখবে না। নম্র, নামপরিচয়হীন, কিন্তু এই লোকগুলোই যেন সবসময় তাকে জড়িয়ে রয়েছে, যেমন করে তারা তার সমস্ত ভবিষ্যতকেও জড়িয়ে আছে। ছোট্ট চ্যাপেলটা যখন ধ্বংসস্তূপের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, সন্দেহ নেই কালে এর

ভাগ্যেও সেই একই পরিণতি ঘটবে, তখন সেটাকে আরও বেশি একা বলে মনে হবে। আর কোনও কিছু জানান না দিয়েই শহরটাও তার আরও একটা ছোট অংশ হারাবে। সেই সঙ্গে হারাবে অনুভূতির খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ।

গোরস্থানটা তার মা বাবা এখন যেখানে থাকে সেখান থেকে আরও অনেক দূরে, এই হিসেবে বলা চলে যেখানে জন্মেছে সে এখন তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে—পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে তার পরিবার সেই বাড়িটা ছেড়ে এসেছে। বৃক্ষ ছাওয়া পথের শেষে, মাইল খানেকের বেশি দূরে, রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে নতুন একটা সড়কের সঙ্গে মিলেছে, সেখানেই মিউনিসিপ্যাল পানির-টাওয়ারের কাছাকাছি গোরস্থানটা অবস্থিত। বিশ্বের কতো জায়গাতে লিও ঘুরে বেড়িয়েছে, কত কত জায়গায় থেকেছে বা থাকবে এবং ইউরোপের কতোটা জুড়ে দাপড়ে বেরিয়েছে তাতে আসলে কিছু যায় আসে না, তারপরও তার পুরো জীবনটা আসলে এই হাঁটা পথটুকুর দূরত্বের মাঝেই রয়ে যাবে যেটা তার জন্মানোর জায়গা থেকে গোরস্থান পর্যন্ত গেছে। মাইল খানেক বা তারও বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত তাকে, ঠিক ক্রুশের স্টেশনের মতো ভোগান্তির আদর্শ একপথ পেরিয়ে যেতে হবে। গাছে ছাওয়া এই পথ আর যে জানালা দিয়ে জীবনে প্রথম সে বাইরে তাকিয়েছিল এখন 'এখান থেকে ওখানে' একটা মানসিক অনুভূতি বারবার তার মনের ভেতরে খেলে যেতে থাকে। 'এখান থেকে ওখানে' তার পুরোটা জীবন। বারান্দা থেকে হাত নেড়ে মা তাকে ডাকত। পথের মাঝামাঝি চলে আসার পরও দূর থেকে মা তার ওপর নজর রাখত এবং গ্রাম্য তরুণী মেয়ের মতো কর্কশ স্বরে ডেকে উঠত, পরের দশ দশটা বছরেও যার কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। তখনও সে একজন বালিকা যে কিনা সব সময় চিৎকার করে তার বোনদের ডাকতে ডাকতে তাদের বিশাল খামার বাড়ির এঘর থেকে ও ঘরে ছুটে বেড়াত, যেখানে সেও জন্মেছে। যখন অন্যান্য তরুণীরা একত্র হতো, তারাও সেই একই মুখভঙ্গি করত আর আগের মতোই হট্টগোল জুড়ে দিত। বিয়ের পর এই চার বোন আলাদা হয়ে যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন শহর আর রাজধানীর ছোট্ট এপার্টমেন্টে বসবাস করতে থাকে, এবং এঘর থেকে ওঘরে চেঁচামেচি করে বেড়াতে থাকে যেন আগের মতোই তারা তখনও গ্রামেই বসবাস করছে।

রোববারের নৈশ ভোজের আগে, চার বোন শোবার ঘরের ভেতর একত্র হবার পর দল বেঁধে আয়নার সামনে জড়ো হতো আর নিজেদের গায়ে সুগন্ধি ছিটাত এবং একে অপরের কাপড় ঠিক করে দিত, ব্লাউজ আর মাথার স্কার্ফে গিঁট মেরে দিত, এর পুরোটা সময় তারা—কে কোথায় বাড়ি বানিয়েছে, কোথায় কে মারা গেছে, কে তার বউয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কে শহরের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছে, বাস ট্রেন, আঙ্গুর চাষ আর নাতিনাতনিদের নিয়ে—উত্তেজনাকর আলাপচারিতায় মেতে থাকত, লিও তখন এক কোণায় দাঁড়িয়ে জড়তা মেশানো কৌতূহলে দুষ্কর্মে ধরা পড়বার ভয় নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের আরও কাছ থেকে দেখবার জন্য সে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করত। সে তাদের বিজড়িত কথাবার্তার কূলকিনারা বুঝতে চেষ্টা করত—গোপনে প্রায়ই সে কাজটা

করত—তাদের কথাবার্তার ধরন, তুচ্ছ চেঁচামেচি, শাপশাপান্ত, ফুঁ-ফুঁৎকার, আর জাদুটোনার মতো প্রত্যেকের যখন তখন হাত নেড়ে ক্রস কাটা দেখত। কিভাবে ছোটদের ওপর বড়দের কর্তৃত্ব প্রকাশ পেত তা খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করত। ছোট দুজন আর বড় দুজনের মাঝে খুনসুটিটা সে বুঝতে পারত। অথবা হঠাৎ অন্য তিনজনের মাঝে কোনও কারণে জোট গড়ে উঠলে যেভাবে অন্যদের কাছে তাদের কেউ একজন একঘরে হয়ে পড়ত। আর এর সবই ঘটত উঁচু হিল, লোমের পোশাক, ন্যাপথালিনের গুলি, ফেইস পাউডার, কানের দুল, ফাউন্ডেশন ক্রিমের মতো তুচ্ছ সব জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ির কারণে, ষাট পেরিয়ে আসার পরও তারা পরিমিতভাবে সেসবের ব্যবহার শিখে উঠতে পারেনি। আর একে অন্যেরটা ধরতে গেলেই তাদের সবাই একযোগে দ্রুততর কর্কশ ভাষায় চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিত। শেষে হড়বড়ে চাহনিতে বোনেরা সবাই ঘরের এদিক সেদিক তাকাত আর আয়নার সামনে হাসিতে ফেটে পড়ত, এবং তারপর হঠাৎই চুপ মেরে যেত—এক কথায় বলতে গেলে, ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ত, সম্ভবত চার্চে যাবার আগপর্যন্ত রোববারের সকালগুলোতে তাদের ঘরে এমনই পরিবেশ বিরাজ করত, তারপর সবাই একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে গাড়িতে গিয়ে উঠত। এবং লাইন ধরে বেরোবার পর, আবারও সবাই এক এক করে বারবার সজোরে দরজা, জানালা আর কব্জাগুলো বন্ধ করত, কেননা সেগুলো ঠিকঠাক বন্ধ হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে তাদের কেউই কারও ওপর আস্থা রাখতে পারত না, তাই প্রত্যেকেই নিজের সন্তুষ্টির জন্য বিদ্রূপের হাসি হেসে আবারও সেগুলো খুলে তারপর ভালোভাবে বন্ধ করত, তারপর লিও সেই সারির শেষে গিয়ে যোগ দিত, এসময় সামান্য ঝুঁকে নীরবে হাঁটার ফাঁকে সে নিশ্চিত থাকত যেসব পুরুষেরা বিশ্বের সকল ক্ষমতা ধরে রেখেছে তা আসলে পুরুষদের নাগালে নেই বরং নারীদের হাতেই কুক্ষিগত। এইসব নারীদের দিকে সে খুব মনোযোগ সহকারে তাকায়, যারা ষাট পেরিয়ে এসেছে, এখনও তাদের মাঝ থেকে তারুণ্যের সব ধরনের তেজ ঠিকরে বেরুচ্ছে। তাদেরকে সে তাদের স্বামীদের কবর দিয়ে আসতে দেখেছে আর এখনও তারা অপ্রতিরোধ্যভাবে টিকে আছে, সময়ের তীর আর টান তাদের কাউকেই বিদ্ধ করতে পারেনি, কাউকে কখনওই হাসপাতালে যেতে হয়নি, বরং সব সময়ই দুর্বল আর অসুস্থ শরীরের অবসাদগ্রস্ত পুরুষদের সাহায্যের জন্য তৈরি থেকেছে।

যখনই সে নানুর সঙ্গে শহরের স্তম্ভের সারি ধরে তার মায়ের হেঁটে যাওয়া কল্পনা করে, তখন তার পরনে থাকে সুন্দর লোমের কোর্ট, আর সব সময়ই তার মুখে খুব বেশি মেকআপ এবং ফেইস পাউডার থাকে, অথবা যখন সে চার্চে তার মায়ের মুখে 'আমেন' শুনতে পায়, প্রতিবার তার মনে হয় সে যেন আবার সেই শৈশবে ফিরে এসেছে, তখন তার মনে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আগের মতো আবারও ভয় খেলে যায়। মনে মনে সে প্রর্থনা করে গির্জার মাঝখানে যেন কোনও মোরগ ডেকে না ওঠে, বা এর চলাচলের পথের ওপর দিয়ে যেন কোনও ফিজনট দৌড়ে না যায়, কারণ যদি এমন কিছু একটা ঘটে তাহলে সে তার লোমের কোর্ট ছুড়ে ফেলে, স্কার্ট উঁচিয়ে, অর্থোপেডিক জুতা জোড়া টেনে খুলে, চার্চে আসা লোকেদের ভিড় ঠেলে ওর পিছু ধাওয়া করবে, আর ধরবার আগপর্যন্ত হাততালি দিয়ে চেঁচাতে থাকবে। আর সেটাকে পাকড়াও করবার পর, একগাল হেসে সেটার ঘাড় মটকে দিবে, বা দ্রুত মাথা বাকিয়ে মেরুদণ্ডটা ভেঙ্গে দিবে। তারপর সে চার্চের উপাসকদের মাঝে ফিরে গিয়ে বা চত্বরে ভিড়

করে থাকা লোকেদের, সগর্বে তার বিজয়ের স্মারকটা দেখাতে থাকবে। লোকের ভিড়ে নিজের মাকে দেখার পর সব সময়ই তার মনে একইরকম ভয়ের অনুভূতি কাজ করে এবং সে বিচলিতভাবে চারপাশে তাকিয়ে, নিশ্চিত হতে চায় যেন হাতের কাছে কোনও অসহায় মুরগি ঘুরে না বেড়ায়। কেননা আজকে এত বছর পেরিয়ে যাবার পরও সে তার মায়ের মাঝে আগেকার সেই চাষার মেয়েকে দেখতে পায়। এবং হাজার হাজার মাইল দূর থেকে, যখনই সে কল্পনায় মায়ের কথা ভাবে, সব সময়ই সে নিজেকে একই কথা বলে, একটা কথাই শুধু মনে পড়ে: 'অসহায়ের মতো দেখতে, চিরন্তন, সবচেয়ে সুন্দরী ইহুদি মেয়ে।'

এবার সে লিফটে করে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। কোনও কিছু বলে ওঠার আগেই তাড়াহুড়া করে তার ব্যাগগুলো নিতে চায়। সে আচমকা পিছিয়ে আসে: 'এগুলো আমাকেই নিতে দাও, মা।'

তারা এপার্টমেন্টে উঠে আসে। ভেতরে অন্ধকার, শুধু টেলিভিশনের নীলচে আলো বসার ঘরটাকে হালকা আলোকিত করে রেখেছে। তার বাবা আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে রিমোটকন্ট্রোল হাতে বিরসভাবে অবিরাম থ্রিলার আর মিনি সিরিজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুজন দুজনকে কেবল বেমানানভাবে একটা হ্যালো বলে, যেন দুজনেই খুব ভালো করে জানে তাদের জীবন এখন অনেক আলাদা। তার বাবা চেয়ার থেকে নেমে বাতি জ্বালায়। লিও তাকে বিরক্ত করতে চায় না বলে থামায়। রান্না ঘরে খাবার টেবিলের আধাআধি অংশে ছোট্ট একটা পরিষ্কার টেবিলক্লথ পাতা। তার ওপর এক বোল সালাদ আর খোলার জন্য একটা রেড ওয়াইনের বোতল রাখা আছে। তার মা স্টু গরম করছে। কোনও কথা না বলে তারা একে ওপরের দিকে তাকায়। পাশের ঘর থেকে গুলি আর পুলিশের গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে। লিও এক হাত তার চুলের ভেতর গলিয়ে ভাবতে থাকে, শেষ যেবার দেখা হয়েছিল সেবারের চেয়ে তার মাকে অনেক বেশি নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। তখনই তাকে স্কার্ট ঠিক করতে দেখা যায়, অনেকটা আনমনা ভঙ্গিতে টেনে পাশটা ঠিক করে। হতে পারে তার ওজন খানিকটা বেড়েছে লিও সেটা বুঝতে পেরেছে জানলে সে খুব অবাক হবে। একসঙ্গে দুজনেই দুজনের দিকে তাকায় এবং চোখাচোখি হয়, এবং দুজনেই জিজ্ঞেস করে বসে: 'সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?'

লিও দ্রুত বলে: 'আমার এখন ক্ষুধা নেই, মা।'

কথাটা বলার জন্য মনে মনে খেদ অনুভব করে, কারণ এর মাধ্যমে সে বিশ্বজোড়া জঞ্জাল বেঁধে বেড়ানো লোকগুলোর আর সব সময় তার রেস্তোরাঁয় খেয়ে পেট ভরানোর ওপর তার মায়ের বিরক্তির কথাটা নতুন করে মনে করিয়ে দিল, তিনি একে কেবল অবমাননাকরই মনে করেন না, তার কাছে এসব অধর্মাচরণও—চাইনিজ রান্না। তোমার বাবা যেখানে কাজ করত সেখানে আমি ওসব চাইনিজ লোকেদের দেখেছি। একটা সেদ্ধ মাছ আর কয়েক পাউন্ড ভাত, সব একসঙ্গে মিশিয়ে রান্না করা হয়, নাড়িভুঁড়ি, রসুন, সুগন্ধিগুল্ম, একই পাত্রে প্রচুর পরিমাণে ফেলে, ঠিক যুদ্ধের সময়কার মতো, তখন

ওরা সবাই হাত দিয়ে এক পাত্র থেকে খাবার তুলে খেত। তোমার রেস্টুরেন্টেও তোমার সঙ্গে এমনই করা হয়।

লিও হাসে, কেননা তার মায়ের রান্নাই আসলে সে মোটেই হজম করে উঠতে পারে না—তার নিজেদের জমি থেকে আসা খাবার। কিন্তু কথাটা সে জানায় না। সে এক গ্লাস ওয়াইন ঢালে এবং এক চুমুক পান করে। তরতাজা এই সুগন্ধি ওয়াইনের কথা ভাবতে তার সব সময়ই ভালো লাগে।

তার বাবা এমন একজন মানুষ জীবনে যে কখনওই সফল হতে পারেননি। খুব বেশি অর্থকড়ি তিনি বানাতে পারেননি। খুব একটা কথাও তিনি বলেন না। এখনও তিনি খুব ভোরে উঠে এপেনাইনস পাহাড়ি এলাকায় শিকারে যান। বা নিজের কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের দিকে ঘুরতে বের হন। অতিসম্প্রতি তিনি যা করেছেন, সেটা কমবেশি সবারই জানা, গ্রামের বাইরে, প্রাকৃতিক এক ঝরনার কাছে তিনি ছোট্ট একটা পাখির খোঁয়াড় বানিয়েছেন। প্রতিদিন তিনি মাছ আর পাখিদের জন্য খাবার তৈরি করেন—পাঁতিহাস, ময়ূর, ফিজন্ট, এবং মুরগির। মিশরের এক বন্ধু তাকে এক জোড়া ফ্লেমিঙ্গো উপহার দিয়েছে, আর যে জায়গাটাকে তিনি একগুঁয়ের মতন মরুদ্যান হিসেবে দাবি করেন সেখানে সেগুলো খুব সুন্দরভাবেই টিকে আছে। তিনি চান জোড় বেঁধে সেগুলো বাচ্চাকাচ্চা দিক, তারপর সেখান থেকে বড় একটা দল তৈরি করা যাবে। বন্ধুবান্ধব আর তাদের বউদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে মাছ ধরা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বা ডজন খানেক মুরগি মেরে আগে থেকে বানানো চালার ভেতরে বসে সেসব রান্না করা হয়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরো রোববারটা তারা সেখানেই কাটাবে।

মহিলারা ময়দার তাল নিয়ে দলাইমলাই করে এবং ছোট ছোট পিণ্ড তৈরি করে তাতে পুর ভরে ভাজতে থাকে। পুরুষ বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে বড়শি দিয়ে বান, মাগুর, আর পার্চ জাতীয় মাছ মারে। প্রত্যেক মাসের শেষে দলটিতে দীর্ঘদিনের জীবন সঙ্গী হারানো আরও বেশি বিপত্নীক আর বিধবারা যোগ হতে থাকে। তবু সেই মরুদ্যানে একত্রে জড়ো হবার পর তাদের মাঝে মন খারাপ করবার মতো কোনও কিছুই আর ঠাঁই পেতে পারে না।

বেশ কয়েকটা পুকুর মিলেমিশে অত্যধিক বড় একটা জলাশয় তৈরি হয়ে তাতে সামান্য সংখ্যক মাছ আর তার আশপাশের বেশ কিছু সংখ্যক পশুপাখি জড়ো হবার কারণে জায়গাটাতে একটা বুনো পরিবেশ তৈরি হয়েছে মাত্র, তবে লিও বুঝতে পারে জায়গাটা তার বাবার খুব পছন্দের। এটা তার ব্যক্তিগত স্বর্গ, এমন একটা জায়গা যেখানে তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। সম্ভবত এটা তাকে তার ছোটবেলা আর আগেকার গ্রাম্য জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আগেকার নির্জনতার কথা মনে

করিয়ে দেয়। লিও তার বাবার সেই নিঃসঙ্গ, অমিশুক দিকটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তার ভেতরও সেই একই বোধ কাজ করে।

তারা দুজন এমন ধরনের পুরুষ একে অপরের সঙ্গে যাদের কোনও যোগাযোগ নেই, বা বিগত অন্তত বিশ বছর ধরে যারা একজন অপরজনকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেনি। তারা একজন অপরজনকে এড়িয়ে চলে। তাই বাইরে কোথাও গিয়ে পরস্পরের সাহচর্য খোঁজার প্রশ্নই উঠতে পারে না। একজন অন্যজনকে একবারের জন্যে কোনও কিছুই জিজ্ঞেস করে না। একজন অন্যজনের আয়না, লিও নিজেও সেটা জানে। তার বাবাও এ ব্যাপারে সচেতন হলে লিও বরং অবাকই হবে।

রাতের খাবারের পর রান্না ঘরে বসে সে তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করে। তার প্রশ্ন ঠেকাতে, শহরে কী কী ঘটেছে সবকিছু এক এক করে জানতে চায়, কে কে বিয়ে করেছে, চুরি করতে গিয়ে কে ধরা পড়েছে, কার কার তালাক হয়ে গেছে, নতুন কে জন্মেছে। এর সবই জিজ্ঞেস করা কেবল তার মায়ের মুখের ছোট্ট একটা প্রশ্ন আটকাতে, তার দেখা বাকি বিশ্ব আর বউ নিয়ে তিনি যেন কিছু জানতে চাইবার সুযোগ না পান, তাই সে একের পর এক এলোমেলো গল্প আওড়াতে থাকে। শেষে তার মা বোতলটা টেবিল থেকে সরিয়ে রাখার আগপর্যন্ত সে মুখ টিপে হেসে হেসে চুপি চুপি নিজে থেকে গ্লাসে ওয়াইন ঢালতে থাকে, এরপরও তার কথা বন্ধ হয় না, এবং তার স্পষ্ট উপেক্ষার চাহনির পরও সে তার দিকে স্থির চেয়ে থাকে। যে খবরগুলো তার কাছ থেকে জানা যায় সেসব তার জন্য স্বস্তিদায়ক। এমনকি তারা যখন ক্যান্সার আক্রান্ত মৃত্যু পথযাত্রী এক বন্ধুকে নিয়ে কথা বলছিল, তার মা তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে মাথা ঝাঁকিয়ে এপ্রোনে চোখের জল মুছে, তখনও লিও তার মাঝে 'শোকের' কিছুই খুঁজে পায় না। যেন এর সবই শহুরে জীবনের এক অপরিহার্য অংশ। জন্ম, মৃত্যু, আর লোকেদের বিচ্ছেদ, এর সবকিছু নিয়েই তারা সেখানকার যৌথ যাপনে অংশ নিচ্ছে। এইসব জীবনের মাঝে সব সময়ই আশার জন্য একটা ঘর ফাঁকা থাকে আর তাই সমাজ টিকে থাকে এবং ক্রমশ বদলায়। সবাই পেছনে সন্তান, বন্ধুবান্ধব আর সুখস্মৃতি রেখে যায়, আর শহুরে জীবনের প্রতি ইঞ্চি সময় এইসব গভীর বন্ধন আর অনুভূতি দিয়ে গড়া। লিও তার মায়ের দুঃখটা বুঝতে পারে, আর খালা ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার সময় তার ভেতর যে উৎসাহটা কাজ করে তাও টের পায়, তার কাছে সে এমনভাবে ফেরি বোটের কেবিনের বর্ণনা দেন যেন লিও সেসব কখনওই চোখে দেখেনি বা কোন গ্র্যান্ড হোটেলের লাউঞ্জের কথা বলেন যার ভেতর বোধ হয় লিও কখনওই পা ফেলেনি। সবকিছু বুঝতে পারলেও সে ক্ষোভ বা আনন্দ এর কোনওটাই অনুভব করতে পারে না। এর কোনওটাই তার জীবনের অংশ নয়, এমন একটা জীবনে কখনওই তার পা ফেলার মতো জায়গা হবে না। কেবল শুনে হাসতে পারবে আর সেই শূন্যতা অনুভব করতে পারবে। জীবনে কখনও তার নিজ শহরের লোকেদের ভালো বা মন্দ সামনাসামনি উপভোগ করার সুযোগ হয়নি। নিজের মাকে দেখে দেখে সেসব সে উপভোগ করে। যে গল্পগুলো তাকে হাসাচ্ছে কাঁদাচ্ছে সে সেসব উপভোগ করে। কিন্তু অতি তুচ্ছ কিছু একটা যেন তার মাঝ থেকে হারিয়ে গেছে। যেন খুব দূর থেকে বসে সে শহরটাকে দেখছে।

যখনই তার ভাবনার মাঝে নিজের দুঃখগুলো উঁকি দেয়, আবারও সে ভয় আর হতাশা অনুভব করতে থাকে। কারণ সে জানে এই নাটকটা তার নিজের, এবং তার একার। সে জানে, সামনের বছরগুলোতে, কেউই তার বিগত ভালোবাসাকে মনে রাখবে না, কাঁধে হাত রেখে বলবে না সব কিছুরই আসলে শেষ আছে। শহরের এই নিজ বাড়িতে বসে মূল সড়কের সকালগুলো তার আর দেখা হবে না। অন্যদের চোখে তার বেদনার প্রতিবিম্ব সে দেখতে পাবে না। কারও সঙ্গে সে আর হাত মেলাবে না বা কাউকে জড়িয়ে ধরবে না। এবং কেউই আর কবরস্থানে গিয়ে টমাসের সঙ্গে দিবে না, এমনকি সেও। সে এও বুঝতে পারে, লোকটা এখন অন্য এক শহরের বাসিন্দা। একটা আলাদা জগতের অংশ, সত্যি বলতে, এখন সে যেখানে অবস্থান করছে সেখানকার সব দুঃখ আর আনন্দ অন্যসব শহরের সমান্তরাল। সে জানে অন্য জগতে চলে যাওয়া সেইসব লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই কঠিন। বাইরে গিয়ে আন্তরিকভাবে অন্যদের সঙ্গে দেখা করে, লিও ভিন্ন আর দূরবর্তী এই জগতকে এক করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা তার কাছে অসম্ভবই ঠেকে। জানা সবকিছুর মাধ্যমে চেষ্টা করলেও সেটা অসম্ভবই থেকে যাবে। হয়ত ভবিষ্যতে কখনও সেটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সে দিন আসতে এখনও অনেক বাকি। ভবিষ্যতে যারা জন্মাবে তারা অন্য কোনও উপায়ে ভিন্ন জগতে চলে যাওয়া আগেকার লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। ঘটনাক্রমে, একসময় এমন কেউ একজন আসবে যার কাছে 'লিও এবং টমাসের স্মৃতি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং তা জীবনদায়ী আর আশাব্যঞ্জক কোনও কিছুর মতো সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু তার আগে সেই সময়টাকে আসতে হবে। হতে পারে শত বছরের আগে সেটা সম্ভব নয়। যে ঘরটাতে সে বিশ বছর ধরে বসবাস করছে অনেক দিক থেকেই সেটা আর আগের মতো নেই। তারপরও সেটা তার শোবার ঘরই রয়ে গেছে, আগেকার সেই পুরাতন বিছানা, সাদা লেখার টেবিল আর দেয়ালের সঙ্গে সাঁটা পেপারব্যাক আর স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বইতে ঠাসা সেই একই সেলফ। কিন্তু তারপরও সেটা সেই আগেকার ঘর নয়। এর চার দেয়ালের মাঝে এখন আর লিও নামের কেউ থাকে না। এর মাঝে এখন যা কিছু রয়েছে তার সবই অতীতের অতৃপ্তির স্মারক বা অর্থহীন অবশেষ, সবই এখন জীবনহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

এটা এখন জাদুঘরের শোকেসে রাখা পাঠযোগ্য কোনও পাণ্ডুলিপির মতন। দেয়ালের এখানে সেখানে স্নিকার, আর লেভি জিনসের প্রচারণার পোস্টার ঝুলছে, পাইরেটেড রেডিও স্টেশনের মতো কেন্দ্রীয় সিটি রেডিও, এন্টি-রেডিও রক স্টেশন এবং ওয়ার্ল্ড রেডিও সেই শ্লোগান, 'মারিজুয়ানা চলবে' এবং 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার চাই না' লেখা স্টিকার আর সেই নীলচে সবুজাভ প্রতীকসহ ডলোমাইট রঙের হলদে ইঁদুরের সুপারস্কি টিকেট 'একটিভ জেজেন বেরুফসভেরবটি!' ডব্লিউডব্লিউ পাণ্ডা এখনও দরজায় সাঁটা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্টেরিও রেকর্ডারের ওপর থেকে এখনও তার সাদা কালো একটা ছবি তাকিয়ে রয়েছে, আর রেকর্ডারের কাছে এখনও তার লিওনার্দো কোহেন, নিনা সিমনে, টিম বুকলে, ক্যাট স্টেভেনস এবং নেইল ইয়াংয়ের অ্যালবামগুলো মায়ের রাখা এডিথ পিয়াফ এবং লুসিয়ানো পাভারোটির অ্যালবামগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে আছে। কোণার দিকে একটা ঘন রঙের কাঠের আসবাবের ভেতর একটা সেলাই মেশিন রাখা। ওয়ারড্রবের উল্টোদিকে বড় একটা আয়রন-বোর্ড হেলান দিয়ে রাখা। আর ডেস্কের নিচে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার।

ঘরের যাবতীয় যন্ত্রপাতিও তার ঘরে এসে ঢুকেছে। আর ঘরটা এখন আগের মতো নেই, বদলে গেছে। প্রতিবার যখনই সে বাড়ি ফিরে আসে সবকিছু নতুন অবস্থায় দেখতে পায়, অবশ্য শেষে সবকিছু একেবারে গায়েব হয়ে যায়। চারপাশের দেয়ালের কোথাও আর তার সেই ক্যাবারে এবং স্ক্রু ডগসের পোস্টারগুলো নেই, সম্ভবত পুরাতন কাগজের বাস্কেটে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। ১৯৭৩ এর ইতালিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভেলের ছবিগুলোও হাওয়া হয়ে গেছে, একইভাবে তার বন্ধুবান্ধবদের ছবিগুলোও। এক সময় বিছানার পাশে কর্ক বোর্ডের ওপর পিন দিয়ে সাঁটা ক্লেস ওল্ডেনবার্গ আর ইভেস ক্লেইনের ছবিগুলোও নেই। এই সময়ের মাঝে দেয়ালের রঙও বদলেছে। আগে তা খুব হালকা ছিল, একেবারে স্বচ্ছ সবুজাভ। এখন সেগুলো উজ্জ্বল হলদে।

তার ঘরটা ছোট্ট একটা বাক্স পেটরার ঘরে পরিণত হয়েছে। ভেতর থেকে দেখলে, ঘরটাকে ঝাড়ু রাখার ছোট একটা কক্ষ বলেই মনে হবে, এখানে বসেই সে তার প্রথম শব্দগুলো লিখেছে, ডায়রি লিখেছে, ডিগ্রির জন্য রচনা লিখেছে, তার প্রথম বইটাও এখান থেকেই লেখা।

লেখার সময় বেলকনি দিয়ে সে দূর পাহাড় চূড়ার নিচে শহরের মিটি মিটি আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত। বাইরে, যখন চলমান জীবনের কতশত ঘটনা ঘটে চলছিল, আর তখন এই সাততলার ওপর, শোচনীয়ভাবে তার ছেলেবেলাটা কেটেছে, সেসব নিয়ে সে কেবল স্বপ্নই দেখে গেছে আর বর্ণনায় তুলে ধরেছে। ঘটনার ঘূর্ণির মতো একবার থেকে অন্যবারে আর ডিসকো পার্টিতে লোকেদের নাচ গান কল্পনা করেছে। স্বপ্নের মাঝে এক ঝলক দেখতে পাওয়া কোনও রাতের শহরের মতো সেসবের বর্ণনা তুলে ধরেছে, যেখানে সবাই বিয়ে থা করছে আর জবড়জং সাজ পোশাকে সেজে আনন্দ করতে করতে গাড়িতে চেপে সমতলের ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে ধেয়ে যাচ্ছে। এখন সে সেই টেবিলের পাশে বসে রয়েছে, আগে সব সময় যেখানটাতে বসত। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবার জন্য তাকে স্টিম আয়রন আর ডিস্টিল ওয়াটারের কয়েকটা বোতল সরিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু তারপরও কিছুই দেখতে পায় না। সে ভারী কাঠের শাটারটা সরাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয় না। আধাআধি গিয়ে সেটা গিলোটিন ব্লেডের মতো তীর্যকভাবে আটকে যায়।

শেষবার যে বইগুলো সে রেখে গিয়েছিল সেগুলো এখনও টেবিলের পাশেই রয়েছে। এই ঘরে বসেই একবার কেবল বইগুলো পড়তে পেরেছিল। এন্টোনিও ডেলফিনি আর সিলভিও ড'আরজোর লেখা বই। বেলকনি থেকে সে যেখানটায় জন্মেছিল, মাইল খানেক দূরের সেই জায়গাটা দেখতে পায়। তার বইগুলোতেই কেবল সে ভিন্ন এক ধরনের পাগলামি, একঘেয়েমি আর একাকীত্বের সন্ধান পায় যার সঙ্গে তার দেশের স্থানীয় লোকেদের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সে সেইসব জীবন্ত, মুক্ত, হাসিখুশি, আর ভোগাসক্ত লোকেদের বর্ণনা পড়তে পড়তে মনে মনে বিরক্ত বোধ করে। মানুষের চরিত্রের লুকানো

দিকগুলোই এখন তাকে বেশি টানে, অন্ধকারাচ্ছন্ন যে দিকটার জন্য লোকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, একে অপরের মাথা ফাটায়, আস্ত গ্রামসুদ্ধ লোকেদের বোকা বানায়। কেবল এই দুজন লেখকের লেখাতেই, তাদের ভিন্ন আঙ্গিকের মাঝে, সে নির্দিষ্ট ধরনের এমিলিয়ান চরিত্রের দুর্ভেদ্যতার খোঁজ পায়, নির্দিষ্ট সেই ভাবলেশহীনতা, সেই খামখেয়ালিপনা, পাগলপারা একাকীত্ব এখন সে কেবল তার বাবা আর নিজের মাঝেই দেখতে পাচ্ছে। কাপড় চোপর ছেড়ে সে বিছানায় যায়। ডেলফিনির বইগুলোর একটি খুলে পড়তে শুরু করে: ‘কখনও আমরা এই বিপর্যয়গ্রস্ত পৃথিবীতে এবং সময়ের অনুকম্পাহীন পথ চলার মাঝে, মানুষের দিন যাপনে—বিলাপ এবং অশুভ ইচ্ছে, হতাশা এবং নাছোড়বান্দা আশা, তিক্ত আকাঙ্ক্ষার দেখ পাই তখন অসম্ভব ত্যাগের ভালোবাসা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; তখন আমরা বলে উঠি...’

আবারও তার জীবনে আগেকার সময়গুলো ফিরে আসে, আবারও সে আগের মতো খানিকটা আগেভাগেই শুতে যায়, অনেক দিন আগে যেভাবে বিছানায় যেত।

পিয়ের ভিউরিও তনদেল্লি (Pier Vittorio Tondelli)

ইতালিয়ান লেখক পিয়ের ভিউরিও তনদেল্লি ১৯৫৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, ইতালির ছোট্ট শহর করেগিও ’র এমিলিয়া-রোম্যাগনা এলাকাতে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃসন্ধিকালে সাহিত্য পাঠে তিনি সমবয়সীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও বয়স বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে তাতে আমূল পরিবর্তন আসে। যার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় ষোল বছর বয়সে তার প্রথম উপন্যাসে, এতে তিনি বয়ঃসন্ধিকালের হতাশা, বিশ্বাসের পরিবর্তন এবং সমকামিতার প্রতি আগ্রহ ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৯৪৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে তনদেল্লি বোলগানা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিক এবং পারফর্মিং আর্টের ওপর অধ্যয়ন শুরু করেন। সেখানে ইতালির বিখ্যাত দুজন শিক্ষক ও লেখক উমবের্টো একো এবং ঘিয়ান্নি সেলাটি’র অধীনে পাঠ নেবার সুযোগ পান। ১৯৭৯-তে তিনি এলডো ত্যাগলিয়াফেরি’র কাছে একটি পাণ্ডুলিপি পাঠান। তার কাছ থেকে লেখালেখি বিষয়ে শিখে এবং দিক নির্দেশনা পেয়ে তরুণ লেখক হিসেবে নতুন উদ্যমে লিখতে শুরু করেন এবং আগের একটি কাজ পুনর্লিখনে অনুপ্রেরিত হন। এর এক বছর পর ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে তার আদার লিবার্টিনি উপন্যাসটি ছাপা হয়। একই বছর তিনি বোলগানা থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। সেবছর এপ্রিলে তিনি সেনাবাহিনীর ডাকে সাড়া দিয়ে বাধ্যতামূলক কাজে যোগ দেন

এবং দায়িত্ব পালনে প্রথমে ওরভিয়েটো এবং পরে রোমে গমন করেন। সামরিক বাহিনীর চাকুরির এই অভিজ্ঞতা তাকে দ্যা ডায়রি অব আ সোলজার এবং এক্কি পো পো উপন্যাস দুটি লেখার অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে। খুব কম লিখলেও, তার কাজ যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। লেখালেখিতে যথেষ্ট সফলতার মুখ দেখলেও, বিষয় হিসেবে সমকামিতাকে বেছে নেয়ায় প্রায়ই তাকে সেন্সরসহ আরও অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তিনি ইতালির পোস্টমর্ডান সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। আল্টরি লিবেরটিনি, সেপারেট রুমস, প্যাও প্যাও: রোমান তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম। ডিনার পার্টি তার লেখা একটি বহুল আলোচিত নাটক। তানদেল্লির বেশ কিছু উপন্যাস, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধসহ আরও বেশ কিছু লেখালেখি নিয়ে সিমন অ্যান্ড স্চুস্টার দুটি খণ্ড প্রকাশ করে। মরণ ব্যাধি এইডসে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯৯১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ইতালির রেগিও এমিলিয়ায় মৃত্যু বরণ করেন। করেগিও'র বাইরে হেমলেট অব ক্যানোলোর ছোট্ট এক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

ব্যারন স্কারপিয়ার ডায়রি থেকে | পাওলা ক্যপ্রিওলো | অনুবাদ : সোহরাব সুমন

মহিলার সঙ্গে কথা বলবার কোনো দরকার নেই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই ক্যাভালিয়েরে ক্যাভারাডোসি নিজের ওপর তার সব নিয়ন্ত্রণই হারিয়ে ফেলেছে। লোকটার মতামত, তার সন্দেহজনক বন্ধুত্ব, আর এখনকার এই ঈশ্বরনিন্দুক অঙ্গভঙ্গি... আমার ভয় হচ্ছে, হায়রে, সেদিন বুঝি খুব বেশি দূরে নয় যেদিন বিশিষ্ট এই ক্যাভালিয়েরেকে স্বর্গের দরজায় সঙ্গ দেয়াই আমার একমাত্র কাজ হবে। অন্য কারো সঙ্গে, মানে এই গায়িকার সঙ্গে কথা বলে, লাভের কোনো আশা নেই; সন্দেহ নেই রাজনৈতিক চক্রান্তে মেয়েটার কোনো হাত নেই; হ্যাঁ, ও কেবল ক্যাভালিয়েরে'র সহযোগী মাত্র, কিন্তু নৈতিকতার বিচারে সেটা একটু আলাদা।

এর মাঝে সত্য হলো এই যে, তার পদমর্যাদার একটা লোক চিত্রকরের দক্ষতা দেখাবার জন্য, জনসম্মুখে নিজের কাজ প্রদর্শনের আগে, সর্বতভাবে আন্তরিকতার মাধ্যমে নিজের প্রতি অনুরক্ত থাকা উচিত, এটা আপনা থেকেই স্বাভাবিকতার ব্যত্যয়, আর তাই অনুচিতও। অন্তত যেখানে তাকে ধর্মীয় বিষয়াদিতে বিরত থাকা উচিত, কিন্তু না, সে তার প্রেমিকাকে ঈশ্বরের গৃহে স্থাপন করতে ইচ্ছুক, একটা বেদির ওপর ওকে রেখে, এবং তার চেয়ে বড় কথা হলো তাতে তার শৈল্পিক ঐতিহ্যের তাৎপর্যগত দৈন্যতাও ফুটে উঠবে। সত্যি, আমি খুব অবাক হচ্ছি, যেখানে অন্য সবাই পবিত্র কুমারী মাতার প্রতিনিধিত্ব করা জমকালো অঙ্গভঙ্গির চিত্রকর্মটিকে দেখতে পাবে, ওর কুচকুচে কালো চোখ জোড়া ঠিক লুসিফারের মতো, বরং, এধরনের তুলনার মাধ্যমে এর মডেলের প্রতি অনেক বেশি সম্মান দেখানো হবে, তারচেয়ে বরং অন্য কোনো পতিত দেবদূত কি হতে পারত না? যদি এর উদ্দেশ্য ধর্মীয় বা নৈতিক নিন্দার

বিষয় হয়ে থাকে, এর ফলাফল হিসেবে, একথা বলতেও আমার কষ্ট হবে, নান্দনিকতার দিক দিয়েও এটা অপছন্দের, চিত্র প্রতিযোগিতাতে যেমনটা সব সময়ই দেখতে পাওয়া যায়, তখন সেটাকে সমর্থন জানানো উচিত এমন একটা ধারণাও আমাদের ভেতরে কাজ করে। ক্যাভালিয়েরের মাঝে ভালো জিনিসটা হলো সে তাকে একজন বিসদৃশ চিত্রকর হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছে, শৈল্পিক অসঙ্গতির একজন স্রষ্টা, যেন নতুন একটা কিছু তৈরির প্রয়োজন ছাড়া আমাদের বিশ্বে এধরনের কাজের যথেষ্ট পরিমাণে অস্তিত্ব নেই।

চলাচলের পথের সবটা খুঁটিয়ে দেখি, বন্ধ চ্যাপলসমূহের গরাদগুলোর ভেতর খুব কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখি, পেছনে কেউ কিছু ফেলে গেল কিনা তা দেখতে বেঞ্চিগুলো সব চষে ফেলি, একটা রুমাল, একটা হাত পাখা, অথবা হতে পারে একটা রঙতুলি; অন্যভাবে বলতে গেলে আমি যেটা আগে থেকেই জানতাম তা আদৌ সত্য কিনা প্রচলিত পদ্ধতিতে সেটা খতিয়ে দেখতে চাইছিলাম, যে, সেই ক্যাভালিয়েরে ক্যাভারাডোসি, সেই বিখ্যাত চিত্রকর এবং কুখ্যাত দুষ্কৃতকারী, এখানকার দেয়ালের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে কিনা কিন্তু এর সবই অপ্রাসঙ্গিক, কেননা আমি যে চার্চে যাই তারা আসলে জানেই না যে ছবিটা এরই মধ্যে প্রদর্শিত হয়ে গেছে; অন্য একটা কারণেও আমি ক্যাভালিয়েরেকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠি, এবং সেটা ভুলে যাওয়া আর তাকে খুঁজবার কথা চিন্তা না করে সেখান থেকে চলে যাওয়া ছিল আমার ওপর তার চূড়ান্ত অবহেলার নজির। তাই আমার অফিসকে অপ্রশম্য ঐকান্তিক উৎসাহ নিয়ে অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হয়, এবং একইভাবে বাকি আরো যাদের সন্দেহ হয় তাদের বিরুদ্ধেও, যেহেতু অপরাধ সংক্রামক রোগের মতো, ক্যানসারের মতো, এবং আরো বেশি এলাকা জুড়ে এর ছড়িয়ে পড়া রোধে জায়গাটাকে আলাদা করার মতো কঠোর পদক্ষেপের নেবার জন্যে আদেশ জারি করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। তারপরও, নিয়ন্ত্রণহীন নিষ্ঠুরতার বোধ, যার দ্বারা আমি আগেও আক্রান্ত হয়েছি সেই সংস্কারদূষণ আমার দায়িত্ব অবহেলার খুব ভালো একটা ছুতা হতে পারত। চার্চটা ছিল অন্ধকার, গির্জার মূল অংশে বা এর প্রধান বেদির সামনে প্রার্থনারত অবস্থায় কেউই ছিল না, কেবল গোটা কতক দীপের আলো অন্ধকার ভেদ করে সোনালি বিন্দুটাকে মলিনভাবে দীপ্তিময় করে রেখেছিল। যে কেউ এক কথায় বলে দিতে পারবে সেখানে জীবিত কেউই ছিল না, বেশির ভাগ সময়ই এর চারপাশটা এমনই থাকে, কারণ এটা এমন একটা চার্চ যেখানে লোকজনের যাতায়াত একেবারেই কম। সদর দরজা থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ জমকালো একটা কুঞ্জপথ রয়েছে, খোলা থাকলেও সেটা এতটাই সরু যে কোনো বাহন যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট নয়, অন্যদিকে সবদিক থেকে গির্জাটা ঘরবাড়ির ভাঙ্গা দেয়াল দিয়ে ঘেরা যে আমি সেখান দিয়ে ঢুকবার সময় ঈশ্বর হয়ত আমাকে দেখে থাকবেন এমন কথা ভাবলেও মনে বিস্ময় জাগে, নতুবা এমনও হতে পারে তিনি নিজেই এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত নন বা এর কথা ভুলে বসে আছেন। বিকেলের শুরু থেকে সান্ধ্য প্রার্থনার আগপর্যন্ত উত্তপ্ত আরো কতগুলো দীর্ঘ ঘন্টা পার করতে হবে, যে সময়টাতে, একরাশ রোদের আলোয় ছেয়ে থাকা আকাশের নিচে, কেবল পুলিশ আর ষড়যন্ত্রকারীদের পাথরে বাঁধানো তাপে দগ্ধ পথের ওপর স্পর্ধ ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাবে। কিন্তু অভ্যাসবশতই লোকেদের খোঁজার ব্যাপারে আমি একজন পাকা শিকারি এবং সাহসের সঙ্গে আমি একথাও বলে দিতে পারি, পেশার কারণেই; আমি আমার

শিকারের উপস্থিতি টের পাই, বিশেষ করে ওরা যখন লুকিয়ে থাকে, ঠিক যে বোধশক্তির কারণে শিকারের সময় কুকুর গন্ধ শুকে তার শিকারকে খুঁজে পেতে পারে, সেকারণেই আমিও বুঝতে পারি, চারিদিকে সুনসান নীরবতা টের পাবার পরও, চার্চটা মোটেই খালি নয়। চলাচলের পথের সবটা খুঁটিয়ে দেখি, বন্ধ চ্যাপলসমূহের গরাদগুলোর ভেতর খুব কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখি, পেছনে কেউ কিছু ফেলে গেল কিনা তা দেখতে বেঞ্চিগুলো সব চষে ফেলি, একটা রুমাল, একটা হাত পাখা, অথবা হতে পারে একটা রঙতুলি; অন্যভাবে বলতে গেলে আমি যেটা আগে থেকেই জানতাম তা আদৌ সত্য কিনা প্রচলিত পদ্ধতিতে সেটা খতিয়ে দেখতে চাইছিলাম, যে, সেই ক্যাভালিয়েরে ক্যভারাডোসি, সেই বিখ্যাত চিত্রকর এবং কুখ্যাত দুষ্কৃতকারী, এখানকার দেয়ালের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে কিনা, নাকি আমার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে ব্যাটা এরই মধ্যে ভেগেছে। সত্যি বলতে কী, কোনো পাপী এখান থেকে চলে যাবার পরও কিছু সময়ের জন্য সেই অধিভৌতিক ঘ্রাণ থেকে যায়, একারণেই এরইমধ্যে আমি অনেক পাপীকে বিচারের জন্য হস্তান্তর করে স্বর্গীয় অনুকম্পার প্রতি তাদের আত্মাকে বিশ্বাস স্থাপন করাতে পেরেছি, এবং আমি এখন নিঃসন্দেহে ক্যাভালিয়েরে ক্যভারাডোসির ঘ্রাণ পাচ্ছি, অথবা এমন কিছু একটার গন্ধ যা এখন এমন একটা জিনিসের ভেতর থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে যা তার খুব অন্তরঙ্গ ছিল। যদিও সে সম্পর্কে আমি কেবল এইমাত্র নিশ্চিত হলাম।

আমি প্রথম চ্যাপলের বাম পাশের বসার জায়গাটার কাছে একটা গেট খোলা দেখতে পাই, এবং, যাতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে না উঠে তাই যতটা সাবধানে পারা যায়, আমি ভেতরে ঢুকি; সেখান থেকে, গরাদের ভেতর দিয়ে, সেগুলো একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন আর খানিক দূরে দূরে অবস্থিত হওয়াতে, আমি দৃষ্টির বাইরে অবস্থান করেও, চ্যাপেলের পুরো সারিটা দেখতে সক্ষম হই। অন্ধকারের কারণে আমাকে কোনো সমস্যা পোহাতে হয় না, কারণ এটাই আমার স্বভাব, যদিও এর মাঝে তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন কুকুরের মতো একটা দিক আছে, বাকিটা বিড়াল এবং এর অন্যান্য প্রজাতির ধূর্ততার সঙ্গে অনেক বেশি মিলবে, আর তাই আমি আমার পার্থিব কাজকারবার খুব সহজেই করতে পারি, ঈশ্বর আমাকে এমন এক জোড়া চোখ দিয়েছেন যার সাহায্যে আমি অন্ধকারেও সব কিছুর অবয়ব আর নড়াচড়া টেরপাই। গেট পার হবার পরপরই আমি বুঝতে পারি যে এই অংশগুলোর সাহায্য নেয়া আমার দরকার হবে না: লাগোয়া চ্যাপলে বেদির পাশে প্রদীপের দীর্ঘ সারি, এবং প্রথম বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসে থাকা, মহিলার মুখটা প্রায় শিখা ছুঁই ছুঁই অবস্থা, এই কি সেই, ফ্লোরিয়া টোসকা, সেই গায়িকা। সম্ভবত ক্যভারাডোসি তার রঙতুলি, রুমাল বা ব্যবহৃত কোনো কিছুর বদলে ওকেই এখানে ফেলে রেখে গেছে। আমি একে অনুকূল একটা সুযোগ হিসেবে গণ্য করি, কেননা বোবা কোনো আলামতের চেয়ে কথা বলতে পারে এমন একটা আলামত থেকে নিঃসন্দেহে দ্বিগুণ সুবিধা পাওয়া সম্ভব, যদি ভালোভাবে সেটা কাজে লাগানো হয়।

আমি ওকে আগেও কোথাও দেখেছি, পথেঘাটে, নতুবা অভিজাত বাড়িগুলোর কোনো অভ্যর্থনা কক্ষে যেখানে সে তার স্বরের প্রতিভা কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু ওর সঙ্গে

কখনোই আমার কথা হয়নি, সেইসব মোহগ্রস্ত লোকেদের ভিড়েও আমার যোগ দেয়া হয়ে ওঠেনি যারা প্রতিবার নাটকের টিকেটে তার নাম দেখার পর ওর প্রশংসা করার জন্য থিয়েটারের দিকে ছুটেছে। এবার ঘটনাক্রমে আমাকে ওর মুখোমুখি হতে হবে এবং ওকে প্রশ্ন করতে হবে। এর সঙ্গে দায়িত্ব পালনের বিষয়টিও জড়িত। সেইসঙ্গে, এই চিন্তাও আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে না, অবশ্য আগে থেকেই সেটা আমার জানা কিভাবে ওর মন্ত্রমুগ্ধ স্বরের যাদু প্রতিরোধ করতে হবে, সেটা জয় করে, তারপরই কেবল ওর গোপন করতে চাওয়া সব কথা আমার কাছে প্রকাশের জন্য প্ররোচিত করার নিগূঢ় কৌশল প্রয়োগ করা যাবে।

এমনকি ওর বাইরের ঠাটবাটের মাদকতাও আমাকে খুব একটা সমস্যায় ফেলতে পারেনি; এর সব কিছুই আমাকে সব সময় নিরুৎসুক রেখেছে, এবং প্রচলিত ধারণা থেকেও দূরে রেখেছে, এমনকি তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করবার কাজটাও আমি নিজের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। নারীর সৌন্দর্য হলো ঐকতান, সৃষ্টির ঐকতানের এক নির্মল আয়না, কিন্তু সেই তুলনায় টোসকা পুরোটাই অনৈক্য আর অস্থির। কালো চুলের কারণে অতিমাত্রার এক আভাস যা ওর মলিন মুখের ওপর মুকুটের মতো অবস্থান করে, সেই কৃষ্ণতা এতই গভীর যেন যারা এর দিকে তাকিয়ে থাকবে তারা নিজেদের ভেতরকার নির্দিষ্ট এক বিস্বাদকেই প্ররোচিত করবে, তাঁর আকুল চোখের আভাস তাদের কাছে অনেকখানি বেড়ে যাবে, যেন সে অদৃশ্য কোনো সহচরকে সঙ্গে নিয়ে বল্গাহারা প্রবল অনুরাগে সর্বদাই একাগ্রচিত্তে গেয়ে চলেছে। এর সব কিছুকে যেন আমাদের সময়ের সঙ্গে মানানসই বলেই মনে হয়: এমন মনে হচ্ছে, যেন স্বাভাবিক গুণের সাবলীলতার প্রতি, লোকেদের একটা বিবমিষা রয়েছে, যা কোনো অরুচিকর বোধের মতো নিদারুণ তাচ্ছিল্য, এবং তা খুঁত, ভালো ব্যবহারের সীমা ছাড়ানো আচরণ এবং কোনো আভ্যন্তরীণ বিকৃতির বদলে ব্যাধিগ্রস্ত আকর্ষণের খোঁজ করে বেড়ায়।

তার এই উচ্ছৃঙ্খল কাজকারবার, ঈশ্বরভীতি আর অনুশোচনার মাঝে গমনাগমনের মাধ্যমে, সম্ভবত সে নিজেকে এমনভাবে ঠকাচ্ছে যেন এভাবে সে পরম পিতাকে ধোঁকা দিতে পারছে, অথবা সম্ভবত এরই মধ্যে যারা তার স্বভাবের, তাদের থেকেও নতুন কোনো পার্থক্য যোগ করার মাধ্যমে সে কেবল নিজস্ব আবেদন বাড়াবার আশা করছে, যাতে নিঃসন্দেহে বিক্ষিপ্তচিত্তে, কৃত্রিম উপায়ে তার স্রষ্টার নজর কাড়ার উদ্যোগটাকে চাঙ্গা করতে পারে এবং তারপরও সেই মুহূর্তে, ওকে প্রার্থনায় মগ্ন দেখতে পেয়েও, আমি ভিন্ন দৃষ্টিতে টোসকাকে অবলোকন করা থেকে নিজেকে সংবরণ করতে পারি না। আমি পা টিপে গরাদের সামনে গিয়ে হাজির হই, যেন সে আমার উপস্থিতি টের না পায়। তার অবয়ব অন্ধকারের মাঝে বিলীন হয়ে আছে, বেদির সামনে জড়ো হয়ে থাকা দীপ সারির লালচে আভায়, কেবল তার মিলিত হাত জোড়া আর মুখটা বেরিয়ে রয়েছে, এবং সেই দৃশ্য দেখে আমার মনে হতে থাকে সেখানে যেন আমি এমন এক অভিব্যক্তির খোঁজ পেয়েছি যা নির্মল স্বর্গসুখের অনন্য মিষ্টতায় ভরপুর।

আমি এই টোসকার কথাই শুনেছি, যে অনৈতিক জীবন সে যাপন করে আসছে, আগে সে খুবই ধার্মিক ছিল, এক সময় বিবেকের তাড়নায় নিয়মিত সে চার্চে যেত, যদিও এই বিচারে সব সময়ই আমি এধরনের একটি অঙ্গভঙ্গি, এমন একটি মেকি আচরণের প্রতি সন্দিহান। তার এই উচ্ছৃঙ্খল কাজকারবার, ঈশ্বরভীতি আর অনুশোচনার মাঝে গমনাগমনের মাধ্যমে, সম্ভবত সে নিজেকে এমনভাবে ঠকাচ্ছে যেন এভাবে সে পরম পিতাকে ধোঁকা দিতে পারছে, অথবা সম্ভবত এরই মধ্যে যারা তার স্বভাবের, তাদের থেকেও নতুন কোনো পার্থক্য যোগ করার মাধ্যমে সে কেবল নিজস্ব আবেদন বাড়াবার আশা করছে, যাতে নিঃসন্দেহে বিক্ষিপ্তচিত্তে, কৃত্রিম উপায়ে তার স্রষ্টার নজর কাড়ার উদ্যোগটাকে চাঙ্গা করতে পারে, যখন তিনি তাকে মায়াবী এক জোড়া চোখ, গাঢ় কালো চুল আর এমন ধবধবে সাদা চামড়া দিয়েছেন। এখন এর বদলে আমি তার একটা বিশ্বাসের সত্যিকার স্ফুলিঙ্গকে চিহ্নিত করতে পেরেছি আর আমার মনে হতে থাকে যে তার ধর্মানুরাগ অর্জিত হয়েছে অসংখ্য পাপের ক্ষমা পাবার জন্যে, যাতে একদিন, সেই মহান যার অমূল্য মহিমার প্রত্যাশা করে তার অপরিবর্তনীয় বাক্যে আমি নিজেকে বিচার করার অপেক্ষায় থেকে, ফ্লোরিয়া টোসকা, সেই গায়িকা, ক্যাভারাডোসির প্রেমিকাকে খুঁজে পাই, যিনি আশীর্বাদ প্রাপ্ত আত্মাসমূহের বৃত্তের মাঝে, কৌমার্যের খাদহীন স্ফুলিঙ্গ সহকারে বসে রয়েছেন।

আমি ওর দিকে এগোতে থাকি, সিদ্ধান্ত নেই এবার তার সঙ্গে তাদের থেকেও পুরোপুরি আলাদা স্বরে কথা বলব, যাদের আমি সবার প্রথমে কাজে লাগাবার কথা ভেবেছিলাম: যে তার দুষ্কর্মের স্বীকারোক্তিতে আহত হয়ে অশ্রদ্ধেয় হবার কথা বলে বেড়ায় তার বিচারক হিসেবে নয়, বরং একজন ডাক্তার তার রোগীকে যেভাবে সম্বোধন করে, অথবা একজন বোনের ভাই হিসেবে যে কিনা পতিত হবার পরও তার বোনের প্রতি খুবই প্রীতিভাজন থেকে যান। প্রার্থনার সময় তাকে বিরক্ত করব না বলে আমি সিদ্ধান্ত নিই, এবং সে আপনা থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসার আগপর্যন্ত গির্জার বসার জায়গাটাতে শ্রদ্ধাভরে অপেক্ষা করব বলে ঠিক করি।

চ্যাপেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তার উপস্থিতি টের পাবার পর আমি এর ভেতরকার দৃশ্য দেখা বন্ধ করি। টোসকা তখনও ওর হাঁটুর ওপর, স্থির ভঙ্গিতে প্রার্থনাসঙ্গীত পাঠে ব্যস্ত। তার অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে আমি তার কাঁধ আর বেদির দিকে তুলে ধরা উঁচু মাথার আবছা একটা রেখা দেখতে পাচ্ছিলাম, বেদির কার্নিশের ওপর একটা চিত্রকর্ম দীপের আলোক প্রতিফলনে আলোকিত হয়ে আছে। প্রার্থনার একপর্যায়ে সে তার স্বর খানিকটা চড়া করে, এই শব্দগুলোর ওপর স্পষ্ট জোর দেয়, “বেনেডিকটা টু ইন মুলিয়েরিবুস—নারীকুলের মাঝে ধন্য হে তুমি,” কণ্ঠে উষ্ণতা ধরে রেখে গভীর ধ্বনিমুদ্রা সহকারে ও কথাটা বলে, যা প্রথমবারের মতো আমাকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। অবশ্যই সেই অভাগী নারীর প্রার্থনা পুণ্য কুমারীর প্রতিচ্ছবিকে উদ্দেশ্য করে, এবং সত্যিই, খুব মনোযোগ দিয়ে তাকাবার পর, আমি বেদির ওপরকার ক্যানভাসে স্বর্ণের আলখাল্লা পরা এক নারীর অবয়ব উপলব্ধি করি। ভালো করে দেখবার জন্য আমি কয়েক কদম সামনে এগিয়ে যাই।

সম্ভবত টোসকা সেটা শুনতে পায়; আমার মনে হয় সে নড়েচড়ে বসেছে কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারি না, তার উপাসনার মাঝে প্রবেশ করে সমস্যা তৈরির কথা চিন্তাও করতে পারি না। আমি অবিশ্বাস আর ক্ষোভের সঙ্গে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকি, আমার ভেতরে তখন শীতল রক্ত বইছে, অবাক হই কিভাবে ক্যাভারাডোসি ঈশ্বর মাতাকে এমন একজন নারীর অবয়ব দেবার সাহস দেখাতে পারল যে কিনা তার অবৈধ ভোগসুখের সঙ্গী, এবং কিভাবে সেই একই নারী তার নিজের প্রতিকৃতির সামনে হাঁটুগেড়ে বসে প্রার্থনা জানাবার সাহস দেখাতে পারে। কেননা বৃথাই মারিয়ার পবিত্র নাম ধারণ করে, সেই ছবিটা বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, টোসকার এই ছবির মাঝে চূড়ান্ত আনুগত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, দাঁড়কাক রঙা চিকন কালো দীর্ঘ চুল বয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে, ফ্যাঁকাশে ধবল মুখের চারপাশে যার উপস্থিতি যে কোনো অবগুণ্ঠনের দ্বারাই উন্মোচিত হয়ে পড়তে বাধ্য এবং ঘন নীলচে ছোপের আবরণ এতটাই অন্ধকারময় দেখাচ্ছে যে সেটাকে কালো বলেই মনে হতে থাকে। নান্দনিকতার প্রকাশে চিত্রকর কুমারীর যে অবয়বটাকে এখানে জীবন্ত করে তুলেছেন, আমি সেই একই মহিলাকে চিনতে পারি, একবার যখন টোসকার ওপর গোয়েন্দাবৃত্তি করছিলাম তখন আমি এরকম কিছু একটাই উপলব্ধি করেছিলাম, কিন্তু কেবল এখনই সেই নান্দনিকতা তার স্বভাবের প্রকাশ ঘটাল, যেহেতু তার কৌমার্য ব্রতের কোনো সম্ভাবনাই নেই। প্রতিটা খুঁটিনাটির মাঝেই প্রচণ্ড উল্লাস, ইন্দ্রিয়সুখকাতরতা এবং অপার আপন-সুনজর প্রদর্শিত হচ্ছিল: হৃষ্টপুষ্ট এক জোড়া মাংসল ঠোঁট, অতিরঞ্জিত বাস্তববাদিতায় চিত্রিত হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে তা যেন একটি দ্ব্যর্থক হাসিতে উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে, এবং উজ্জ্বল আকর্ষণীয় চোখের ওপর নেত্র পল্লবগুলো অর্ধনিমীলিত হয়ে আছে। আমার পক্ষে এটা বুঝে নেয়া মোটেই কষ্টকর নয় ঠিক কোন পরিস্থিতিতে, ঠিক কেমন কামুক মিলনের সময় চিত্রকর মডেলের চেহারার এমন অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন।

প্রকাণ্ড কাঠের দরজাটার কাছে পৌঁছাবার পর আমি থামি; তখনই দেখতে পাই টোসকার মুখোমুখি না হয়ে জায়গাটা ছেড়ে আসার কোনো উপায় নেই, অন্তত এক মুহূর্তের জন্য তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া ছাড়া। আমার আত্মসম্মান, একজন পুরুষ হিসেবে আমার মর্যাদা, সেখানে অবস্থান করা এবং তার জন্য অপেক্ষা করাকে অপরিহার্য করে তোলে "বেনেডিকটা টু ইন মুলিয়েরিবুস—নারীকুলের মাঝে ধন্য হে তুমি," আমি ক্ষোভের সঙ্গে ফিসফিস করে কথাটা বলি, আর নিশ্চিতভাবে টোসকাও তা শুনতে পায়, তাই সে দ্রুত গোলাপ আর ক্রুসচিহ্ন আঁকে। এভাবে তার মুখোমুখি হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে আমি আমার আবিষ্কারের বোঝা বইতে অক্ষম হয়ে পড়ি এবং, যে কারণটা আমাকে আজ এই চার্চে টেনে এনেছে তা পুরোপুরি ভুলে যাই, আমি প্রবেশপথের দিকে এগোতে শুরু করি, বলতে গেলে অনেকটা দৌড়ে। প্রকাণ্ড কাঠের দরজাটার কাছে পৌঁছাবার পর আমি থামি; তখনই দেখতে পাই টোসকার মুখোমুখি না হয়ে জায়গাটা ছেড়ে আসার কোনো উপায় নেই, অন্তত এক মুহূর্তের জন্য তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া ছাড়া। আমার আত্মসম্মান, একজন পুরুষ হিসেবে আমার মর্যাদা, সেখানে অবস্থান করা এবং তার জন্য অপেক্ষা করাকে অপরিহার্য করে তোলে। আমি নিজেকে পবিত্র জলের সামনে জায়গা করে দিই, তাতে করে বেরোবার সময় তাকে আমার পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য হতে হবে। স্তম্ভশ্রেণীর মাঝে সরু পথ দিয়ে নেমে আসার সময় আমি ওর দিকে চোখ রাখি। তখনই আমি ওকে

হোঁচট খেতে দেখি, আর বুঝতে পারি আমাকে ও চিনতে পেরেছে; সেও আপাতদৃষ্টিতে এমন একজোড়া চোখের অধিকারী যা অন্ধকারে আকৃতি পেতে সক্ষম, বিড়ালের মতো, নিশাচর কোনো প্রাণীর মতো। যে ঘনরঙা পোশাক ও পরে আছে আর যে অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করেছে তার নিচে উপলব্ধি করা যায় এমন দাঁড়কাকরঙা তমিস্র চুলের প্রাচুর্যের কারণে, চার্চের অন্ধকারের চাইতেও ওকে আরো বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল, ঠিক যেমন করে নক্ষত্রেরা আকাশে আলোক বিচ্ছুরণ ঘটায় যেন ঠিক তেমনি করে সেও নিজের সেই ছায়াটাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

ইচ্ছাকৃতভাবে, আমি আধো খোলা প্রবেশ দরজা থেকে সরে দাঁড়াই যাতে সূর্য রশ্মি ঢুকে টোসকার মুখটা আলোকিত করে তুলতে পারে। দেখতে পাই একটা হাত দিয়ে সে চোখ দুটাকে ছায়া দিতে থাকে; তারপর আবারও হাঁটতে শুরু করে, তবে খুব ধীরে। সম্ভবত ভয় পাবার কারণে, যদিও ওর আচরণ উদ্ধতই থেকে যায়, অনেকটা তাচ্ছিল্যের চাহনিতে। যে ইচ্ছেটা আজকে আমাকে এখানে টেনে এনেছে ঠিক এমনই কোনো অনুভূতি থেকে, সব আশঙ্কা দমন করে, ও পেছন ফিরবে না, আমি নিশ্চিত, দরজার কোনো একটা কোণের দিকেও ও তাকাবে না, ও সোজাসুজি আমার দিকে আসবে। দৃঢ়সংকল্পবোধ তার আচার-আচরণকে এমনই এক রাজকীয়তার অধিকারী করেছে, এবং বরাবরের মতো ওকে আমি যেমনটা দেখে এসেছি তা এই নারী নামক উদ্ধত জন্তুর মাঝে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর যে কিনা খুব সহজেই নিজেকে ক্যাভারাডোসি আর তার পূর্বসূরিদের কাছে সঁপে দিতে প্রস্তুত ছিল। বরং আমি তাকে পুণ্যবান চিহ্নিত কৌমার্য চর্চাকারী বলে ধরে নিই অথবা বরং এমনও ভাবি এটা সেই প্রতিমূর্তি যার ভেতরে এক সীমাহীন ঔদ্ধত্যের অন্তঃসলিলা ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছে।

আমার কাছাকাছি আসার পর টোসকা আমাকে না দেখার ভান করে এবং সামনে এগোতে নেয়, কিন্তু দ্রুত আমি ওর পথ আগলে দাঁড়াই। আমি আমার হাতটা পবিত্র জলাধারে ডুবাই এবং নিবেদন অর্পণ করবার মতো করে ওর সামনে তা মেলে ধরি, যাতে করে ও পবিত্র জল গ্রহণ করবার জন্যে আমার সামনে আসতে বাধ্য হয়। শীঘ্র আমার হাত থেকে ও আর নিজের হাতটা সরিয়ে নিতে পারে না, আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকায় দৃষ্টিও নামাতে পারে না; ও স্থির হয়ে থাকে, যদিও আমি ঠিকই ওর হাতে মৃদু একটা শিহরণ টেরপাই। অবশেষে আকস্মিকভাবে ও সেটা সরিয়ে নেয়, এবং বুকে ক্রুশ না এঁকেই চার্চ ছেড়ে বেড়িয়ে যায়।

লেখক পরিচিতি : ইতালীয় ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, অনুবাদক, এবং সাহিত্য সমালোচক পাওলা ক্যাপ্রিওলো (Paola Capriolo) ১৯৬২ সালে পহেলা জানুয়ারিতে ইতালির মিলানে জন্মগ্রহণ করেন, এবং এখনও সেখানেই বসবাস করছেন। তিনি ইউনিভারসিটি অব মিলান থেকে দর্শন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। তার প্রথম গল্প গ্রন্থ লা গ্রান্ডে ইউলালিয়া ছাপা হয় ১৯৮৮ সালে। তার লেখায় বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা, স্বরূপ বিষয়ক প্রশ্ন, এবং কোনো কিছুর মানে বদলে যাবার দর্শন এবং অধিবিদ্যাগত প্রশ্নের পর্যালোচনা খুঁজে পাওয়া যায়। এতে শৈল্পিক রীতিতে কল্পনার মিশেলে মিথ, জার্মান সাহিত্য এবং দর্শনের ঐতিহ্য চিত্রিত হয়েছে। তার লেখায় মুখ্য চরিত্রের একাকীত্বের মাঝে সঙ্গীতের অনুপ্রেরণাও দেখতে পাওয়া যায়। এপর্যন্ত তার বারোটি উপন্যাস এবং অসংখ্য ছোট গল্প, এবং শিশুতোষ গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একাধারে, জার্মান লেখক গোথে, কেল্লার, মান, স্লিটসলার, কাফকা, সিমেল, ক্লেইস্ট, স্টিফটার এর ফিকশনেরও একজন অনুবাদক। তিনি কোরেরে ডেল্লা সেরা পত্রিকার সংস্কৃতি পাতার একজন নিয়মিত লেখক। ইংরেজি, ড্যানিশ, ডাচ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান, জাপানিজ, পর্তুগিজ এবং স্প্যানিশসহ তার লেখা বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। নিজের পোষা বিড়ালকে তিনি খুবই ভালোবাসেন।

সেই সূর্য উঠবার পর থেকে নীলকন্ঠ পাখিটা চেঁচামেচি করে চলেছে।

বৃষ্টি আটকানোর শাটারগুলো খুলতেই তাদের চোখের সামনে পাখিটা পাইন গাছের একটা নিচু ডাল থেকে উড়ে গেল। কিন্তু মনে হচ্ছে পাখিটা আবার যেন ফিরে এসেছে। সকালের জলখাবারের সময় ডানার ছটফটানির শব্দ শোনা গিয়েছিল।

"এই পাখিটা এক মহা অত্যাচার," ছোট ভাইটা বলে উঠল। নিজ পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো শিখছে ও।

"ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।" ঠাকুমা ওকে থামালেন। "ও ওর বাচ্চাটাকে খুঁজছে। মনে হচ্ছে কাল বাচ্চাটা বাসা থেকে পড়ে গেছে। অনেক সন্ধ্যা পর্যন্ত মা-টা চারপাশে উড়ছিল। ও কি জানে না বাচ্চাটা কোথায়? কিন্তু কী ভালো মা-টা। আজ সকাল হতেই আবার খুঁজতে এসেছে।"

"ঠাকুমা ঠিক ঠিক জানে," ইওশিকো বলল।

তার ঠাকুমার চোখ খারাপ ছিল। বছর দশ আগে নেফ্রাইটিসের আক্রমণ ছাড়া সে জীবনে কখনো অসুস্থ হয় নি। কিন্ত তার চোখের ছানির জন্য, সেই ছেলেবেলা থেকেই সে তার বাম চোখ দিয়ে খুব অল্প দেখতে পেত। ভাতের বাটি আর চপস্টিক তার হাতে দিয়ে দিতে হতো। যদিও হাতড়ে হাতড়ে সে বাড়ির ভিতরটাতে চলাফেরা করতে পারত, কিন্তু একা একা সে বাগানে যেতে পারত না।

কখনো কখনো কাচের স্লাইডিং দরজাটার সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে, সে নিজের হাতটা মেলে ধরত। কাচের ফাঁক দিয়ে যে সূর্যের আলো এসে পড়ত তার বিপরীতে আঙুলগুলোকে পাখার মতো মেলে ধরে সে তাকিয়ে থাকত। এখন বিভিন্ন কোণে ছড়িয়ে পড়া সেই দৃষ্টির মাঝে সে তার জীবনীশক্তির যতটুকু বাকি ছিল তার সবটুকু জড়ো করবার চেষ্টা করছিল।

আয়নার সামনে বসে ইওশিকো তার নখের নিচের সাদা তারাগুলোর দিকে তাকাল। কথায় বলে যখন নখের নিচে তারা দেখা যায়, তখন তুমি কিছু পাবে। সেটারই চিহ্ন এটা। কিন্তু ইওশিকোর মনে হচ্ছে খবরের কাগজে ও পড়েছে যে তা ভিটামিন 'সি'র অভাব বা তেমন একটা কিছু। মুখে মেকআপ দেওয়ার কাজটা ভালোই হলো। তার ভুরু আর ঠোঁট সব অপরূপ দেখাচ্ছে। কিমোনো-ও ঠিকঠাক পরা হলো

এই সময়গুলোতে ইওশিকো তার ঠাকুমাকে ভয় পেত। যদিও ঠাকুমাকে পেছন থেকে সে ডাকতে চাইত, তা না করে সে চুপি চুপি পালিয়ে যেত।

এই প্রায় অন্ধ ঠাকুমা শুধুমাত্র নীলকণ্ঠ পাখির গলার স্বর শুনে এমনভাবে কথা বলে উঠল যেন সব দেখেছে। ইওশিকো ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

সকালের জল-খাবারের জিনিসপত্র সরাতে গিয়ে ইওশিকো রান্নাঘরে গেল। প্রতিবেশির বাড়ির ছাদ থেকে নীলকণ্ঠ পাখিটি গান গাইছিল।

পেছনের বাগানে একটা চেস্টনাট, দু' তিনটা পার্সিমান গাছ ছিল। সে যখন গাছগুলোর দিকে তাকাল, দেখল আস্তে আস্তে বৃষ্টি পড়ছে। এ সেই ধরনের বৃষ্টি যাকে কিনা ঘন পাতার ওপর ঝরে পড়তে না দেখলে বোঝাই যায় না।

নীলকণ্ঠ পাখিটা চেস্টনাট গাছটায় সরে এসে বসল, তারপর নিচু হয়ে উড়ে এসে মাটিতে চোখ বুলিয়ে আবার ডালে ফিরে এলো। পুরোটা সময় গান গাইছিল পাখিটা।

মা পাখিটা উড়ে চলে যেতে পারছিল না। ওর বাচ্চাটা আশেপাশেই কোথাও আছে বলে কি?

এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে ইওশিকো নিজের ঘরে গেল। ভোর হওয়ার আগে ওর নিজের তৈরি হতে হবে।

বিকালবেলা, ওর বাবা, মা আসছে। সাথে ইওশিকোর বাগদত্ত'র মা।

আয়নার সামনে বসে ইওশিকো তার নখের নিচের সাদা তারাগুলোর দিকে তাকাল। কথায় বলে যখন নখের নিচে তারা দেখা যায়, তখন তুমি কিছু পাবে। সেটারই চিহ্ন এটা। কিন্তু ইওশিকোর মনে হচ্ছে খবরের কাগজে ও পড়েছে যে তা ভিটামিন 'সি'র অভাব বা তেমন একটা কিছু। মুখে মেকআপ দেওয়ার কাজটা ভালোই হলো। তার ভুরু আর ঠোঁট সব অপরূপ দেখাচ্ছে। কিমোনো-ও ঠিকঠাক পরা হলো।

ও ভেবেছিল মা'র জন্য অপেক্ষা করবে। জামা-কাপড়, সাজ-পোশাক পরায় সাহায্য নেবে। কিন্তু পরে ভেবে মনে হলো নিজে নিজে তৈরি হওয়াই বেশি ভালো।

ওদের বাবা দূরে থাকতেন। ইনি ওদের দ্বিতীয় মা।

যখন তাদের বাবা প্রথম মাকে তালাক দিয়েছিল, ইওশিকোর বয়স ছিল চার আর তার ছোট ভাইয়ের বয়স দুই। তালাকের কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল যে ওদের মা চটকদার কাপড় পরে ঘোরাফেরা করত, আর খুব পয়সা খরচ করত, কিন্তু অস্পষ্টভাবে হলেও ইওশিকোর মনে হলো আসল কারণটা আরো যেন বেশি কিছু, আরো অনেক গভীর।

ওর ভাই, ছেলেবেলায়, ওদের মা'র একটা ছবি খুঁজে পেয়েছিল। বাবাকে ছবিটা দেখাতেই বাবা কিছু বললেন না। কিন্তু অসম্ভব রাগী মুখ করে কুটিকুটি করে ছবিটা ছিঁড়ে ফেললেন।

যখন ইওশিকোর বয়স তের বছর, তখন বাড়িতে তার নতুন মা এসেছিল। পরে, ইওশিকোর মনে হয়েছিল যে তার বাবা তার জন্য দশ বছর একাকীত্ব সহ্য করে দিন কাটিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মা ভালো মানুষ ছিলেন। বাড়িতে শান্তি বজায় থাকল।

যখন ছোট ভাই উপরের ক্লাশে উঠল, সে বাড়ি থেকে দূরে হোস্টেলে থাকতে শুরু করল। সৎ মা'র প্রতি তার ব্যবহার চোখে পড়বার মতো বদলে গেল।

"দিদি, মা'র সাথে আমার দেখা হয়েছে। মা বিয়ে করেছে, আজাবুতে থাকে। আসলেই খুব সুন্দর দেখতে রে মা। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছিল।"

হঠাৎ এ কথা শুনে ইওশিকো কোনো কথা বলতে পারল না। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কাঁপতে শুরু করল ও।

পাশের ঘর থেকে সৎমা এসে বসলেন।

"এ তো ভালো কথা, বড় ভালো কথা। নিজের মা'র সাথে দেখা হওয়াটা তো খারাপ না। এটাই স্বভাবিক। আমি জানতাম একদিন এই দিনটা আসবে। আমি তা নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবিনি।"

কিন্তু সৎমার শরীর থেকে সব শক্তি যেন চলে গেল। ইওশিকোর কাছে তার সৎমাকে বড় দুর্বল আর ছোটখাট বলে মনে হলো।

ওর ভাই তড়িঘড়ি করে উঠে চলে গেল। ইওশিকোর মনে হলো ওকে দু'ঘা বসায়।

"ইওশিকো, ওকে কিছু বলো না। ওর সাথে এ নিয়ে কথা বললে ছেলেটা খারাপ পথেই যাবে।" ওর সৎমা নিচু স্বরে বললেন।

ইওশিকোর চোখে জল এলো।

বাবা হোস্টেল থেকে ওর ভাইকে ডেকে বাড়িতে ফেরত নিয়ে এলেন। ইওশিকো ভেবেছিল যে হয়ত ঘটনা এখানেই থেমে যাবে, কিন্তু না তা হলো না। ওর বাবা সৎমাকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকতে শুরু করলেন।

এতে ইওশিকো ভয় পেয়ে গেল। যেন সে পুরুষালী রোষ আর ক্ষোভের নিচে পিষ্ট হয়ে গেল। ওদের বাবা কি ওদেরও অপছন্দ করত প্রথম মার সাথে তাদের যোগাযোগ আছে বলে? ইওশিকোর মনে হতে থাকল যে তার ভাই যে কিনা ভীষণ হঠাৎ করেই নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সেও বাবার ভয়াবহ পুরুষালী একগুঁয়েমিটাই পেয়েছে।

তবুও ইওশিকোর মনে হতে থাকল যে সে যেন এখন তালাক আর আবার বিয়ে করবার মাঝে বাবার দশ বছরের দুঃখ আর কষ্টটুকু বুঝতে পারছে।

আর তাই, যখন তার বাবা ইওশিকোর কাছ থেকে দূরে চলে গেল আর ফিরে এলো বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে, খুব অবাক হলো ইওশিকো।

“আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। ছেলের মাকে বলেছি যে এই তোমার জীবনের নানা ঘটনা। তাই বাড়ির বউ হিসাবে না দেখে ওদের উচিৎ হবে তোমার ছেলেবেলার হাসি-খুশি দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা।”

এইসব কথা ওর বাবা ইওশিকোকে বলতেই, ইওশিকো কাঁদতে শুরু করল।

যদি ইওশিকোর বিয়ে হয়ে যায়, ওর ভাই আর ঠাকুমার যত্ন করবার জন্য কোনো মেয়েলী হাত থাকবে না। সেবা শুশ্রূষা হবে না। ঠিক হলো দু'টো সংসার এক হয়ে যাবে। সে কথায় ইওশিকো মন ঠিক করে ফেলল। ইওশিকো বিয়ে শাদীকে ভয় পেত। কিন্তু যখন সত্যিকারের কথাবার্তা শুরু হলো, শেষমেষ তা অত ভয়ংকর মনে হলো না।

যখন প্রস্তুতি শেষ হলো, ইওশিকো ওর ঠাকুমার ঘরে গেল।

“ঠাকুমা, এই কিমৌনৌতে কি লাল রঙটুকু দেখতে পাচ্ছো?”

"আমি খুব হালকাভাবে ওখানে একটু লাল দেখতে পাচ্ছি। কোথায় দেখি?" ইওশিকোকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে, ঠাকুমা ভালোভাবে দেখবার জন্য কিমৌনৌ আর কোমরে জড়ানো কাপড়টার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

"আমি এর মধ্যেই তোমার মুখ ভুলে গেছি, ইওশিকো। খুব ইচ্ছে করে তুমি এখন কেমন হয়েছো তা দেখতে।"

ইওশিকো ফিকফিক করে হেসে ফেলবার ইচ্ছাটা দমন করল। হালকাভাবে ওর হাতটা ঠাকুমার মাথায় রাখল।

ইচ্ছে করছিল বাইরে গিয়ে বাবা আর অন্যান্যদের সাথে দেখা করতে। খামোখা অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারছিল না ইওশিকো। ও বাইরে বাগানে গেল। হাতটা বাড়িয়ে ধরল, হাতের পাতা উপরের দিকে, কিন্তু বৃষ্টি এত হালকাভাবে ঝরছিল যে তা হাতের পাতাকে ভেজাতে পারল না। কিমৌনৌর ঘাগড়া জড়ো করে ইওশিকো মনোযোগ দিয়ে ছোট ছোট গাছগুলো আর বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে খুঁজতে থাকল। আরে ওই তো ওখানে এলাচি ঝোপের নিচে লম্বা ঘাসের মধ্যে বসে আছে বাচ্চা পাখিটা।

হৃদপিণ্ড জোরে ঝুকপুক করছে। ইওশিকো হামাগুড়ি দিয়ে আরো কাছে গেল। বাচ্চা নীলকন্ঠ পাখিটা ঘাড়ের লোমের মধ্যে মাথা গুঁজে আর নড়াচড়া করল না। ইওশিকো হাতের মধ্যে খুব সহজেই পাখিটাকে নিতে পারল। মনে হলো পাখিটার শক্তি যেন সব শেষ। ইওশিকো চারপাশে দেখল, কিন্তু মা পাখিটা দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই।

ঘরের ভিতর দৌড়ে গিয়ে ইওশিকো ডাক দিয়ে বলল, "ঠাকুমা! আমি পাখির বাচ্চাটাকে খুঁজে পেয়েছি। আমার হাতের ওপর বাচ্চাটা। খুব দুর্বল।"

"ওহ, তাই নাকি? পাখিটাকে জল দেওয়ার চেষ্টা কর।"

ঠাকুমা খুব চুপচাপ ছিল।

যখন সে হাতা দিয়ে কিছুটা জল ভাতের বাটিটাতে দিয়ে বাচ্চা নীলকন্ঠ পাখিটার ঠোঁট তাতে ডুবিয়ে দিল, পাখিটা জল খেল, ওর ছোট্ট গলাটা ফুলিয়ে তুলল। তারপর—পাখিটা কি সেরে উঠল? ও গান গেয়ে উঠল, "কি-কি-কি, কি-কি-কি..."

মা পাখিটা ডাক শুনে উড়ে এলো। টেলিফোন তারে বসে গান গেয়ে উঠল। বাচ্চা পাখিটা ইওশিকোর হাতের ভিতর ছটফট করতে করতে আবার গেয়ে উঠল, "কি-কি-কি..."

"আহা, কী ভালো যে মা-টা ফিরে এসেছে! ওকে তাড়াতাড়ি ওর মা'র কাছে ফিরিয়ে দাও," ঠাকুমা বললেন।

ইওশিকো বাগানে ফিরে গেল। টেলিফোন তার থেকে মা পাখিটা উড়ে এলো, কিন্তু নিজের দূরত্ব বজায় রাখল। চেরী গাছের উপর থেকে ইওশিকোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

ওকে হাতের তালুতে বসে থাকা বাচ্চা নীলকন্ঠ পাখিটা দেখানোর জন্য ইওশিকো হাতটা উঁচু করল, তারপর ধীরে ধীরে বাচ্চাটাকে মাটিতে রাখল।

কাচের দরজার পেছন থেকে ইওশিকো দেখল, মা পাখিটা বাচ্চাটার কান্না শুনে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা দেখে ধীরে ধীরে কাছে নেমে এলো। যখন মা-টা কাছের পাইন গাছের নিচের ডালটায় নেমে এলো, বাচ্চাটা তার পাখা ঝটপট করতে থাকল, মা'র কাছে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। এই চেষ্টায় উলট পালট খেয়ে বাচ্চাটা গান গাইতে থাকল।

এখনো মা পাখিটা মাটিতে নামল না।

তবুও তাড়াতাড়িই এক সরলরেখায় সে বাচ্চাটার পাশে উড়ে এলো। বাচ্চাটার আনন্দ সীমাহীন। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, কাঁপা কাঁপা ছড়ানো পাখায় বাচ্চাটা ওর মা'র কাছে উড়ে গেল। স্পষ্টত মা-টা বাচ্চার জন্য কিছু খাবার এনেছিল।

ইওশিকো চাইছিল যে ওর বাবা আর সৎমা যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। ও ওদের এই দৃশ্যটুকু দেখাতে পারলে বড় খুশি হবে, ও এমনটাই ভাবল।

- লেন ডানলপের ইংরেজি অনুবাদ থেকে - অনুবাদক

লেখক পরিচিতি : ১৯৬৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা। ‘স্নো কান্ট্রি’, ‘থাউজ্যান্ড ক্রেনস’, ‘দ্য সাউন্ড অফ দ্য মাউন্টেন’-এর মতো অসাধারণ সব উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত হলেও কাওয়াবাতা নিজে বলতেন তাঁর শিল্পকে সত্যিকারভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে প্রায় হাতের পাতায় এঁটে যাওয়া কিছু ছোট গল্পে।

১৯২৩ থেকে শুরু করে ১৯৭২-এর ১৬ এপ্রিল আত্মহত্যা করবার কিছু আগে পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন এমন অনেক গল্প। ‘পাম অফ দ্য হ্যান্ড স্টোরিস’ বইয়ের এই গল্পগুলো সম্বন্ধে কাওয়াবাতা বলেছেন, “অনেক লেখক কবিতা দিয়ে তাঁদের লেখক জীবন শুরু করেন। আমি নিজে কবিতার বদলে লিখে গেছি ছোটগল্প। আমার তরুণ জীবনের কবিসত্তা বেঁচে আছে এই গল্পগুলোর মধ্যেই।”

‘হাইকু’ যেমন বড় কবিতার সমস্ত সৌন্দর্য মাত্র তিন পঙ্‌ক্তির ভিতর ফুটিয়ে তোলে, ঠিক একইভাবে কাওয়াবাতার ছোট গল্পগুলোও যেন হীরার কুচির মতো। নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতা, প্রেম, এবং মানুষের জীবনের বিশাল পরিসর—সব, সব ফুটে উঠেছে এখানে।

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার এইসব গল্প স্বপ্নের মতো, কুয়াশার মতো। সময়ের মতো, মৃত্যুর মতো।...একাকীত্ব, ভালোবাসা আর অনুভূতির সূক্ষ্মতায় কবিতারই মতো।

যে হৃদয় হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিল | এডগার অ্যালান পো | অনুবাদ : মনজুর শামস

সত্যিই!—ঘাবড়ে গিয়ে—খুব, খুব ভয়ঙ্কর রকমের বিচলিত ছিলাম আমি এবং এখনো আছি; কিন্তু তাই বলে তুমি কেন বলতে যাবে যে, আমি পাগল? রোগটা আমার বুদ্ধিকে বরং আরো চোখা করেছে—ধ্বংস করেনি—এমনকি ভোঁতাও করেনি। সবকিছুর ওপরে ছিল আমার তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি। আমি স্বর্গ এবং এই দুনিয়ার সবকিছু শুনতে পেতাম। শুনতে পেতাম নরকের অনেককিছুও। তা হলে? কিভাবে আমি একজন পাগল?

এটা বলা খুব মুশকিল যে ধারণাটা প্রথমে কী করে আমার মগজে সেঁধিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু একবার এটি আমার মনের ভেতরে বাসা বাঁধার পর থেকেই দিন-রাত আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতে থাকল। উদ্দেশ্য? না, কোনো উদ্দেশ্য-ফুদ্দেশ্য ছিল না। কোনো ভাবাবেগও কাজ করেনি এর পেছনে। বরং বুড়ো লোকটিকে আমি ভালোবাসতাম। তিনি আমার ওপর কক্ষণো কোনো অন্যায় করেননি। অপমানও করেননি কখনো আমাকে। তার সোনা-দানার ওপর আমার কোনো লোভ ছিল না। আমি মনে করি এর পেছনে ছিল তার চোখ! হ্যাঁ, ঠিক তাই! তার চোখ ছিল শকুনের চোখ—ফিকে নীল চোখ, যার ওপরে একটি পর্দা পড়ে গিয়েছিল। যখনই আমার ওপর এই চোখের দৃষ্টি পড়ত, আমার রক্তে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেত; এবং এভাবে চলতে চলতে পর্যায়ক্রমে—খুব ধীরে ধীরে—আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, এই বুড়ো লোকটির প্রাণ কেড়ে নেব, এবং তা হলেই কেবল চিরদিনের জন্য আমি এই চোখের কুৎসিত দৃষ্টি থেকে রেহাই পেয়ে যাব।

গাঢ় অন্ধকারের কারণে তার কামরাটা ছিল পিচের মতো কালো, (ডাকাতের ভয়ে শাটারগুলো খুব এঁটে বন্ধ করা ছিল) আর তাই আমি জানতাম তিনি দরজাটা খোলা দেখতে পাবেন না, এবং আমি খুব ধীরস্থিরভাবে এটি ঠেলতে থাকলাম, খুব ধীরে ধীরে। আমি আমার মাথাটা ভেতরে গলিয়ে ফেলেছি, এবং হারিকেনটা সবে খুলতে যাব, ঠিক তখন হঠাৎ আমার হাতের বুড়ো আঙুল হারিকেনটাকে ঢেকে রাখা টিনের ওপর পিছলে পড়ল, এবং বুড়ো লোকটি তার বিছানায় ধড়মড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন—'কে ওখানে?

এখন এই হচ্ছে ব্যাপার। তুমি আমাকে পাগল ঠাউরাও! আরে, পাগল লোকেরা তো কিছুই জানে না! আমাকে তোমার দেখে থাকা উচিৎ। তোমার দেখে থাকা উচিৎ কী অবলীলায়, কত বুদ্ধির সাথে আমি এগিয়ে গেছি—কত সতর্কতার সঙ্গে—কত দূরদর্শিতার সঙ্গে—কতটা ভণিতার আশ্রয় নিয়ে আমি এ কাজে গিয়েছি! খুন করার আগে গোটা সপ্তাহ ধরে আমি এই বুড়ো লোকটির ওপর যতটা দয়াবান ছিলাম আগে কখনোই ততটা ছিলাম না। এবং প্রতিরাতেই, মাঝরাতের দিকে, আমি তার দরজার হুড়কো ঘুরিয়েছি এবং দরজাটি খুলে ফেলেছি—ওহ্ কত আলতো করেই না! এবং তার পর, যখন আমার মাথাটা গলানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণে এটিকে ফাঁক করতে পেরেছি, তখন ঢাকনা দিয়ে ঘিরে অন্ধকার করে রাখা একটি হারিকেন ঢুকিয়ে দিয়েছি, সবদিক বন্ধ, এমনভাবেই বন্ধ যেন কোনো আলো বাইরে বেরুতে না পারে, এবং তখনই কেবল আমি আমার মাথাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ওহ্, কতটা চতুরতার সঙ্গে আমি যে ভেতরে মাথা গলিয়েছি দেখলে তুমি হয়ত হেসেই কুটিকুটি হতে! আমি মাথাটা ধীরে ধীরে গলিয়েছি—খুব, খুব ধীরে, যাতে করে আমি আবার না বুড়ো লোকটার ঘুমে ব্যাঘাত করে ফেলি। তিনি যে তার বিছানায় শুয়ে আছেন তা দেখার জন্য ওই ফাঁকটাতে আমি আমার পুরো মাথা ঢোকাতে এক ঘন্টা সময় নিয়েছি। হাহ্, কোনো পাগল মানুষ কি এই রকম বিচক্ষণ হতে পারবে? এবং তখন, মাথাটা যখন ভেতরে ভালোমতো গলিয়ে ফেলতে পেরেছি, তখন সাবধানে—ওহ্, এতটাই সাবধানে—সতর্কভাবে (কারণ কব্জাটা ক্যাচমেচিয়ে শব্দ করে উঠতে পারে)—আমি হারিকেনকে ঢেকে রাখা ঢাকনা সামান্য ফাঁক করলাম যাতে খুব চিকন এক ফালি আলো ঐ শকুন-চোখটার ওপর পড়তে পারে। এবং দীর্ঘ সাতটি রাত ধরে আমি এমনটিই করলাম—প্রতিরাতে ঠিক মাঝরাতে—কিন্তু প্রতিবারই আমি চোখটাকে বোঁজা অবস্থায় পেয়েছি; আর তাই কাজটি সেরে ফেলা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার; কারণ বুড়ো লোকটি তো আমাকে জ্বালিয়ে মারতেন না, জ্বালিয়ে মারত তার ওই নচ্ছার চোখ। এবং প্রতিদিন সকালে, যখন দিনের আলো ফুটত, আমি খুব দাপটের সঙ্গে কামরাটিতে যেতাম এবং খুব সাহস নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতাম, সহৃদয় কোমল স্বরে তার নাম ধরে ডাকতাম, এবং জানতে চাইতাম রাতটা তিনি কেমন কাটিয়েছেন। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছো বুড়ো লোকটা নির্ঘাত খুব পাকা বুদ্ধির, অর্থাৎ গভীর জলের মাছ ছিলেন; অবশ্যই, যেহেতু প্রতিটি রাতে ঠিক বারোটায় তিনি যখন ঘুমিয়ে থাকতেন আমি ভেতরে গিয়ে তার দিকে তাকাতাম বলে তার সন্দেহ হয়েছিল।

অষ্টম দিনে এসে দরজা খোলার ক্ষেত্রে আমি রোজ যেমনটি করি তার চেয়ে আরো বেশি সতর্ক ছিলাম। আমার সরা-নড়া এতটাই ধীর গতির ছিল যে ঘড়ির মিনিটের কাঁটার গতিও ছিল তার চেয়ে দ্রুত। আমার ক্ষমতার দৌড় যে কতটা—আমি যে কতখানি সূক্ষ্মদর্শী তা সেই রাতের আগে কখনোই আমি বুঝতে পারিনি। কালেভদ্রেই কেবল আমি আমার বিজয়ানন্দকে সংযত করে রাখতে পারতাম। ভেবেছিলাম আমি যে সেখানে আছি, একটু একটু করে যেভাবে দরজা খুলছি তাতে এমনকি তিনি আমার গোপন ইচ্ছে এবং ভাবনাচিন্তা কী তা স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। আমি আমার সেই ধারণার ওপর বেশ ভালোভাবেই আচ্ছন্ন থেকে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকলাম; এবং সম্ভবত তিনি আমার সেই হাসি শুনতে পেয়েছিলেন; কারণ হঠাৎ করেই তিনি বিছানার ওপর নড়াচড়া করে উঠলেন, যেন ভয়ে চমকে উঠেছেন! এখন তুমি হয়ত ভাবতে পারো আমি পিছু হটে এসেছিলাম—কিন্তু না। গাঢ় অন্ধকারের কারণে তার কামরাটা ছিল পিচের মতো কালো, (ডাকাতের ভয়ে শাটারগুলো খুব এঁটে বন্ধ করা ছিল) আর তাই আমি জানতাম তিনি দরজাটা খোলা দেখতে পাবেন না, এবং আমি খুব ধীরস্থিরভাবে এটি ঠেলতে থাকলাম, খুব ধীরে ধীরে।

আমি আমার মাথাটা ভেতরে গলিয়ে ফেলেছি, এবং হারিকেনটা সবে খুলতে যাব, ঠিক তখন হঠাৎ আমার হাতের বুড়ো আঙুল হারিকেনটাকে ঢেকে রাখা টিনের ওপর পিছলে পড়ল, এবং বুড়ো লোকটি তার বিছানায় ধড়মড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন—'কে ওখানে?'

আমি একদম স্থির হয়ে থাকলাম এবং কোনো কথা বললাম না। পুরো একটি ঘণ্টা ধরে আমি আমার কোনো পেশিই নড়তে দিলাম না, এবং এই সময়ের ভেতর আমি তার শুয়ে পড়ার শব্দও শুনতে পেলাম না। তিনি তখনও বিছানায় বসে কিছু শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছেন—ঠিক যেমনটি আমি করে করে আসছি, রাতের পর রাত, দেয়ালে কোনো কাচপোকার শব্দও যাতে শুনতে পারি সেজন্য কান পেতে থেকেছি।

খুব শিগগিরই আমি হালকা এক গোঙানির শব্দ শুনতে পেলাম, এবং আমি জানতাম এটি হচ্ছে মৃত্যু-আতঙ্কের গোঙানি। এটা কোনো ব্যথা বা কোনো শোকের গভীর থেকে উঠে আসা গোঙানি নয়—ওহ্, না, কিছুতেই তা নয়! এটা হচ্ছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ার শব্দ, যা কোনো আত্মার একদম তলা থেকে উঠে আসে, যখন সে আত্মা চরম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমি এই শব্দটাকে খুব ভালো করেই চিনি। অনেক রাতেই, ঠিক মাঝরাতে, যখন সারাটা দুনিয়া ঘুমিয়ে থাকে, এটি আমার নিজের বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে, গভীর হয়; এর ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি যে ত্রাস সৃষ্টি করে তা আমাকে হতবিহ্বল করে তোলে। হ্যাঁ, আমি জোর দিয়ে বলছি আমি এটিকে বেশ ভালো করেই জানি। আমি জানতাম বুড়ো লোকটার অনুভূতি কেমন ছিল, এবং তার ওপর এজন্য আমার খুব মায়া হলো, যদিও আমি মনে

মনে মুখ টিপে হাসলাম। আমি জানি সেই প্রথম হালকা শব্দের পর থেকেই তিনি বিছানায় জেগে শুয়ে আছেন, যখন তিনি বিছানায় নড়ে উঠেছিলেন ঠিক তখন থেকেই। তখন থেকেই তার ভয়টা মনের ভেতরে বেড়ে উঠছে। তিনি সেগুলোকে অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। নিজের মনে তিনি বলছিলেন, 'এটা চিমনির ভেতরে বাতাস খেলে যাওয়ার শব্দ ছাড়া কিছুই নয়—বা শুধু একটি ইঁদুর দৌড়ে মেঝে পার হলো—এই যা,' অথবা 'এটি নিছকই একটি ঝিঁঝিঁ পোকা, একবার কিচকিচ করেই থেমে গেছে।' হ্যাঁ, তিনি এইসব ভেবে নিয়েই নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করছেন : কিন্তু এই সবকিছুই তার কাছে নিজেকে প্রবোধ দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস বলে মনে হলো আমার কাছে। সবকিছুই বৃথা গেল; কারণ মৃত্যু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে তার কালো ছায়ার সাথে মিলেছে, এবং সে তার শিকারকে ঘিরে ধরেছে। আর এটা হচ্ছে সেই অবোধ্য ছায়ারই শোকাতুর প্রভাব, যা তাকে অনুভব করতে বাধ্য করছে তার কামরার ভেতরে আমার মাথার উপস্থিতি—যদিও সে তা দেখেওনি, শোনেওনি।

খুব ধৈর্যের সঙ্গে অনেক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেও যখন তার শুয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম না, তখন আমি হারিকেনকে ঢেকে অন্ধকার করে রাখা ঢাকনাটা একটু ফাঁক করার সিদ্ধান্ত নিলাম—খুব সামান্য—খুবই সামান্য এক চিলতে ফাঁক করব বলে ঠিক করলাম। সুতরাং আমি এটি একটু ফাঁক করলাম—তুমি ভাবতেও পারবে না কতটা ধীরে ধীরে—যতক্ষণ না মাকড়সার জালের সুতোর মতো স্রেফ একটি ক্ষীণ রশ্মি হারিকেনের সেই ফাটল গলে পুরোপুরিভাবে শকুন চোখটার ওপরে গিয়ে পড়ল।

চোখটি ছিল খোলা—পুরোপুরি, হাঁ করে খোলা—এবং সেদিকে নজর যেতেই আমি হিংস্র হয়ে উঠলাম। যথার্থ স্পষ্টভাবেই আমি এটিকে দেখলাম—পুরোপুরি নিষ্প্রভ নীল, এর ওপরে যে বীভৎস পর্দাটা ছিল তা হাড়ের মজ্জাকেও শীতল করে দেয়; কিন্তু আমি বুড়ো লোকটির মুখ বা দেহের অন্য কোনো অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম না : যেহেতু আমি ইচ্ছে করেই আলোকরশ্মিটা শুধু তার ওই নচ্ছার চোখের ওপরেই ফেলেছিলাম।

আর আমি কি তোমাকে বলিনি যে, আমার চোখা-অনুভূতিকে, অতিসূক্ষ্মদর্শিতাকে পাগলামি ভেবে তুমি কী ভুল করছো?—এখন শোনো তা হলে আমি কী বলি—আমার কানে খুব নিচু, ক্ষীণ, দ্রুত শব্দ ভেসে এলো, অনেকটা কোনো ঘড়িকে তুলো দিয়ে ঢেকে রাখলে যেমন শব্দ হয়। আমি এই শব্দটাকেও খুব ভালো করেই জানতাম। এটি ছিল বুড়ো লোকটির হৃদস্পন্দনের শব্দ। এই শব্দ আমার ক্রোধ আরো বাড়িয়ে দিল, ঠিক যেমনটি রণ-দামামা সৈন্যদের উত্তেজিত করে তোলে।

কিন্তু এমনকি তখনও আমি নিজেকে সংযত করে রাখলাম এবং স্থির হয়ে থাকলাম। হারিকেনটাকে স্থির করে ধরে রাখলাম। চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম চোখটার ওপর আলোকরশ্মি কত স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারি। এর ভেতরে বুড়ো লোকটির হৃৎপিণ্ডের নারকীয় ধপধপ শব্দ আরো বেড়ে গেল। প্রতিটি মুহূর্তেই দ্রুত থেকে তা আরো দ্রুত, আরো জোরালো হয়ে উঠছিল। বুড়ো লোকটির আতঙ্ক এরই ভেতরে নিশ্চয়ই চরমে উঠে গিয়েছিল! আমি তো বলেছিই, এই শব্দ আরো জোরালো হচ্ছিল, প্রতিমুহূর্তেই ক্রমাগতভাবে তা আরো বেড়ে যাচ্ছিল! তুমি কি আমি যা বলেছিলাম তা খুব ভালো করে খেয়ালে রেখেছো যে আমি ছিলাম খুবই বিচলিত? হ্যাঁ, সত্যিই আমি খুব বিচলিত ছিলাম। এবং এখন এই গভীর রাতে, পুরনো বাড়িটার ভয়ানক নীরবতার মাঝে এই অদ্ভুত শব্দ আমার উত্তেজনাকে বাড়িয়ে আমাকে অসহনীয় আতঙ্কের ভেতরে ফেলে দিল। তার পরেও, আরো কয়েক মিনিট আমি সংযত এবং স্থির থাকলাম, কিন্তু এই হৃদস্পন্দনের শব্দ আরো বাড়তেই থাকল! আমার তখন মনে হচ্ছিল এটি নির্ঘাত ফেটেই যাবে। আর এখন এক নতুন দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল—এই শব্দ হয়ত প্রতিবেশীরা শুনে ফেলবে! বুড়ো লোকটির সময় এসে গেছে! আমি এক তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে হারিকেনটাকে খুলে ফেললাম এবং কামরার ভেতরে ঢুকলাম। তিনি একবার কেঁপে উঠলেন—একবারই মাত্র। নিমেষেই আমি তাকে মেঝেতে টেনে নামালাম, এবং ভারী বিছানাটা তার ওপরে এনে ফেলে তাকে চাপা দিলাম। কাজটি করা হয়ে গেছে বুঝতে পেরে আমি মহা উল্লাসে হেসে উঠলাম। কিন্তু বেশ কয়েক মিনিট ধরে চাপা শব্দে হৃদস্পন্দন চলছিলই। সে যাই হোক, তাতে আমি বিরক্ত হলাম না; দেয়ালের ওপাশ থেকে এ শব্দ শোনা যাবে না। এক সময় তা থেমে গেল। বুড়ো লোকটা মারা গেলেন। আমি তার ওপর থেকে বিছানাটা সরালাম এবং লাশটা পরীক্ষা করলাম। হ্যাঁ, তিনি শক্ত পাথর হয়ে গেছেন, মরা পাথর। আমি তার বুকে হৃৎপিণ্ডের ওপর আমার হাত রাখলাম এবং বেশ কয়েক মিনিট ধরে হাতটি সেখানে ধরে থাকলাম। কোনো ধুকধুকানি নেই। তিনি মরে পাথর হয়ে গেছেন। তার চোখ আর আমাকে কোনো সমস্যায় ফেলতে পারবে না।

তুমি এখনো যদি আমাকে পাগল ঠাউরে থাকো, তবে আমি দেহটিকে লুকিয়ে রাখতে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম তা যখন বর্ণনা করব তখন আর তেমনটি ভাবতে পারবে না। রাত ফুরিয়ে আসছিল, এবং আমি খুব তাড়াহুড়া করে কাজ করতে থাকলাম, কিন্তু নীরবে। প্রথমেই আমি লাশটাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম। মাথাটা কেটে আলাদা করলাম, হাত কাটলাম এবং পা দুটোও।

এরপর আমি কাঠের মেঝে থেকে তিনটি তক্তা খুলে ফেললাম এবং সেই ফাঁকের ভেতর লাশের সব টুকরো ভরে দিলাম। এরপর আমি এতটাই চতুরতার সঙ্গে, এতটাই ধূর্ততার সঙ্গে তক্তাগুলো সেখানে আবার রাখলাম যাতে কোনো মানুষের চোখ—এমনকি তার চোখও কোনো খুঁত ধরতে না পারে। কিছুই ধুয়ে পরিষ্কার করার দরকার ছিল না—কোনো ধরনের দাগ বা সেই ধরনের কিছু—রক্তের

কোনো চিহ্নই ছিল না, যেজন্য আমি মহা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। একটি বালতিতেই সবকিছু ধরে গিয়েছিল—হা! হা! হা!

পরিশ্রমের এই কাজটুকু শেষ করতে করতে ভোর চারটা বেজে গেল—তখনও মাঝরাতের মতো অন্ধকার। যখন চারটা বাজার ঘন্টা বেজে উঠল, রাস্তার দিককার দরজায় হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ হলো। খুব ফুরফুরে মেজাজে দরজা খোলার জন্য আমি নিচে নেমে গেলাম—এখন আর কী ভয় আমার? তিনজন লোক ঢুকল, যারা যথাযথ মোলায়েম কণ্ঠে নিজেদের পুলিশ অফিসার হিসেবে বর্ণনা দিলেন। রাতে একজন প্রতিবেশী তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনেছে; সন্দেহ উঠেছে কোনো অঘটন ঘটার; পুলিশ অফিসে তথ্যটি জানানো হয়েছে, এবং তারা (অফিসারেরা) এই বাড়ি এবং আশপাশ তল্লাশির জন্য এসেছেন।

আমি হাসলাম,—কারণ আমার ভয় পাওয়ার কী আছে? আমি ভদ্রলোকদের স্বাগত জানালাম। তাদের বললাম, আমিই আমার স্বপ্নের ভেতরে ওভাবে চিৎকার করে উঠেছিলাম। বুড়ো লোকটির ব্যাপারে বললাম, তিনি দেশে অনুপস্থিত। আমি আমার এই অতিথিদের বাড়ির সব জায়গায় নিয়ে গেলাম। তাদের বললাম, খুঁজুন, ভালো করে তল্লাশি করুন। একেবারে শেষে তাদের আমি বুড়ো লোকটির কামরায় নিয়ে গেলাম। তাদের দেখালাম তার সব সম্পদ সহি-হেফাজতেই আছে, সেখানে কেউ হাত দেয়নি। আত্মবিশ্বাসের আতিশয্যে আমি কামরার ভেতর চেয়ার নিয়ে এলাম এবং এখানেই বসে তাদের ক্লান্তি দূর করতে অনুরোধ করলাম, আর আমি বিজয়ের বুনো আনন্দে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে আমার নিজের চেয়ারটা বসালাম সেইখানটায়, যেখানটার ঠিক নিচে বুড়ো লোকটার লাশ লুকিয়ে রেখেছি।

উৎফুল্লের সঙ্গে আমি তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকলাম, তারা খুব জানাশোনো সাধারণ ব্যাপার নিয়ে খোশগল্প করতে থাকলেন। কিন্তু খানিক পরেই আমি আমার নিজের ভেতরে অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করলাম এবং কামনা করতে থাকলাম তারা এবার ঝটপট বিদায় নিক। আমার মাথাব্যথা শুরু হলো, এবং আমার কানের ভেতরে ভোঁ ভোঁ করতে থাকল : কিন্তু তবুও তারা বসে রইল এবং তখনও খোশগল্প করতে লাগল। কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ শব্দ আরো স্পষ্ট হলো : এটি চলতেই থাকল এবং তা আরো বেশি স্পষ্ট হলো : এই অস্বস্তি থেকে রেহাই পেতে আমি আরো খোলামেলাভাবে কথা বলতে শুরু করলাম : কিন্তু এই ভোঁ ভোঁ গুনগুন শব্দ চলতেই থাকল এবং তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল ততক্ষণ, যতক্ষণ না আমি বুঝতে পারলাম যে শব্দটা আসলে আমার কানের ভেতরে হচ্ছে না।

কোনো সন্দেহ নেই যে আমি ভয়ে খুব ফ্যাকাশে হয়ে উঠলাম;—কিন্তু আমি আরো তড়বড়িয়ে এবং চড়া গলায় কথা বলতে লাগলাম। তারপরেও শব্দটা বেড়ে যেতে থাকল—আর আমি তখন কী-ই বা

করতে পারতাম? এটি ছিল খুব নিচু, অস্পষ্ট, দ্রুত শব্দ—কোনো ঘড়িকে তুলো দিয়ে চেপে ঢেকে রাখলে ঠিক যেমন শব্দ হয়। আমি দম নিতে হাঁসফাঁস করতে থাকলাম—কিন্তু তবুও তারা তা শুনতে পেলেন না। আমি আরো দ্রুত, আরো আবেগতাড়িত হয়ে কথা বলতে থাকলাম; কিন্তু ধীরে ধীরে শব্দটা কেবল বাড়তেই থাকল। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং খুব জোরের সাথে মাথা নাড়িয়ে চড়া গলায় দাবি করতে থাকলাম যে এগুলো সব ফালতু ব্যাপার; কিন্তু শব্দটা ধীরে ধীরে আরো বাড়তে থাকল। তারা যাচ্ছে না কেন? আমি ভারী ভারী পা ফেলে মেঝের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করতে থাকলাম, যেন এই লোকেদের পর্যবেক্ষণে আমি ভীষণ উত্তেজনায় খুব রেগে গেছি—কিন্তু শব্দটা ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকল। হায় ঈশ্বর! আমি তখন আর কী করতে পারতাম? কথার তুবড়ি ছুটিয়ে আমি মুখে ফেনা তুলে ফেললাম—বুনো ক্ষ্যাপাটে হয়ে গেলাম—জোর দিয়ে নিশ্চয়তা দিতে থাকলাম আমার কথার! যে চেয়ারটিতে বসেছিলাম সেটি খুব করে দোলাতে থাকলাম এবং এটিকে চুলোর ঝাঁঝরির মতো চেপে ধরলাম তক্তাগুলোর ওপর, কিন্তু এই সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠে আসতে থাকল শব্দটি এবং ক্রমাগতভাবে তা বাড়তেই থাকল। এটির জোর কেবল বাড়তেই থাকল—জোরে—আরো জোরে হতে থাকল শব্দ! আর এই লোকেরা আনন্দের সঙ্গে খোশগল্প করতে থাকলেন, এবং হাসতে থাকলেন। এটি কি সম্ভব যে তারা কিছু শোনেনি? ঈশ্বরই ভালো জানেন!—না, না! তারা শুনেছে!—তারা সন্দেহ করেছে!—তারা জানত!—তারা আমার আতঙ্ক নিয়ে মশকরা করছিল!—আমি এমনটি ভাবছিলাম, এবং আমি এমনটিই মনে করি। কিন্তু এই নির্মম যন্ত্রণার চেয়ে অন্য যে কোনোকিছুই ভালো! এই উপহাসের চেয়ে অন্য যে কোনোকিছুই বরং সহনীয়! আমি এই কপট হাসি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম যে আমাকে অবশ্যই চিৎকার করে উঠতে হবে, নইলে মরতে হবে! এবং এখন—আবারো!—মন দিয়ে শোনো! আরো জোরে! আরো জোরে! আরো জোরে! আরো জোরে!

'নচ্ছারেরা!' আমি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলাম, 'আর লুকোচুরি করতে হবে না! আমি আমার কৃৎকর্ম স্বীকার করে নিচ্ছি!—খুলে ফেল তক্তাগুলো! এখানে! এখানে!—এটি হচ্ছে তার ভয়ঙ্কর কুৎসিত হৃদয়ের স্পন্দন!'

[এডগার অ্যালান পো গল্পটি ১৮৪৩ সালে লিখেছিলেন]

বিশ্বের সুদর্শনতম ডুবে মরা পুরুষ | গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ | অনুবাদ: মনজুর শামস

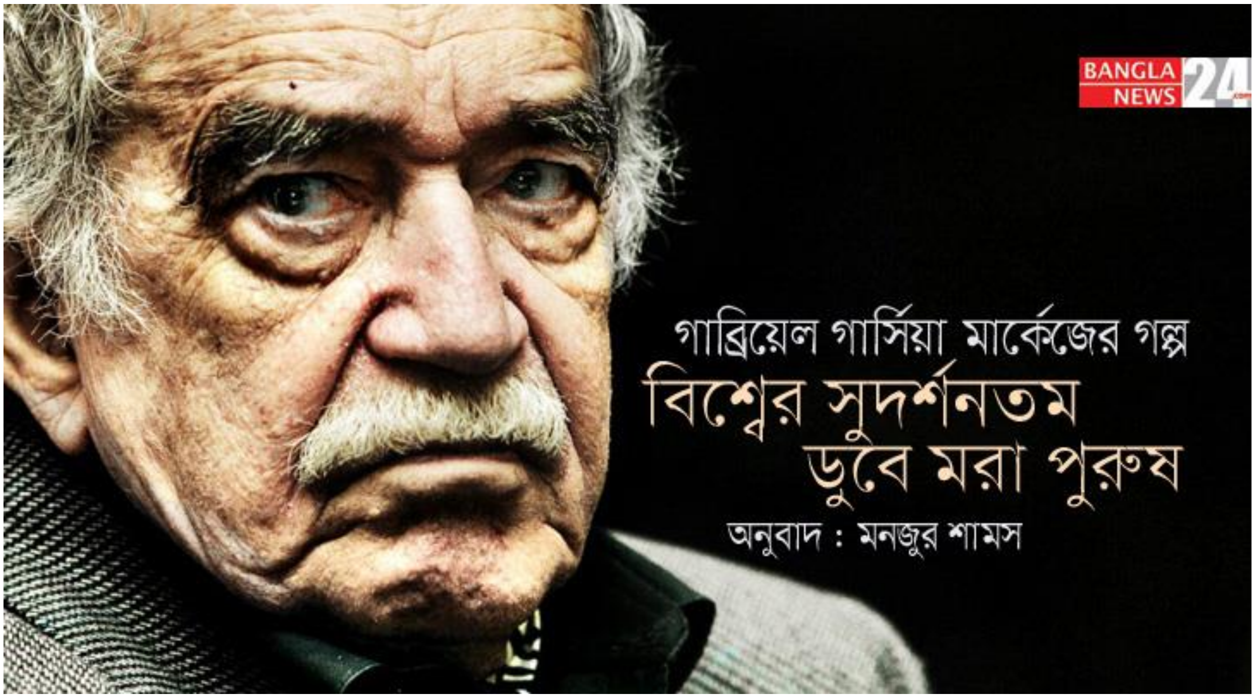

সাগরের জল ভেঙে ভেঙে চুপিচুপি এগিয়ে আসতে থাকা কালো এবং ফুলে ওঠা বেশ বড়সড় বস্তুটাকে প্রথম যে ছেলেপেলের দল দেখতে পেল তারা নিজেদের এই ভাবনাতেই মেতে থাকতে দিল যে এটি একটি শত্রু-জাহাজ। এরপর তারা দেখল, এর কোনো পতাকা বা মাস্তুল নেই এবং তারা তখন ভেবেই নিল এটি নির্ঘাত একটি তিমি। কিন্তু যখন এটি তীরে এসে ঠেকল, তারা ছুটে গিয়ে সাগরতলের আগাছার দঙ্গল, জেলিফিশের শুঁয়ো, মাছের উচ্ছিষ্ট এবং ডুবে যাওয়া জাহাজের এটা-সেটা সরাল, তখনই কেবল তারা দেখতে পেল যে এটি আসলে একজন ডুবে মরা মানুষ।

সারাটা বিকেল তারা তাকে নিয়ে খেলল, তাকে বালুতে কবর দিল এবং আবার তাকে সেখান থেকে খুঁড়ে তুলল। এরপর বড়দের একজন তাদের এমন কাণ্ডকারখানা দেখে ফেলল, আর তক্ষুণি সে গ্রামে বিপদের খবরটা চাউর করে দিল। যে লোকেরা তাকে গ্রামের সবচেয়ে কাছের বাড়িটিতে বয়ে নিয়ে এলো, তারা বেশ বুঝতে পারল যে তাদের এ পর্যন্ত জানা যে কোনো মরা মানুষের চেয়ে এই লোকটির ওজন অনেক বেশি, প্রায় একটা ঘোড়ার মতোই হবে ওজন এবং তারা একে অন্যকে বলাবলি করতে থাকল যে লোকটি হয়ত অনেক বেশি সময় ধরে পানিতে ভেসে ছিল এবং এজন্য তার হাড্ডিতে পর্যন্ত পানি ঢুকে গেছে। তাকে বয়ে এনে মেঝেতে শোয়ানোর পর তারা বলল, সে অন্য সকল মানুষের চেয়ে লম্বা, কারণ বাড়িটিতে কোনোমতে তার জায়গা হয়েছে, কিন্তু তারা এও ভাবল—মরে যাওয়ার পরেও বেড়ে ওঠার ক্ষমতা থাকা বোধ করি কোনো কোনো ডুবে মরা মানুষের স্বভাবেরই অংশ! তার সারা দেহে সমুদ্রের জলো গন্ধ এবং তার আকৃতি দেখেই কেউ কেবল ধরে নিতে পারে এটি আসলে একজন মানুষের লাশ, যেহেতু তার গায়ের চামড়া কাদা ও মাছের আঁশের আস্তরণে আবৃত ছিল।

তারা সংগোপনে যার যার পুরুষকে তার সঙ্গে তুলনা করতে থাকল, ধরেই নিল যে এই লোকটি এক রাতে যা করত তা তারা তাদের সারা জীবনেও করতে অক্ষম এবং তারা তাদের হৃদয়ের গভীরে তাদের পুরুষদের শেষমেশ এই ভেবে বাতিল করে দিল যে তারা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে অধম এবং দুনিয়ার সবচেয়ে অকম্মা। তারা যখন চরম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে এইসব আজগুবি ভাবনায় বিভোর ছিল তখন তাদের ভেতরে সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা, যিনি সবচেয়ে বেশি বয়সের বলেই অন্যদের চেয়ে বেশি সহানুভূতির সঙ্গে ডুবে মরা লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং তার সেই দরদভরা দৃষ্টিতে ভাবাবেগের চেয়ে সহানুভূতিই বেশি ছিল—একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বলে উঠলেন, 'তার মুখখানা এস্তেবান নামের একজনের মতো

মরা মানুষটি যে আগন্তুক তা জানার জন্য তারা এমনকি তার মুখটা পর্যন্ত ধুয়ে পরিষ্কার করল না। গ্রামটিতে রয়েছে মাত্র বিশের চেয়ে কয়েকটি বেশি কাঠের বাড়ি, যে বাড়িগুলোতে রয়েছে ফুলহীন পাথুরে শুকনো উঠোন এবং মরুভূমির মতো গুহার শেষমাথা পর্যন্ত এই উঠোনগুলো বিস্তৃত। ডাঙার পরিমাণ এতই কম যে মায়েরা সব সময়ই খুব ভয়ে ভয়ে কাটায় এই বুঝি তাদের শিশুদের বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং এই কয়েক বছরে তাদের অল্প যে কয়েকজন মারা গেছে তাদের পাহাড় থেকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়েছে। কিন্তু এদিন সমুদ্রটা ছিল শান্ত ও অবারিত এবং সাতটি নৌকাতেই তাদের সব পুরুষের জায়গা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তারা যখন ডুবে মরা লোকটিকে খুঁজে পেল তখন তারা সবাই সেখানে উপস্থিত আছে কিনা বোঝার জন্য স্রেফ একে অন্যের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখাটাই ছিল যথেষ্ট।

সেদিন রাতে তারা আর সমুদ্রে কাজে গেল না। প্রতিবেশী গ্রামগুলো থেকে কেউ হারিয়ে গেছে কিনা খুঁজে দেখার জন্য পুরুষেরা যখন বেরিয়ে গেল, মহিলারা তখন রয়ে গেল ডুবে মরা লোকটিকে সেবা-যত্ন করার জন্য। ঘাসের ন্যাতা দিয়ে ঘষে ঘষে তারা তার দেহ থেকে মাটি পরিষ্কার করল, তার চুলে এবং দেহের নানা জায়গায় আটকে থাকা সাগরতলের নুড়ি-পাথরগুলো ছাড়িয়ে দিল এবং মাছের আঁশ ছাড়ানোর সরঞ্জাম দিয়ে তারা ঘষে ঘষে তার দেহের ময়লার কঠিন আস্তরণ তুলে ফেলল। এসব করতে গিয়ে তারা খেয়াল করে দেখল তার দেহের ওপরে থাকা লতা-পাতা এসেছে দূরবর্তী মহাসাগর থেকে এবং এগুলো খুব গভীর জলের আর তার পরনের কাপড়-চোপড় এমনভাবে ছিঁড়ে ফালিফালি হয়ে গেছে, যেন সে কোরালের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে তার দেহতরী নিয়ে পাল খাটিয়ে এসেছে! তারা আরো খেয়াল করে দেখল, সে খুব গর্বের সঙ্গে তার মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে, কারণ ডুবে মরা অন্য লোকদের মতো তাকে দেখতে মোটেও বিষণ্ণ লাগছিল না। জলে ডুবে বা ওই ধরনের কোনো বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে মরে যাওয়ার পর যাদের লাশ সাগরে ভাসতে ভাসতে আসে, বা যারা নদীতে ডুবে মারা যায় তাদের দেখতে যেমন নিঃস্ব লাগে তাকে তেমনটি লাগছিল না। কিন্তু তাকে সাফ-সুতরো করার পরেই কেবল সে কেমন মানুষ তা তারা বুঝে উঠতে পারল এবং তাতে তাদের তো চরম বিস্ময়ে একবারে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়! তারা এ পর্যন্ত যত মানুষ দেখেছে তাদের ভেতর

সে যে কেবল সবচেয়ে লম্বা, সুপুরুষ এবং সবচেয়ে সুগঠিত পুরুষ ছিল তা-ই নয়, বরং যখন তারা তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল তাদের তখন এমনকি কল্পনাতেও কুলাচ্ছিল না তার মহিমা।

সারাটা গ্রাম খুঁজেও তারা তাকে শোয়ানোর মতো অত বড় কোনো বিছানা পেল না, রীতি অনুযায়ী শেষকৃত্যের আগে গ্রামের লোকেরা মৃতের চারপাশে জড়ো হয়ে যে শোক প্রকাশ করবে তার জন্য উপযুক্ত কোনো টেবিলও পেল না। গ্রামের সবচেয়ে লম্বা লোকটির ছুটির দিনে কল্কি ডুবিয়ে ভুঁড়িভোজের জন্য তৈরি করা ঢিলেঢালা প্যান্ট তার অনেক খাটো হবে, সবচেয়ে মোটা লোকটির সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরার জন্য তৈরি ঢোলা শার্টও তার গায়ে অনেক ছোট হবে, আর গ্রামের সবচেয়ে বড় পা যার, তার জুতোও তার পায়ে ঢোকানো যাবে না। তার বিশাল আকার আর সুন্দর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে গ্রামের মহিলারা ঠিক করল নৌকার পাল কেটে তার জন্য প্যান্ট তৈরি করবে এবং বিয়ের কনের ব্রাবান্ট লিনেন পোশাক কেটে শার্ট তৈরি করে দেবে—যাতে মৃত্যুতেও তার আত্মসম্মান অটুট থাকে। তারা যখন গোল হয়ে বসে সেলাই করছিল এবং সেলাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে মৃতদেহটির দিকে তাকাচ্ছিল তখন তাদের মনে হচ্ছিল যে এর আগে কখনো একই গতিতে এমনভাবে বাতাস বয়নি, সেই রাতের মতো সমুদ্রও কখনো এমন অস্থির হয়ে ওঠেনি এবং তারা ধরেই নিল—এই পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে এই মৃত লোকটির সম্পর্ক রয়েছে। তারা ভেবে নিল যে এই সুদর্শন লোকটি যদি তাদের গ্রামে বাস করত তবে অবশ্যই তার বাড়ির দরজাগুলো হতো সবচেয়ে চওড়া, ঘরের ছাদ হতো সবচেয়ে উঁচু, এবং তার ঘরের মেঝে হতো সবচেয়ে মজবুত, তার খাট তৈরি করতে হতো জাহাজের মাঝ-কাঠামোকে লোহার বল্টু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে এবং তার স্ত্রী হতো সবচেয়ে সুখী মহিলা। তারা কল্পনা করে নিল, তার নিশ্চয়ই এমন ক্ষমতা ছিল যে—সে স্রেফ নাম ধরে ডেকে সমুদ্র থেকে মাছকে তুলে আনতে পারত এবং সে তার জমিতে এতই কাজ করত যে পাথর ফেটে ঝরনা বয়ে যেত—যাতে সে সাগরের পাথুরে ঢালে ফুলের গাছ লাগাতে পারে। তারা সংগোপনে যার যার পুরুষকে তার সঙ্গে তুলনা করতে থাকল, ধরেই নিল যে এই লোকটি এক রাতে যা করত তা তারা তাদের সারা জীবনেও করতে অক্ষম এবং তারা তাদের হৃদয়ের গভীরে তাদের পুরুষদের শেষমেশ এই ভেবে বাতিল করে দিল যে তারা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে অধম এবং দুনিয়ার সবচেয়ে অকম্মা। তারা যখন চরম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে এইসব আজগুবি ভাবনায় বিভোর ছিল তখন তাদের ভেতরে সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা, যিনি সবচেয়ে বেশি বয়সের বলেই অন্যদের চেয়ে বেশি সহানুভূতির সঙ্গে ডুবে মরা লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং তার সেই দরদভরা দৃষ্টিতে ভাবাবেগের চেয়ে সহানুভূতিই বেশি ছিল—একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বলে উঠলেন, 'তার মুখখানা এস্তেবান নামের একজনের মতো'।

সত্যিই তাই। তার যে আর কোনো নাম থাকতে পারে না তা নিশ্চিত হতে তাদের বেশির ভাগেরই তার দিকে কেবল আরেকবার তাকানোই যথেষ্ট ছিল। তাদের ভেতর সবচেয়ে একগুঁয়ে ছিল সবচেয়ে কম বয়সের মেয়েটি, সে আরো কয়েক ঘণ্টা নিজের ভাবনার ঘোরের ভেতরই রইল। তারা যখন

তাকে তার জামা-কাপড় পরিয়ে এবং বিশেষভাবে তৈরি চামড়ার জুতো পরিয়ে ফুলের মাঝে শুইয়ে দিল, তখন তার মনে হলো লোকটির নাম হয়ত লতারো। কিন্তু এটি ছিল এক নিষ্ফল বিভ্রম। পালের কাপড়, অর্থাৎ ক্যানভাসের পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না, যেনতেন করে কাটা আর বাজেভাবে সেলাই করা তার জন্য তৈরি করা প্যান্টটা খুবই আঁটসাঁট হয়ে গেল এবং তার হৃৎপিণ্ডের লুকানো শক্তিতে পটপট করে তার শার্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল। মাঝরাতের পর সমুদ্রের শোঁ শোঁ গর্জন আর থাকল না এবং সমুদ্র তার নেতিয়ে পড়া শ্রান্ত-অবসন্ন দশায় ফিরে এলো। সে যে এস্তেবানই ছিল সে ব্যাপারে সর্বশেষ সংশয়ীও এক সময় একেবারে চুপ মেরে গেল। যে মহিলারা তাকে পোশাক পরিয়েছিল, চুল আঁচড়ে দিয়েছিল, তার নখ কেটে দিয়েছিল এবং কামিয়ে দিয়েছিল—তাকে মাটির ওপর দিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল এবং তারা তাদের মমতার গভীর থেকে উঠে কাঁপুনি কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। আর তখনই কেবল তারা বুঝে উঠতে পেরেছিল যে এই বিশাল বপু নিয়ে সে নিশ্চয়ই খুব অসুখী ছিল—যেহেতু এমনকি মৃত্যুর পরেও তার বিরাট দেহ তাকে ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। তারা তাকে তার জীবনে দেখতে পাচ্ছিল—দেখতে পাচ্ছিল দরজার ভেতর দিয়ে পাশ ঘেঁষে যেতে হচ্ছে বলে সে খুঁত ধরে মুখে নিন্দার খই ফোটাচ্ছে, কড়িকাঠে মাথায় ঠোকা খাচ্ছে, কোথাও বেড়াতে গেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে তার সিন্ধুঘোটক মার্কা নরম গোলাপি মোটা দুটি হাত দিয়ে কী করবে—যে বাড়িতে বেড়াতে গেছে সেই বাড়ির বাড়িওয়ালি যখন তাকে বসতে দেয়ার জন্য সবচেয়ে মজবুত চেয়ারটা খুঁজছে এবং ভীষণ ভয়ে ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলছে—এস্তেবান, দয়া করে এখানে বসো এবং সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলছে—না ম্যাডাম, অত ব্যস্ত হবেন না, আমি যেখানে আছি ভালোই আছি, তার গোড়ালিতে ছিলে যাওয়া যন্ত্রণা এবং সে যেখানেই বেড়াতে যাক না কেন—স্রেফ বসে পড়ে চেয়ার ভাঙার লজ্জা এড়াতে তাকে সেই একই কথা বলে যেতে হয়—ব্যস্ত হবেন না ম্যাডাম, আমি যেখানে আছি ভালোই আছি এবং হয়ত কখনো সে জানতেই পারে না যে, যারা তাকে বলে, 'যেও না এস্তেবিয়ান, কমপক্ষে কফি তৈরি করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো'—তারা পরে ফিসফিসিয়ে বলে, 'যাক, হাবড়া গবেটটা শেষমেশ ভেগেছে তা হলে! কী চমৎকার, সুদর্শন বুদ্ধুটা চলে গেছে!'

ভোরের আলো ফোটার একটু আগ পর্যন্ত মহিলারা মরদেহটার পাশে এই ধরনের সব ভাবনাতেই মগ্ন ছিল। তাকে যাতে রোদের বিরক্তি সইতে না হয় সেজন্য পরে যখন তারা একটি রুমাল দিয়ে তার মুখটি ঢেকে দিয়েছিল তখন তাকে দেখে এতটাই চিরমৃত মনে হচ্ছিল, এতটাই অরক্ষিত মনে হচ্ছিল, এতটাই তাদের পুরুষদের মতো লাগছিল যে কান্নার প্রথম দমকটা উথলে উঠল তাদের হৃদয়ের গভীর থেকেই। কান্নাটা শুরু করল কম বয়সী মহিলাদের একজন। অন্য মহিলারাও দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে এক সময় বিলাপ জুড়ে দিল এবং যতই তারা ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল ততই তাদের আরো বেশি বেশি কান্না পেতে লাগল, কারণ ডুবে মরা লোকটি এরই মধ্যে তাদের কাছে এস্তেবানের চাইতেও বেশি কিছু হয়ে উঠেছিল, আর সেজন্যই তারা এত বেশি কান্নাকাটি করছিল—যেহেতু সে ছিল আরো বেশি দুর্গত,

সবচেয়ে শান্ত, এবং পৃথিবীর সবচেয়ে পরোপকারী, হতভাগা এস্তেবান! সুতরাং পুরুষরা যখন এই খবর নিয়ে এলো যে ডুবে মরা লোকটি আশপাশের কোনো গ্রামেরই নয়, তখন মহিলারা তাদের কান্নার ভেতরেও কিছুটা যেন বিজয়ানন্দ অনুভব করল।

'সকল প্রশংসা ঈশ্বরের', তারা হাঁপ ছেড়ে বলে উঠল, 'সে আমাদের!'

পুরুষেরা ভাবল এই বাড়াবাড়ি নারীসুলভ লঘুচিত্ততা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই লোকটা আশপাশের গ্রামের কেউ কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে রাতেরবেলায় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে বলে তারা সবাই ভীষণ ক্লান্ত ছিল, আর তাই কাঠখোট্টা-শুকনো-গুমোট বাতাসহীন দিনে সূর্য তেজ ছড়াতে শুরু করার আগেই এই আগন্তুকের ঝামেলা থেকে তারা মুক্ত হতে চায়। হাতের কাছে তারা যা জঞ্জাল পেল—অর্থাৎ নৌকার সামনের একটি মাস্তুল এবং ছিপে গাঁথা মাছ ডাঙায় তোলার জন্য বড়শিযুক্ত একটি লাঠি লাশটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে ভালো করে বেঁধে নিল, যাতে তারা সমুদ্রতীরের খাড়া পাহাড়ে পৌঁছার আগ পর্যন্ত এগুলো লাশটির ভার সইতে পারে। তারা লাশটির সঙ্গে মালটানা জাহাজের একটি নোঙর বেঁধে দিতে চেয়েছিল, যাতে এটি সহজেই গভীরতম ঢেউয়ের ভেতর ডুবে যায়, যেখানে মাছেরা চোখে দেখতে পায় না এবং ডুবুরিরা স্মৃতিকাতরতায় মরে যায়, এবং পাজি স্রোত তাকে যেখান থেকে আবার তীরে নিয়ে আসতে পারবে না, যেমনটি হামেশাই ঘটে থাকে অন্যান্য লাশের ক্ষেত্রে। কিন্তু যতই তারা তাড়াহুড়া করছিল ততই মহিলারা সময় নষ্ট করার ফিকির করছিল। তারা চমকে ওঠা মুরগির মতো হেঁটে বেড়াচ্ছিল আর তাদের গলার হারের লকেটগুলো বুকের ওপরটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দোল খাচ্ছিল, তাদের অনেকে ডুবে মরা লোকটির একপাশে একটি ক্রুশ রাখতে বলছিল যাতে তার ওপর দিয়ে মঙ্গল-বায়ু বয়ে যায়, কেউ কেউ আবার অন্যপাশে একটি কব্জি-কম্পাস রেখে দিতে বলছিল, এবং অনেক কসরত করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর এক মহিলা পথ থেকে সরে এসে বলে উঠল, আরে, দেখো তো!—তোমরা যে আমাকে মরা মানুষটার ওপরে ফেলেই দিচ্ছিলে ধাক্কিয়ে! পুরুষেরা তাদের কলজের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিল এবং রাগে গজরাতে গজরাতে বলছিল—একজন অচেনা মানুষের জন্য কেন খামাকা এই গির্জার মূল বেদির মতো সাজসজ্জা? কতগুলো পেরেক দিয়ে তাকে গাঁথা হয়েছে তার ওপর এবং কত কলস পবিত্র জল ছিটানো হয়েছে তার গায়ে তাতে কী এসে-যায়? হাঙরেরা তো তাকে সেই একইভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে, নাকি? কিন্তু মহিলারা তাদের পবিত্র স্মৃতি হিসেবে এইসব ফালতু জিনিস মরা লোকটার ওপর জড়ো করতেই থাকল, সামনে-পেছনে ছোটাছুটি করতেই থাকল, চোখের পানি না ফেললেও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে হোঁচট খেতে থাকল, আর এভাবেই স্রোতে ভেসে আসা একটি লাশের জন্য, একজন ডুবে মরা মানুষের জন্য—যে কিনা কারো কেউ নয়, যে কিনা নিছকই বুধবারের এক টুকরো ঠান্ডা মাংস (জেলেরা সাধারণত বৃহস্পতিবার সাগর থেকে ফিরে আসে, তাই বুধবার নাগাদ সব রসদ প্রায় শেষ হয়ে যায়, ঠান্ডা-বাসি হয়ে যায়)। এমন বাড়াবাড়ি রকমের ত্রস্তব্যস্ততার পর শেষমেশ পুরুষেরা শবযাত্রা শুরু করল।

মহিলাদের ভেতর একজন, কেউ কোনো পাত্তা দিচ্ছিল না বলে এতক্ষণ যে মনে মনে খুব অপমান বোধ করছিল, এবার সে এগিয়ে এসে মৃত লোকটির মুখের ওপর থেকে রুমালটি সরিয়ে দিল এবং পুরুষেরা রুদ্ধশ্বাসে যাত্রা শুরু করল।

সে ছিল এস্তেবান। তাকে চেনার জন্য এটা আর তাদের বারবার মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। তাদের যদি স্যার ওয়াল্টার র‍্যালি (তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ অভিযাত্রী) সম্পর্কেও বলা হতো, এমনকি যদিও তারা হয়ত তার মার্কিন উচ্চারণভঙ্গিতে মুগ্ধই ছিল, তার কাঁধে বসা ম্যাকাও পাখি, তার নরখাদক মারার ব্লান্ডারবাসের (এক ধরনের সেকেলে গাঁদা বন্দুক, যেগুলোতে গুলি করার অনেকগুলো ছিদ্র থাকত এবং অল্প দূরত্বে একসঙ্গে অনেকগুলো গুলি করা যেত) জন্য চমৎকৃত হতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের দুনিয়াতে একজনই এস্তেবান থাকতে পারত, এবং এই হচ্ছে তাদের সেই এস্তেবান, একটা স্পার্ম তিমির মতো হাত-পা ছড়িয়ে আছে, জুতোহীন, শিশুদের খাটো হয়ে যাওয়া প্যান্টের মতো একটি প্যান্ট পড়ে আছে, নখগুলো পাথরের মতো শক্ত, যা কাটতে হতো ছুরি দিয়ে। তার মুখের ওপর থেকে রুমালটি তাদের সরিয়ে নিতে হয়েছিল এটা দেখতে যে—সে যে এত বড়, বা এত ভারী বা এত সুদর্শন সেজন্য সে লজ্জিত, এবং সে যদি জানত এমনটি ঘটতে চলেছে তা হলে ডুবে মরার জন্য আরো ভেবেচিন্তে বিবেচনা করে জায়গা বাছাই করে নিত, সত্যি বলছি, আমি হলে এমনকি পাল তোলা স্প্যানিশ গ্যালিওন জাহাজ থেকে নোঙর খুলে এনে আমার গলায় বাঁধতাম এবং সমুদ্রপাড়ের কোনো খাড়া পাহাড়ের ঢাল থেকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পানিতে পড়তাম সেই ধরনেরই কারো মতো—যারা চায় সবকিছু ঠিকঠাকমতো চলুক, এই ক্লান্তিকর-বুধবারের মরদেহ হয়ে যারা মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলতে চায় না, তোমরা মানুষেরা যেমনটি বলো—পচা এক টুকরো ঠান্ডা মাংস দিয়ে অন্য কাউকেই বিব্রত না করা, যাতে আমার কোনোকিছুই যায়-আসে না। তার স্বভাবে এতটাই সত্যনিষ্ঠতা ছিল যে, এমনকি সবচেয়ে আস্থাহীন পুরুষেরাও, যারা সাগরে অন্তহীন রাতগুলোতে এই ভাবনায় মনে মনে বিধ্বস্ত হতে থাকে যে তাদের স্ত্রীরা এখন আর তাদের স্বপ্নেও দেখে না—তারা স্বপ্নে দেখে ডুবে মরা মানুষদের, এমনকি তারা এবং অন্য যারা এখনো শক্ত আছে তারা তাদের অস্থিমজ্জায় এখনো কেঁপে ওঠে এস্তেবানের এই সততায়।

এভাবেই একজন পরিত্যক্ত ডুবে মরা মানুষের জন্য তারা তাদের ভাবনার পরিধির মধ্যে থেকে—তাদের জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটি পালন করল। যে কয়েকজন মহিলা পাশের গ্রামগুলোতে ফুল আনতে গিয়েছিল তারা অন্য কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো—যারা তাদের যা বলা হচ্ছিল তা বিশ্বাস করতে পারছিল না, এবং তারা যখন মৃত মানুষটিকে দেখল তখন আরো ফুল আনতে ফিরে গেল, এবং তারা আরো আরো বেশি করে ফুল আনতে থাকল—যতক্ষণ না এত বেশি ফুল এবং এত বেশি মানুষ জমে গেল যে সেখানে হাঁটাই এক মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। শেষ সময়ে এসে একজন এতিম হিসেবে তাকে পানিতে ফিরিয়ে দিতে তারা মনে ভীষণ কষ্ট পেল এবং তারা

তাদের সেরা মানুষদের ভেতর থেকে তার জন্য একজন বাবা ও একজন মা, এবং চাচি, চাচা, চাচাতো ভাই-বোনও বেছে নিল, সুতরাং এভাবে তার মাধ্যমে পুরো গ্রামবাসী একে অন্যের আত্মীয় হয়ে গেল। নাবিকদের ভেতর যারা দূর থেকে কান্না শুনল তারা ভুল পথে চলে গেল এবং লোকে শুনতে পেল তাদের একজন নিজেকে মূল মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে ডানাওয়ালা সেইসব নারীদের নিয়ে কল্পকাহিনী স্মরণ করেছিল, যাদের গান নাবিকদের মুগ্ধ করে সর্বনাশের পথে নিয়ে যেত। দুটি ভিন্ন উচ্চতার এলাকার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তাকে কাঁধে নিয়ে ওঠার জন্য যখন তারা সুবিধামতো একটি পথ খুঁজছিল তখন তাদের নারী ও পুরুষেরা এই প্রথমবারের মতো তাদের জনমানবশূন্য পথ, তাদের উঠোনের নীরস-শুষ্কতা সম্পর্কে এবং ডুবে মরা মানুষটির চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্যের দেখা পেয়ে তাদের স্বপ্নের সঙ্কীর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল।

তারা তাকে একটি নোঙর ছাড়াই চলে যেতে দিল, যাতে সে ইচ্ছে করলেই আর যখনই ইচ্ছে করবে তখনই আবার ফিরে আসতে পারে, এবং অনেক শতাব্দীর ভগ্নাংশ ধরে তার দেহটি অন্তহীন গহ্বরে পড়া পর্যন্ত তারা সবাই তাদের নিশ্বাস বন্ধ করে রাখল। তারা সবাই যে আর বর্তমানে নেই, তারা যে আর কখনোই বর্তমানে থাকবে না—তা বোঝার জন্য তাদের আর একে অন্যের দিকে তাকাতে হলো না। কিন্তু তারা এও জানত যে তার পর থেকে সবকিছুই বদলে যাবে, তাদের ঘরে থাকবে বড় বড় দরজা, উঁচু ছাদ, এবং এর চাইতে শক্ত মেঝে, যাতে এস্তেবানের স্মৃতি কড়িকাঠের সঙ্গে ঠোকা না খেয়ে সব জায়গায় বিচরণ করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে ফিসফিসিয়ে কেউ যাতে বলতে সাহস না পায় যে বিশালদেহী উজবুকটা শেষমেশ মারা গেছে, খুবই খারাপ, সুদর্শন হাবাগোবাটা অবশেষে মারা গেছ, কারণ তারা তাদের বাড়ির সামনের দিকটা উজ্জ্বল রঙে রঙ করে নিতে যাচ্ছে যাতে এস্তেবানের স্মৃতি চির অম্লান হয়ে থাকে এবং তারা তাদের বাড়ির পেছন দিকটা ভেঙে খুঁড়ে নেবে যাতে পাথরের মাঝ দিয়ে ঝরনা বয়ে যেতে পারে এবং পাহাড়ে ফুলের গাছ লাগিয়ে দেবে যাতে ভবিষ্যত বছরগুলোতে বড় বড় যাত্রীবাহী জাহাজ থেকে যাত্রীরা ভোরবেলায় খোলা সাগরে বাগানের ঘ্রাণে মাতোয়ারা হয়ে জেগে উঠতে পারে, এবং ক্যাপটেন তার ক্যাপটেনের পোশাক পরে ব্রিজ থেকে নেমে আসতে পারে তার গ্রহ-নক্ষত্রের উন্নতি নির্ণয়ের মধ্যযুগীয় যন্ত্র, তার ধ্রুবতারা, এবং তার যুদ্ধের পদকের সারি সমেত এবং, দিগন্তে উপকূলরেখা থেকে উঠে আসা উঁচুভূমির গোলাপগুলো দেখিয়ে চৌদ্দটি ভাষায় বলে উঠতে পারে—ওদিকে তাকাও, যেখানে বাতাস এখন এতটাই শান্তশিষ্ট যে তা বিছানার নিচে ঘুমাতে চলে গেছে, ওইদিকে তাকাও, যেখানে রোদ এত উজ্জ্বল যে সূর্যমুখী ফুলগুলো বুঝতে পারছে না কোন দিকে ফিরবে, হ্যাঁ, ওইদিকে, ওটাই এস্তেবানের গ্রাম।

ক্যালাভেরাসের বিখ্যাত লম্ফপটু ব্যাঙ | মার্ক টোয়েন | অনুবাদ: মনজুর শামস

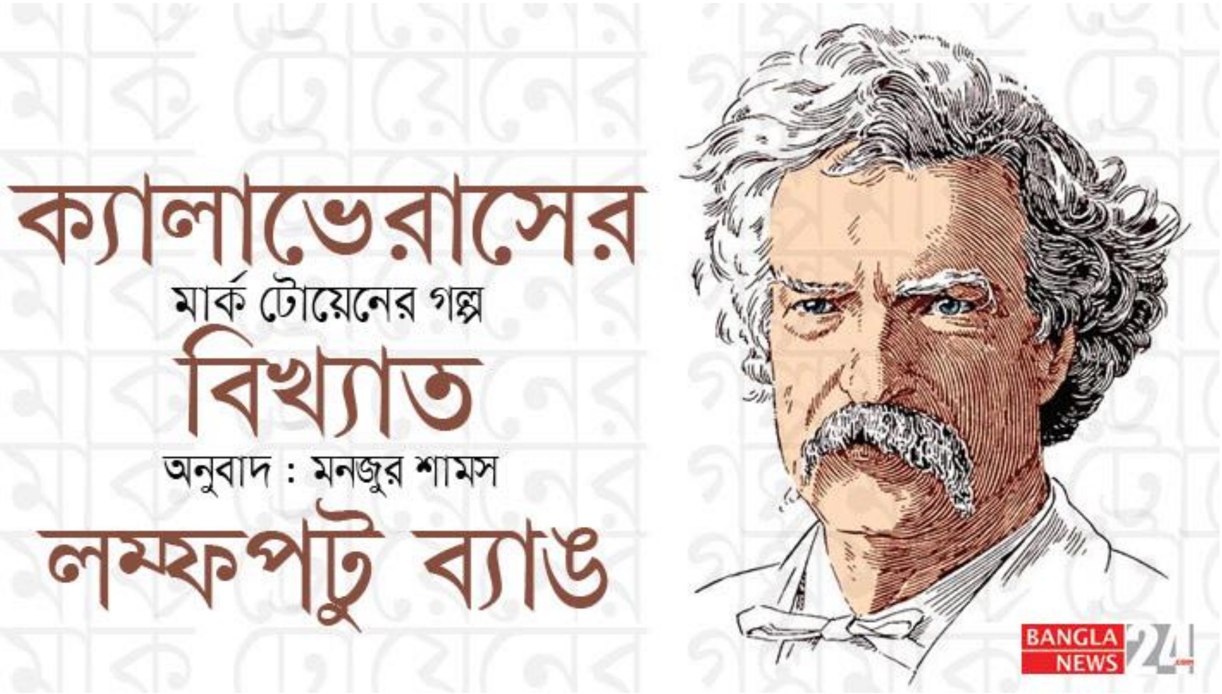

পুবের এক বন্ধু আমাকে চিঠি লিখে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন বলেই দেখা করতে গিয়েছিলাম ভালোমানুষ ও বাক্যবাগীশ বুড়ো সিমন হুইলারের সঙ্গে। বন্ধুর অনুরোধে আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম আমার সেই বন্ধুর বন্ধু লিওনিডাস ডব্লিউ স্মাইলির সম্পর্কে। আমার এই জানতে চাওয়ার ফলটা শেষমেশ কী হয়েছিল এখানে তা-ই তুলে ধরছি। আমার খুব খুঁতখুঁতে সন্দেহ হচ্ছিল—লিওনিডাস ডব্লিউ স্মাইলি আসলে এক গূঢ় রহস্যে ভরা অবাস্তব চরিত্র এবং আমার বন্ধু এমন কোনও ব্যক্তিকে আদতে কখনও চিনতই না। সে শুধু অনুমান করেছিল, আমি যদি বুড়ো হুইলারকে তার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করি তাহলে তার হয়ত সেই অখ্যাত জিম স্মাইলির কথা মনে পড়ে যেতেও পারে এবং তিনি হয়ত তার কিছু শয়তানি মার্কা ক্লান্তিকর পূর্বস্মৃতি আউড়ে আউড়ে আমাকে তিতিবিরক্তিতে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বেন। আর তার সেই ইনিয়ে বিনিয়ে বলা গল্প আমার কোনও কাজেই আসবে না। সেটাই যদি চক্রান্ত হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই সফল হয়েছিল।

সিমন হুইলারকে পেয়ে গেলাম অ্যাঞ্জেলের খনি-শ্রমিকদের পুরনো ক্যাম্পের এখানে-সেখানে একটি একটি করে ইট খসে পড়তে থাকা পানশালার পানকক্ষে। তিনি চুলোর পাশে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম তিনি বেশ মোটাসোটা টাক-মাথার এক বুড়ো। তার প্রশান্ত চেহারায় লেগে রয়েছে মন-কাড়া নম্রতা ও সরলতা। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি তাকে বললাম, খ্রিস্টের বাণী প্রচারক তরুণ যাজক লিওনিডাস ডব্লিউ স্মাইলি নামে এক লোকের সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের জবাব জানতে আমার এক বন্ধু তার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে। ছোটবেলায় আমার সেই বন্ধু তার সঙ্গ খুব কামনা করত। সে শুনেছে এক সময় এই অ্যাঞ্জেলের ক্যাম্পেই থাকতেন তিনি।

আমি আরও বললাম, জনাব হুইলার যদি এই রেভারেন্ড লিওনিডাস ডব্লিউ স্মাইলি সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন তবে আমি তার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ ও ঋণী থেকে যাব।

সিমন হুইলার আমাকে এক কোণায় ঠেলে নিয়ে গেলেন এবং তার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আমাকে তাতে বসালেন। এরপর তিনি পরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত একঘেয়ে কথার ঝাঁপি খুললেন। কক্ষণো হাসলেন না, ভুরু কচলালেন না। যেভাবে শুরু করেছিলেন—কন্ঠস্বরের কোনও পরিবর্তন না করে সেভাবেই কথাগুলো বলে যেতে থাকলেন। সন্দেহের কোনও অবকাশই রাখলেন না তার উৎসাহে কোনও ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু খুব উৎসাহ নিয়ে বলতে থাকা তার অফুরান কাহিনী-বর্ণনা শেষমেশ মাঠেই মারা গেল! তিনি তার কল্পিত কাহিনীকে খুব চাতুর্যের সঙ্গে যতই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর দুই নায়ককে সবচেয়ে সেরা মেধার মানুষ বলে দাঁড় করাতে চান না কেন, আমার কাছে তা খুবই হাস্যকর ও মজার মনে হচ্ছিল। এক বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য গল্প ফেঁদে তিনি যে মানুষটিকে এক মহান চরিত্র হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছিলেন আমার কাছে তা একেবারেই অসম্ভব-অবাস্তব মনে হচ্ছিল। আগে যেমনটি বলছিলাম—আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম রেভারেন্ড লিওনিডাস ডব্লিউ স্মাইলি সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কিনা এবং তার উত্তরে তিনি নিচের কথাগুলো বলেছিলেন। আমি তাকে তার মতো করে বলে যেতে দিলাম এবং একবারের জন্যও থামালাম না :

এক সময় এখানে জিম স্মাইলি নামের এক কাঠুরে থাকত। '৪৯ সালের শীতে বা '৫০ সালের বসন্তেও হতে পারে—ঠিক মনে করতে পারছি না। একবার মনে হচ্ছে এটা ঠিক, তো আবার মনে হচ্ছে ওটা। নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, তবে এটুকু মনে আছে—সে যখন এই ক্যাম্পে এলো তখনও বড় নালাটি কাটা শেষ হয়নি। কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন, যে কোনও ব্যাপারে সবসময় বাজি ধরত বলে সে ছিল এখানকার সবচেয়ে রহস্যময় মানুষ। আপনি তখন তাকে কখনও দেখলেই দেখতে পেতেন সে কারও না কারও সঙ্গে বাজি ধরছে। আর যখনই দেখত পেরে উঠছে না তখনই সে পক্ষ বদল করত। যেভাবেই হোক, বাজি ধরতে পারলেই সে বর্তে যেত। কিন্তু এটা বলতেই হয়—সে ছিল খুব ভাগ্যমান, অসাধারণ রকমের ভাগ্যমান। প্রায় সবসময়ই সে বাজিতে জিতে যেত। সব সময়ই সে বাজি ধরার জন্য তৈরি হয়ে থাকত এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকত।

এমন কোনও ব্যাপারই উল্লেখ করা যাবে না, যার ওপর ওই কাঠুরে বাজি ধরত না এবং এইমাত্র যা বলছিলাম, আপনি আপনার পছন্দমতো যে কোনও পক্ষ বেছে নিতে পারতেন। যদি কোনও ঘোড়দৌড় থাকত তো নির্ঘাত তাকে দারুণ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে দেখতেন বা ঘোড়দৌড় শেষে তাকে ভেঙে পড়তে দেখতেন। যদি কোনও কুকুরের লড়াই থাকত তো সে সেখানে বাজি ধরত, যদি কোনও বিড়াল-দৌড় থাকত তো সেখানে সে বাজি ধরত; যদি কোনও মোরগের লড়াই থাকত তাহলে

সেখানেও সে বাজি ধরত; এমনকি, কোনও বেড়ার ওপর যদি দুটি পাখি বসে থাকত তা হলেও সে বাজি ধরত—কোন পাখিটি আগে উড়ে যাবে; বা যদি কোনও ক্যাম্প-মিটিং থাকত তো সে সেখানে পারসন ওয়াকারের ওপর বাজি ধরতে নিয়মিত উপস্থিত থাকত, তার বিচারে যে ছিল সেখানকার শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণাদাতা এবং সেজন্যই সে ছিল একজন ভালো মানুষ।

সে যদি কোনও লম্বা পা-ওয়ালা পোকা স্ট্র্যাডল-বাগকে কোথাও যাওয়ার জন্য চলতে শুরু করতে দেখত তবে সে আপনার সঙ্গে বাজি ধরত পোকাটি যেখানে যাচ্ছে সেখানে যেতে তার কতটুকু সময় লাগবে, এবং আপনি যদি তার সঙ্গে বাজি লাগতেন তো সে হয়ত সেই স্ট্র্যাডল-বাগের পিছু পিছু মস্কো পর্যন্তও যেতে রাজি থাকত, তবুও সে দেখে ছাড়ত পোকাটি কতদূর যায় এবং কতক্ষণ সে পথে থাকতে পারে। এখানকার অনেক ছেলেই স্মাইলিকে দেখেছে এবং তারা আপনাকে তার সম্পর্কে বলতে পারবে। আরে গেল যা! বিশ্বাস হচ্ছে না? তাদের কথার সঙ্গে আমার কথা মিলিয়ে দেখুন—কোনও পার্থক্য খুঁজে পাবেন না।

বাজি ধরার বেলায় সে কোনও ধরনের বিপজ্জনক পথ বেছে নিতেই পিছপা হতো না। একবার পারসন ওয়াকারের স্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে ভীষণ অসুস্থতায় ভুগছিল, এবং হাবভাবে মনে হচ্ছিল তারা তাকে সারিয়ে তুলতে পারবে বলেই মনে করছিল; কিন্তু একদিন সকালে সে এলো এবং স্মাইলি তাকে জিজ্ঞেস করল তার স্ত্রী কেমন আছে আর সে বলল, ঈশ্বরের কৃপায় তার স্ত্রী তুলনামূলকভাবে ভালো আছে, চাঙ্গা হয়ে উঠছে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে আরও সেরে উঠবে এবং সে কিছু চিন্তা করতে পারার আগেই স্মাইলি বলে উঠল, 'বেশ, আমি আড়াই ডলার বাজি ধরতে প্রস্তুত সে কোনওভাবেই সেরে উঠবে না।
'

এই স্মাইলির একটি মাদি ঘোড়া ছিল, ছেলেপেলে যেটিকে পনেরো মিনিটের ঘুড়ি বলে ডাকত। কিন্তু তা কেবলই মজা করার জন্য, কারণ আপনি তো জানেন সেটি আসলে তার চেয়েও দ্রুত ছিল এবং খুব ধীরে দৌড়ালেও আর সবসময় শ্বাসকষ্টে ভুগলেও বা অসুস্থ থাকলেও বা ক্ষয়রোগ বা সে ধরনের কিছুতে ভুগলেও এই ঘুড়ি দিয়ে সে বাজির টাকাও জিতে যেত। অন্য ঘোড়াগুলো তাকে দুই শ বা তিন শ গজ আগে রেখে দৌড় শুরু করত, এবং মাঝপথেই তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেত, কিন্তু সবসময়ই ঘোড়দৌড়ের শেষ প্রান্তে এসে এটি চরম উত্তেজিত এবং বেপরোয়া হয়ে উঠত, এবং তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে দুই পা ফাঁক করে এবং দেহের চারপাশে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে, কখনও শূন্যে পা চালিয়ে, কখনও বা একপাশের বেড়ার ওপর ভর রেখে এবং লাথির ঘায়ে ধুলো উড়িয়ে হৈ-হুল্লোড়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে এবং তার হাঁচি-কাশির দমক আরও বেড়ে যেত বলে নাকের ফুটো আরও বড়

বড় করে ভোঁশ ভোঁশ করে দম ফেলতে ফেলতে সে সবসময়ই—আপনি তাকে তুচ্ছ ঠাওরানোর আগেই—এক গলা আগে থাকতেই বিজয়স্তম্ভে পৌঁছে যেত।

আর তার ছিল ছোট্ট একটা মদ্দা কুকুরছানা, যেটিকে দেখে আপনি হয়ত ভাববেন এক পয়সাও দাম নেই এটির, কিন্তু এটিকে চারপাশে ঘুরঘুর করতে দিন এবং তখন দেখবেন এটি ভীষণ বদমেজাজির মতো কুতকুত করে তাকাচ্ছে। এটিকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। সব সময় চুপিসারে কোনও কিছু নিয়ে সটকে পড়ার ধান্ধায় থাকত। কিন্তু যেই না এটির ওপর টাকার বাজি ধরা হতো ওমনি এটি অন্য কুকুর হয়ে যেত; তার নিচের চোয়াল স্টিমবোটের সামনের গলুইয়ের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসতে শুরু করত এবং দাঁতগুলো ঠেলে বেরুত আর ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ডের মতো সেগুলো ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকত। একটি কুকুর হয়ত এটিকে আঁকড়ে ধরতে পারত এবং তার ওপর ভীষণ তর্জন-গর্জন করে মহা আস্ফালন জুড়ে দিতে পারত। তাকে কামড়াতে পারত আর দুই কি তিনবার এটিকে তার কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়েও দিতে পারত।

এই মদ্দা কুকুরছানাটির নাম ছিল অ্যান্ড্রিউ জ্যাকসন। সে কক্ষণো লড়াই শুরুই করত না—যতক্ষণ না তার মালিক সন্তুষ্ট হতো। তখন মনে হতো এটিকে নিয়ে আর কোনও আশা-ভরসাই নেই, এবং প্রতিপক্ষ তখন বাজির দর কেবল দ্বিগুণ দ্বিগুণ বাড়াতেই থাকত—যতক্ষণ তার ট্যাঁকে টাকা থাকত; আর তার পরেই হঠাৎ এটি সেই অন্য কুকুরটিকে তার পেছনের পায়ের অস্থিসন্ধি দিয়ে খুব চেপে ধরে মজা করত এবং চেপে ধরেই থাকত যাতে সেই কুকুরটি চিবুতে না পারে। বুঝতেই তো পারছেন—স্রেফ মজা করার জন্য চেপে ধরা। এভাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত চেপে ধরে থাকত যতক্ষণ না তাদের ঘিরে পাঁড় মাতালেরা ভিড় জমাত—তাতে যদি বছরখানেকও লেগে যেত তো তাই সই। স্মাইলি সব সময়ই সেই কুকুরটির ওপর বাজি ধরে জিতে যেত।

তো একদিন হলো কী, সে পিছনের পা নেই এমন একটি কুকুরকে বর্ম পরিয়ে সাজিয়ে আনল, কারণ এর পেছনের পা গোলাকার করাত দিয়ে কেটে নেয়া হয়েছিল। বাজির ব্যাপারটা যখন যথেষ্ট এগিয়ে গেছে এবং এজন্য সব টাকা-পয়সাও দেয়া হয়ে গেছে এবং সে তার পোষাপ্রাণীর খাঁচার হুড়কোটা খুলে মিনিটখানেকের ভেতরেই সে টের পেল কিভাবে তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে এবং অন্য কুকুরটি দরজায় এসে যেভাবে তার দিকে তেড়ে এলো সে এতটাই ঘাবড়ে গেল যে কুকুরের লড়াই লাগিয়ে বাজি জেতার জন্য এরপর থেকে সে আর কোনও চেষ্টাই করত না এবং তাকে খুব খারাপভাবে এর জন্য খেসারত দিতে হয়েছিল।

কুকুরছানাটি স্মাইলির দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন সে বলতে চাইছিল—তার হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে গেছে, এবং এটা তারই দোষ যেহেতু লড়ার জন্য এমন একটি কুকুরই সে আনিয়েছে যেটির পেছনের পা নেই—যা তার লড়াই করার নির্ভরতা, এবং তখন সে তার একটি অঙ্গ কেটে ফেলল আর পড়ে গিয়ে মরে গেল। খুব ভালো কুকুরছানা ছিল এই আন্ড্রিউ জ্যাকসন এবং বেঁচে থাকলে তার যে মেধা ছিল তাতে খুব ভালো নাম কামাতে পারত এবং আমি জানি তার খুব গুণ ছিল, কারণ সেই পরিস্থিতিতে সে যেভাবে লড়ত তাতে এটির গুণপনার ব্যাপারে কোনও সন্দেহেরই অবকাশ ছিল না। তার সেই শেষ লড়াইটা নিয়ে যখনই আমি ভাবি তখনই যেভাবে এটির করুণ পরিণতি হয়েছিল তা আমাকে খুব দুঃখ দেয়।

তো বেশ, সেই বছর স্মাইলির ছিল র‍্যাট-ট্যারিয়ার নামের বেশ কয়েকটি কুকুর, বাচ্চা মোরগ ও মদ্দা বেড়াল এবং এই ধরনের আরও অনেককিছু—যা আপনি গুনে শেষ করতে পারবেন না এবং আপনি তার জন্য এমন কিছু পাবেন না যাতে সে বাজি ধরতে পারত না। একদিন সে একটি ব্যাঙ ধরল এবং বাড়িতে নিয়ে এলো আর বলল, এটিকে সে শিক্ষা দিতে চায়। আর তাই মাস তিনেক সে আর কিছুই করল না—কেবল বাড়ির পেছনের উঠোনে এটিকে লাফানোর সবক দেয়া ছাড়া। আর সত্যি বলতে কী, সে তা শিখিয়েও ছেড়েছিল।

সে এটির পেছনে ছোট্ট একটি গুঁতা মারত আর পরক্ষণেই ব্যাঙটিকে দেখতে পেতেন হাওয়ায় উড়ছে ঠিক একটি শূন্যে ছুড়ে মারা চিনি-ময়দা দিয়ে বানানো ডো-নাট পিঠার মতো। হাওয়ায় এটি একটি ডিগবাজি খেত বা লাফটা জবরদস্ত হলে বেশ কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে একটি বেড়ালের মতো চার পায়ে থপ করে পড়ে বসে পড়ত ঠিকঠাকমতো। সে এটিকে লাফিয়ে উঠে মাছি ধরার এমন শিক্ষাই দিতে থাকত যে প্রতিবার লাফিয়ে উঠে একটি মাছি দেখতে পেলেই সেটিকে থপ করে ধরে ফেলতে পারত।

স্মাইলি বলত, একটি ব্যাঙের চাই কেবল একটু শিক্ষা এবং যে কোনওকিছুর মতোই সেই শিক্ষা সে বেশ ভালোভাবেই দিতে পারত আর আমি তার সে কথা বিশ্বাসও করতাম। কেন? কারণ আমি এখানে, এই মেঝেতে তাকে ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারকে ছেড়ে দিতে দেখেছি। ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার হচ্ছে সেই ব্যাঙটির নাম। তো আমি তাকে এই মেঝেতেই ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারকে ছেড়ে দিয়ে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠতে শুনেছি—'মাছি, ড্যানিয়েল, মাছি!' এবং আপনি তখন থাকলে চোখের পলক ফেলারও আগে দেখতে পেতেন ব্যাঙটি সোজা লাফিয়ে উঠেছে এবং থপ করে একটি মাছি সাপের মতো মুখে পুরেই শক্ত মেঝেতে থপ করে বসে পড়েছে ঠিক এক দলা শক্ত কাদার মতো, এবং উদাসীনভাবে

পেছনের পা দিয়ে এমনভাবে মাথার একপাশ চুলকাচ্ছে যেন তার কোনও ধারণাই নেই—সে যা করছে তা অন্য কোনও ব্যাঙের পক্ষে করে দেখানো সম্ভব নয়।

আপনি কখনও তার মতো এমন বিনয়ী ও অকপট কোনও ব্যাঙ দেখতে পাবেন না—কারণ ঈশ্বর এইসব গুণ কেবল তাকেই দিয়েছিলেন। আর যখন একটি চমৎকার ও খাঁটি লাফ দেয়ার সময় আসত তখন এটি মরণপণ করে লাফ দিয়ে এতদূর পর্যন্ত যেতে পারত যে, তার জাতের কোনও প্রাণীর পক্ষে এক লাফে অতটা দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছেন, তার সবচেয়ে বড় গুণটাই ছিল মরণপণ লাফ দেয়া; আর যখন সেই সময়টা আসত স্মাইলি লাল হয়ে ওঠার সুযোগটা বেশ ভালো করেই নিত এবং তার কাছে যত টাকা থাকত তার সব নিয়ে সে এটির ওপর বাজি ধরত। স্মাইলি তার এই ব্যাঙটিকে নিয়ে দারুণ গর্বিত ছিল, আর তার অমন গর্ব করার যথেষ্ট কারণও ছিল, যেহেতু কাঠুরেরা তখন ঘুরে বেড়াত এবং সব জায়গায় তাদের দেখতে পাওয়া যেত আর তারা সবাই বলত—স্মাইলি এমনই একটি ব্যাঙ ধরেছে যা তারা আগে কখনও দেখেনি।

তো বেশ, স্মাইলি এই ব্যাঙটিকে জাফরি-কাটা ছোট্ট একটি বাক্সে রাখত এবং কখনও কখনও সে এটিকে এই বাক্সে পুরে নিয়ে শহরতলীতে যেত এবং এটির ওপর বাজি ধরত। একদিন ক্যাম্পে নতুন আসা এক অচেনা কাঠুরে বাক্সটা স্মাইলির কাছে এনে বলল :

'তোমার এই বাক্সটাতে কী ভরে রেখেছ?'

স্মাইলি কিছুটা উদাসীনভাবে বলল, 'এটি একটি টিয়ে হতে পারত, বা হতে পারত একটি ক্যানারি গায়ক পাখিও, কিন্তু এটি স্রেফ একটি ব্যাঙ।'

সেই কাঠুরে তখন বাক্সটি হাতে নিয়ে একবার এদিক, একবার সেদিক উল্টে-পাল্টে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখে বলল, 'আরে, তাই তো দেখছি! তো এটি কী এমন মহৎ কাজে লাগে?'

'শোনো তাহলে'—তেমন কোনও উৎসাহ না দেখিয়ে সহজ ও অসতর্কভাবে স্মাইলি বলল, 'একটি ব্যাপারে এটি খুব ভালো, আমাকে বলতেই হচ্ছে—এই গোটা ক্যালাভেরাস এলাকায় কোনও ব্যাঙই লাফিয়ে এটিকে হারাতে পারবে না।'

কাঠুরিয়া তখন আবারও বাক্সটা হাতে তুলে নিল এবং অনেকক্ষণ ধরে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বাক্সটি স্মাইলির কাছে ফেরত দিয়ে খুব চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা! কিন্তু আমি তো কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না যে এই ব্যাঙটি অন্য ব্যাঙের চেয়ে কোনও দিক দিয়ে ভালো হতে পারে।'

'তোমার তা মনে হতেই পারে'—স্মাইলি বলল, 'তুমি হয়ত ব্যাঙদের খুব ভালো বোঝ, বা হয়ত তুমি এগুলোকে বোঝই না; তোমার হয়ত অভিজ্ঞতা রয়েছে, অথবা তুমি হয়ত একেবারেই আনাড়ি। তা সে যাই হোক, আমি আমার মতটা জানালাম এবং এটি যে ক্যালাভেরাস এলাকার যে কোনও ব্যাঙকে লাফিয়ে হারিয়ে দিতে পারবে সে ব্যাপারে আমি চল্লিশ ডলার বাজি ধরতে রাজি।'

কাঠুরে মিনিটখানেক ভাবল এবং তারপর আরও দরদমাখা গলায় অনেকটা দুঃখের সঙ্গেই বলল, 'তা বেশ, আমি তো এখানে নতুন আর আমার কোনও ব্যাঙও নেই; কিন্তু আমার যদি কোনও ব্যাঙ থাকত তা হলে আমি ঠিকই তোমার সঙ্গে বাজি ধরতাম।'

স্মাইল তখন বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যদি এক মিনিট আমার বাক্সটা ধরো তো আমি গিয়ে তোমার জন্য একটি ব্যাঙ ধরে আনি।' সেই কাঠুরে বাক্সটি তার হাতে নিল আর স্মাইলির চল্লিশ ডলারের সঙ্গে তার চল্লিশ ডলার রেখে অপেক্ষা করতে থাকল।

এভাবে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় থেকে নিজের মনে সে খুব ভাবল, এবং তারপর ব্যাঙটিকে বাক্স থেকে বের করল আর খুব জোরজবরদস্তি করে এটির মুখ হাঁ করাল আর একটি চা-চামচ এনে খুব ভয়ে ভয়ে ব্যাঙটির মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে থাকল এবং থুতনি পর্যন্ত তা সেঁধিয়ে দিয়ে এটিকে মেঝেতে ছেড়ে দিল। এদিকে স্মাইলি জলাভূমিতে গিয়ে কাদার ভেতর অনেকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করল এবং শেষমেশ একটি ব্যাঙ ধরে নিয়ে এলো আর কাঠুরের হাতে সেটি তুলে দিয়ে বলল :

'এবার তুমি যদি প্রস্তুত হয়ে থাকো তাহলে এই ব্যাঙটিকে ড্যানিয়েলের পাশে রাখো, এটির সামনের পা ড্যানিয়েলের সামনের পা বরাবর রাখবে এবং আমি লাফ শুরু করার ঘোষণা-শব্দ উচ্চারণ করব।' এরপর সে বলল, 'এক, দুই, তিন—লাফাও!' এবং সঙ্গে সঙ্গে সে আর কাঠুরে ব্যাঙ দুটির পেছনে আলতো করে টুসকি মারল। নতুন ব্যাঙটি লাফ মারল, কিন্তু ড্যানিয়েল কেবল একটি খিঁচুনি দিল এবং একজন ফরাসির মতো শুধু কাঁধ কাঁপাল। আর কোনও নড়াচড়া করতে পারল না। একটি কামারের নেহাইয়ের মতো এটি শক্ত হয়ে পড়ে রইল এবং একটুও নড়তে পারল না, যেন তাকে নোঙর

দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। স্মাইলি খুব অবাক হয়ে গেল এবং ভীষণ মুষড়ে পড়ল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা সম্পর্কে কোনও ধারণাই করতে পারল না। কিছুতেই কোনও ধারণা করতে পারল না।

কাঠুরে ডলারগুলো নিয়ে নিল এবং চলে যেতে শুরু করল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে তার কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে ড্যানিয়েলের দিকে দেখিয়ে মহাজ্ঞানীর মতো বলল, 'দেখলে তো! এটি যে অন্য যে কোনও ব্যাঙের চেয়ে ভালো তার তো কোনও আলামতই দেখছি না আমি!'

স্মাইলি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাল। ড্যানিয়েলের দিকে পলকহীনভাবে তাকিয়ে থাকল। শেষমেশ বলল, 'আমি খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি জাতটার কী হয়েছে যে ব্যাঙ এমন অদ্ভুতভাবে পড়ে থাকে? নিশ্চয়ই কোনও না কোনওভাবে কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে যার জন্য এটিকে এমন ঢুলুঢুলু লাগছে।' এরপর সে ড্যানিয়েলের ঘাড়ের কাছের চামড়া ধরে তুলে বলল, 'ধামার বেড়ালগুলোকে আর দোষ দেয়া কেন!' এরপর সে ব্যাঙটিকে উল্টো করে ধরল এবং এটি বড় করে দুটি ঢেকুর ছাড়ল। আর তখনই স্মাইলি ব্যাপারটি দেখতে পেল, এবং সে ভীষণভাবে খেপে গেল আর সেই কাঠুরের পিছু ধাওয়া করল। কিন্তু কখনওই সে আর ওই কাঠুরেকে ধরতে পারেনি। এবং—[গল্পের এই জায়গায় এসে সিমন হুইলার শুনতে পেলেন বাইরের উঠোন থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে এবং তিনি কী চাওয়া হচ্ছে দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালেন] চলে যেতে যেতে আমার দিকে ফিরে বললেন : 'যেখানে আছেন ঠিক সেখানেই বসে থাকুন নতুন মানুষ, বিশ্রাম করুন, আমি এক সেকেন্ডের জন্য একটু যাচ্ছি। '

কিন্তু, আমি মনে করি না তার চলে যাওয়ায় ভবঘুরে মজার এই জিম স্মাইলির যে চলমান কাহিনীতে ছেদ পড়ল তা পুরোটা শুনলেও রেভারেন্ড লিওনিডাস ডব্লিউ. স্মাইলির ব্যাপারে খুব একটা বেশি তথ্য জানতে পারব। তাই চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম। ফিরে আসতে থাকা এই মিশুক হুইলারের সঙ্গে দরজাতেই আমার দেখা হয়ে গেল এবং তিনি আমার কোটের বোতামের ঘর ধরে থামিয়ে আবার শুরু করলেন : 'তো বেশ, সেই বছর স্মাইলি একটি একচোখা গরু জোগাড় করেছিল, যেটির কোনও লেজ ছিল না, ছিল স্রেফ কলার মতো ছোট্ট একটি কাটা লেজ, এবং'

'ওহ্, রাখুন তো আপনার স্মাইলি আর তার হতভাগা গরুর কথা!' ভালো মানুষের মতো বিড়বিড় করে এ কথাটুকু বলে আমি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম এবং চলে এলাম।

মার্ক টোয়েন : মার্ক টোয়েনের প্রকৃত নাম স্যামুয়েল ল্যাঙ্গহোর্ন ক্লিমেন্স। জন্ম : নভেম্বর ৩০, ১৮৩৫, মৃত্যু: এপ্রিল ২১, ১৯১০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দুনিয়াজুড়ে খ্যাতিমান এই লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে—'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব টম সয়্যার', 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব হাকেলবিরি ফিন', 'লাইফ অব দ্য মিসিসিপি' ইত্যাদি।

স্বপ্নে দেখেছে সে কারাগারে বন্দি | মারিও বেনেদেত্তি | অনুবাদ : ফজল হাসান

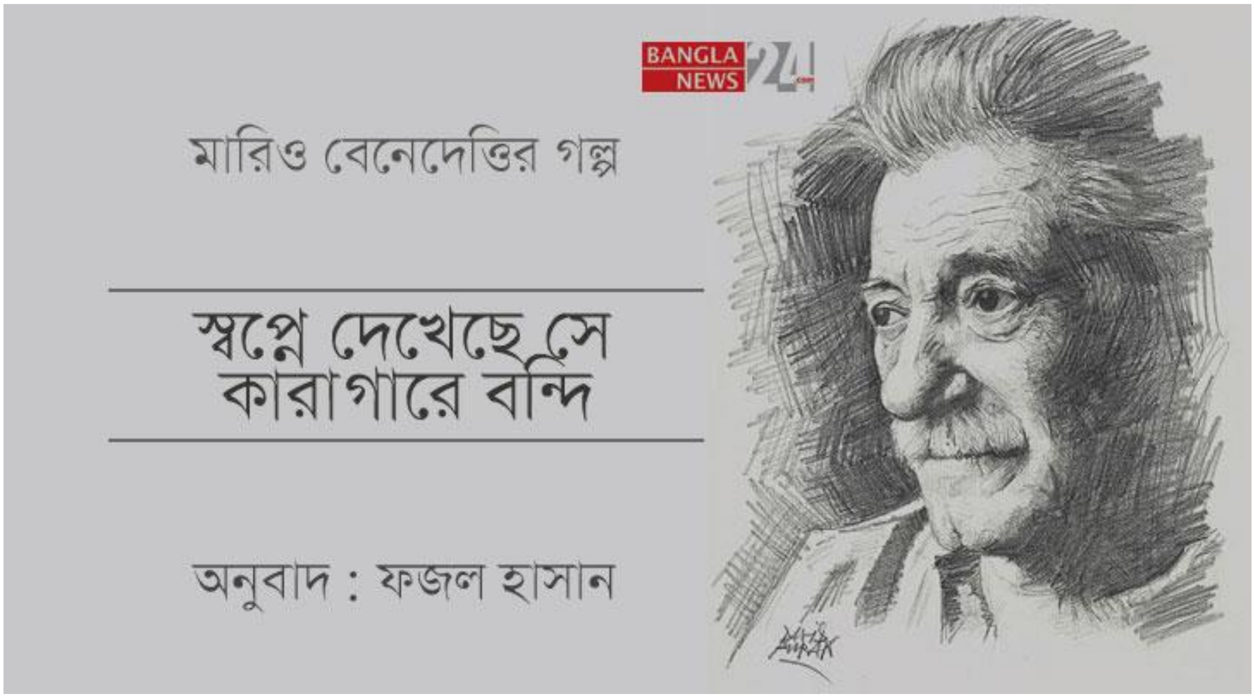

কয়েদি স্বপ্নে দেখেছে সে কারাগারে বন্দি। স্বাভাবিক কারণে সেই স্বপ্ন ছিল বিশদ এবং নিয়ম মাফিক। যেমন স্বপ্নের দেয়াল জুড়ে ছিল প্যারিস থেকে কিনে আনা পোস্টার; অথচ বাস্তবের দেয়ালের গায়ে শুধু ময়লা পানির কালো দাগ। স্বপ্নের মেঝেতে একটা টিকটিকি দৌঁড়ে চলে গেল; অথচ বাস্তবের মেঝেতে একটা ধাড়ি ইঁদুর পিটপিট করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কয়েদি স্বপ্নে দেখেছে সে কারাগারে বন্দি। কেউ এসে আলতো হাতে তার পিঠ টিপে দিচ্ছে এবং সে আরাম বোধ করতে শুরু করেছে। সে দেখতে পায়নি কে তার পিঠ টিপে দিচ্ছিল। তবে সে নিশ্চিত যে, সে-টা তার মা ছিল। তার মা এ কাজে বেশ পটু। প্রশস্ত জানালা গলিয়ে সকালের নরম রোদ এসে ঠিকরে পড়েছে মেঝের ওপর এবং সেই রোদকে সে এমনভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছে যা একধরনের পূর্ণ স্বাধীনতার বহির্প্রকাশ। যখন সে চোখ খোলে, তখন দেখে কোথাও রোদের কোনো হদিশ নেই। একঝলক বাতাস অন্য ছোট্ট জানালার (দৈর্ঘ্যে চব্বিশ এবং প্রস্থে ষোল ইঞ্চি) ফাঁক গলিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে অন্যদিকের দেয়ালে আছড়ে পড়ে।

স্বপ্নে টিকটিকি দেখার ইচ্ছে নিয়ে সে পুনরায় গভীর নিদ্রার অতলে তলিয়ে যায়। সে আবিষ্কার করে যে, টিকটিকি লেজ হারিয়েছে। এ ধরনের উদ্ভট স্বপ্ন দেখার কোনো অর্থ নেই। কত বছর ধরে কারাগারে বন্দি আছে, তার হিসাব জানার জন্য সে আঙুলের কর গোনে—এক, দুই, তিন, চার এবং

তারপর সে জেগে যায়। পুরো ছয় বছর তাকে কারাগারে বন্দি থাকতে হবে এবং মাত্র তিন বছর হয়েছে

কয়েদি স্বপ্নে দেখেছে সে কারাগারে বন্দি এবং তার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। সে পর্যাপ্ত পরিমাণে বরফ-পানি পান করছে এবং সেই হিমশীতল পানি যেন বাষ্প হয়ে অশ্রুর ফোঁটার মতো তার চোখ থেকে ঝরে পড়ছে। কান্নার হেতু তার অজানা নয়, কিন্তু সে নিজের কাছে স্বীকারোক্তি করতে চায় না। সে তার অলস হাতের দিকে তাকায়। একসময় সে সেই হাত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি তৈরি করেছে, খড়িমাটি দিয়ে মুখ এঁকেছে এবং মার্বেল পাথর দিয়ে নারীর অবয়ব বানিয়েছে। যখন তার ঘুম ভাঙে, তখন সে বুঝতে পারে তার চোখ শুকিয়ে গেছে, হাত ময়লা, মরচে পড়া দরোজার কবজা, বুকের ভেতর প্রচণ্ড গতিতে ধুকপুকানি, ফুসফুসে কোনো হাওয়া নেই এবং ঘরের সিলিং ফুটো।

কয়েদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, স্বপ্নে বরং কারাগারে বন্দি দেখাই তার জন্য উত্তম। তাই সে চোখ বন্ধ করে এবং বন্ধ চোখে সে দেখে যে, তার হাতে মিলাগ্রোর (এক ধরনের তামার ছোট মূর্তি, অনেকে বিশ্বাস করে এ মূর্তির অলৌকিক ক্ষমতা আছে) ছবি । কিন্তু শুধু ছবি দেখে সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। সে আসল মিলাগ্রো চায় এবং একজন মহিলা মিলাগ্রো মুখমণ্ডলে বিশাল হাসির ঢেউ তুলে হাজির হয়। মিলাগ্রো মহিলার পরনে আকাশ-নীল রঙের রাতের আলখেল্লা পোশাক। মহিলা এমন ভঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে আসে, যেন সে হাতের মিলাগ্রোর ছবিটা ফেলে দেয় এবং সে তাই করে। স্বাভাবিকভাবে নিরাভরণ মিলাগ্রো মহিলা দেখতে অপ্সরী এবং পলকহীন তাকিয়ে সে প্রাণ ভরে তার সৌন্দর্য উপভোগ করে। সে ঘুম থেকে জাগতে চায়নি, কিন্তু জেগে গেছে। জেগে ওঠার ঠিক কয়েক সেকেন্ড আগে প্রবল উত্তেজনায় এবং পুলক শিহরণে তার স্খলন হয়। ঘুম থেকে জেগে দেখে সেখান কেউ নেই, কোনো ছবি নেই, কোনো মিলাগ্রো নেই, এমনকি আকাশ-নীল রঙের রাতের আলখেল্লাও নেই। সেই মুহূর্তের সে অসহনীয় নিঃসঙ্গতা মেনে নিয়েছে।

কয়েদি স্বপ্নে দেখেছে সে কারাগারে বন্দি। ইতোমধ্যে মা তার পিঠ টেপা বন্ধ করেছে। অথচ তার মা আগেই ইহলোক ত্যাগ করে অচিন দেশে চলে গেছে। তার চাহনি, গানের কন্ঠস্বর, নিশ্চিত কোল, এমনকি ক্ষমা করার অলৌকিক ক্ষমতা তাকে রীতিমত মনপোড়ানি করে তুলেছে। নিজের সঙ্গে সে কোলাকুলি করে, কিন্তু সেটা মায়ের মতো স্নেহ-ভালোবাসায় উষ্ণ নয়। দূর থেকে মিলাগ্রো হাত নেড়ে বিদায় জানায়। তার কাছে মনে হয় মিলাগ্রো যেন কবরস্থান থেকে তাকে বিদায় জানাচ্ছে। কিন্তু তা তো হবার নয়। হয়তো কোনো পার্ক থেকে হবে। কিন্তু কারাগারের বন্ধ ঘরের ভেতর কোনো পার্ক নেই। তখনো সে ঘুমের অতলে তলিয়ে আছে। তবে তার ইন্দ্রিয় সজাগ এবং সে জানে যে, এটা নিছক স্বপ্ন। যাহোক, বিনিময়ে সে ধন্যবাদ জানানোর জন্য হাত তোলে। কিন্তু সেই হাত মুষ্টিবদ্ধ। সবাই জানে, মুষ্টিবদ্ধ হাত কিন্তু এদিক-ওদিক নেড়ে বিদায় জানাতে শেখেনি।

যখন সে চোখের পাতা খুলে তাকায়, তখন পরিচিত বিছানার ওপর দৃষ্টি পড়তেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমশীতল ঠান্ডা স্রোত কুলকুল করে ওপর থেকে নিচে নেমে যায়। তার হাত যেন ক্রমশ অবশ হয়ে যাচ্ছে। দু'হাতে ঘনঘন গরম নিঃশ্বাসের ফুঁ দিয়ে এবং তালু ঘষে সে প্রাণপণে হাত গরম রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বা ছাড়তে পারছে না। তখনও ঘরের এক কোণে ধাড়ি ইঁদুর পিটপিট করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো প্রচণ্ড ঠান্ডায় ইঁদুরটাও তার মতো কাবু হয়ে আছে। সে একটা হাত সামনের দিকে বাড়ায় এবং দেখাদেখি ইঁদুরটাও একটা পা সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। এই দুটো প্রাণী আগে থেকেই পরিচিত। মাঝে মাঝে লোকটি তার জঘন্য এবং বিস্বাদের খাবার ইঁদুরের দিকে ছুড়ে দেয়।

এছাড়াও স্বপ্নে কয়েদি সবুজ রঙের তরিৎকর্মা গিরগিটির অনুপস্থিতি উপলব্ধি করে। স্বপ্নে টিকটিকি দেখার ইচ্ছে নিয়ে সে পুনরায় গভীর নিদ্রার অতলে তলিয়ে যায়। সে আবিষ্কার করে যে, টিকটিকি লেজ হারিয়েছে। এ ধরনের উদ্ভট স্বপ্ন দেখার কোনো অর্থ নেই। কত বছর ধরে কারাগারে বন্দি আছে, তার হিসাব জানার জন্য সে আঙুলের কর গোনে—এক, দুই, তিন, চার এবং তারপর সে জেগে যায়। পুরো ছয় বছর তাকে কারাগারে বন্দি থাকতে হবে এবং মাত্র তিন বছর হয়েছে। সে পুনরায় গুনতে শুরু করে এবং এবার তার আঙুল সজাগ হয়ে যায়।

তার কাছে রেডিও ছিল না, হাতের ঘড়ি ছিল না, বই ছিল না, পেন্সিল ছিল না, এমনকি লেখার জন্য কোনো খাতাও ছিল না। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতা এড়ানোর জন্য সে নরম সুরে গান করে। কিন্তু সে মাত্র কয়েকটা গান জানে এবং সেগুলো ক্রমশ তার স্মরণ শক্তির ভুবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া শৈশবে তার ঠাকুরদাদা তাকে কিছু প্রার্থনা শিখিয়েছিল। কিন্তু এখন, কার কাছে সে প্রার্থনা করবে? সে মনে করে ঈশ্বর তাকে ধোঁকা দিয়েছে, তবে বিনিময়ে ঈশ্বরকে সে ধোঁকা দিতে চায় না।

কয়েদি স্বপ্নে দেখেছে সে কারাগারে বন্দি এবং তার মনে হয় ঈশ্বর কারাগারে আসবে এবং তখন সে ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি করে বলবে যে, সে ভীষণ ক্লান্ত এবং অনিদ্রায় ভুগছে, যা তাকে পরিশ্রান্ত করে তুলেছে। মাঝে মাঝে সে যখন গভীর ঘুমে বিভোর থাকে, তখন সে দুঃস্বপ্ন দেখে যে, যীশু এসে তাকে বলছে সে যেন ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু ঈশ্বর অন্য কাজে ব্যস্ত এবং তার প্রার্থনার প্রতিদান দিবে না।

'সবচেয়ে খারাপ হতে পারে,' ঈশ্বর হয়তো তাকে বলবে, 'আমি এক এবং অদ্বিতীয়।'

ঈশ্বরের এই একাকিত্বের জন্য তার খুব অনুশোচনা হয়। যাহোক, একসময় সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং তখন তার উপলব্ধি হয় যে, সে একজন নাস্তিক। পরমুহূর্তেই সে ঈশ্বর সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা বন্ধ করে দেয় এবং নিজের সম্পর্কে অনুশোচনা, বন্দি জীবন এবং একাকিত্বের বদলে নিজেকে ক্লান্তিকর এবং পঙ্কিল পরিবেশে নিমজ্জিত অবস্থায় আবিষ্কার করে।

অসংখ্য স্বপ্ন এবং নিশিপালনের পর একদিন সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে বিনা বাধায় তার সামনে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হয়। প্রহরী এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে বলে, কারাগার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কয়েদি নিশ্চিত হয়, সে আসলে স্বপ্ন দেখছে না। কারণ তার কাছে বিছানা ঠান্ডা লাগছিল এবং ধাড়ি ইঁদুরের উপস্থিতি তার দৃষ্টিগোচর হয়। সে করুণার দৃষ্টিতে ইঁদুরকে শেষ অভ্যর্থনা জানায় এবং কাপড়চোপড়, অর্থকড়ি, হাতের ঘড়ি এবং চামড়ার থলি, যা কারাগারে ঢোকার সময় কর্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল, সংগ্রহ করার জন্য সে প্রহরীকে অনুসরণ করে।

কারাগার থেকে বেরোনোর সময় সদর দরজায় কেউ তার জন্য অপেক্ষায় ছিল না। সে একাকি হাঁটতে থাকে। সে প্রায় দু'দিন হাঁটে এবং রাস্তার পাশে কিংবা গাছের ছায়ায় রাত্রিযাপন করে। শহরের বাইরে একটা পানশালায় ঢুকে সে দুটো স্যান্ডউইচ এবং সামান্য মদ্য পান করে, যার স্বাদ পুরোনো এবং অনায়াসে তা বুঝতে পারে। অবশেষে সে যখন তার বোনের বাড়িতে এসে পৌঁছে, তখন তাকে দেখে তার বোন আকস্মিকতায় ভড়কে গিয়ে প্রায় মূর্ছা যাচ্ছিল। তারা রীতিমত বাকরুদ্ধ হয়ে দশ মিনিটের মতো একে অপরকে জড়িয়ে ধরে রাখে। তারপর ঘোর কেটে গেলে তার বোন কাঁদতে শুরু করে এবং এক সময় তার পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞেস করে।

'এই মুহূর্তে ভালো মতো গোসল করে শান্তির ঘুম। আমি ভীষণ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত,' জবাবে সে বলল।

গোসল শেষ হলে তার বোন তাকে একটা খুপরি ঘরে নিয়ে যায়। সেই ঘরে বিছানা আছে। নোংরা এবং ময়লা বিছানা নয়, বরং পরিষ্কার, নরম এবং পরিপাটি। সে এক নাগাড়ে বারো ঘন্টা ঘুমিয়েছে। অদ্ভুত বিষয়, সেই দীর্ঘ ঘুমের মাঝে প্রাক্তন কয়েদি স্বপ্ন দেখেছে যে, সে কারাগারে বন্দি, সেই পরিচিত টিকটিকি এবং অন্যান্য সবকিছু বহাল তবিয়তে আছে।

মারিও বেনেদেত্তি প্রসঙ্গে

দক্ষিণ আমেরিকার সমকালীন সাহিত্যের অন্যতম, স্বনামধন্য এবং সর্বজন স্বীকৃত উরুগুয়ের লেখক মারিও বেনেদেত্তি। তাঁর পুরো নাম মারিও ওরল্যান্ডো হার্ডি হ্যামলেট ব্রেনো বেনেদেত্তি ফারুগিয়া। তিনি একধারে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক, কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক এবং নাট্যকার । তাঁর জন্ম ১৯২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি স্টেনোগ্রাফার হিসাবে চাকুরি জীবন শুরু করেন। তবে পরবর্তীকালে সাংবাদিকতাকে মূল পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। উরুগুয়ের বিখ্যাত সাপ্তাহিক খবরের কাগজ 'মার্চা'য় ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৩ সাল (জোরপূর্বক বন্ধ না করা পর্যন্ত) পর্যন্ত নিয়মিত লিখেছেন। এছাড়া তিনি উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং মেক্সিকোর বিভিন্ন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল এবং সাময়িক পত্রিকায় লিখেছেন। স্বৈরাচারী সামরিক শাসনামলে (১৯৭৩-১৯৮৫) তিনি প্রথমে আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ারসে এবং পরে পেরুর লিমা শহরে বসবাস করেন। লিমা শহরেই তিনি বন্দি হন এবং তাকে উরুগুয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। তবে রাজক্ষমা পেয়ে তিনি ১৯৭৬ সালে কিউবায় গমন করেন এবং পরের বছর স্পেনের মাদ্রিদে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে এলে ১৯৮৩ সালের শুরুতে মাতৃভূমিতে ফিরে যান তিনি।

মারিও বেনেদেত্তির লেখার মূল বিষয়বস্তু মন্তেবিদেয়োর সাধারণ মানুষের সাদামাটা কাহিনী। 'বিংশ শতাব্দীর উরুগুয়ের সাহিত্য' গ্রন্থসহ তিনি প্রায় নব্বইটি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য একাধিক সাহিত্য কর্ম বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দিনলিপি আকারে রচিত তাঁর অন্যতম সফল উপন্যাস 'দ্য ট্রুস' ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তাঁর সুখ্যাতি আন্তর্জাতিক পাঠকমহলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে এই উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। এছাড়া 'থ্যাঙ্কস ফর দ্য লাইট' (১৯৬৫) [একই শিরোনামে ১৯৮৪ সালে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়] এবং 'জুয়ান এঞ্জেলস্ বার্থডে' (১৯৭১) তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'ব্লাড প্যাক্ট অ্যান্ড আদার স্টোরিজ' (১৯৭৭) এবং 'দ্য রেস্ট ইজ জাঙ্গল অ্যান্ড আদার স্টোরিজ' (২০১০) ইংরেজিতে প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্প সংকলন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি একাধিক পুরস্কারে ভূষিত। শ্বাস-প্রশ্বাস এবং পরিপাকতন্ত্রের সমস্যার কারণে ২০০৯ সালের ১৭ মে মন্তেবিদেয়োতে তার মৃত্যু হয়।

গল্পসূত্র

'স্বপ্নে দেখেছে সে কারাগারে বন্দি' গল্পটি মারিও বেনেদেত্তির ইংরেজিতে 'হি ড্রিমড্ দ্যাট হি ওয়াজ ইন প্রিজন' গল্পের অনুবাদ। স্পেনীয় ভাষা থেকে গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন হ্যারি মোরালেস। ইংরেজিতে গল্পটি ২০০৭ সালের মে সংখ্যা 'ওয়ার্ডস্ উইদআউট বর্ডার্স' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

লোকটির ওড়াউড়ির ভাবনা নিয়ে ম্যারী রীতিমতো সমালোচনায় মুখর। একসময় সে মন্তব্যের সুরে বলল, ‘এ নিয়ে তুমি সত্যি ভীষণ পেরেশানিতে আছো ।’

‘আমার মনে হয় না, আমি বেকায়দায় আছি’—লোকটি বলল।

‘এটা নিছক একধরনের আচ্ছন্নতা’—মহিলা বলল, ‘সব কথাবার্তার মূল বিষয় শুধু ওড়াউড়ি এবং পাখি। আমার মনে হয়, তুমি কোনও কিছুতে মোটেও খুশি নও এবং কোথাও পালাতে চাও।’

লোকটি বেঞ্চের উপর পিঠে ভর করে চিৎ হয়ে শোয় এবং উপরের দিকে তাকায়। খোলা আকাশে একটা শঙ্খচিল পাখি শরীরের দু’দিকে ডানা মেলে আপনমনে ভেসে বেড়াচ্ছে। কখনও পাখিটি ডিগবাজি খাচ্ছে, আবার কখনও শাঁ করে উপর থেকে নিচে নেমে এসে পুনরায় উপরে উঠে যাচ্ছে।

‘আমার মনে হয়, বিষয়টা ভালোই হবে’—লোকটি বলল, ‘শঙ্খচিলের দিকে তাকিয়ে দেখো।’

ম্যারী চোখ বন্ধ করে আছে। 'শঙ্খচিল আমি দেখেছি'—চোখ বন্ধ করেই সে বলল। 'ওদের পালক সাদা এবং ঠোঁট কমলা রঙের।' বলেই সে এক মুহূর্তের জন্য থেমে পুনরায় বলল, 'এবং কমলা রঙের পা।'

কয়েক পলকের জন্য তাদের চারপাশ আবারও মৌনতার অদৃশ্য চাদরে ঢাকা পড়ে। একসময় আলতো হাতে মৌনতার সেই অদৃশ্য চাদর সরিয়ে ম্যারী বলল, 'তুমি যদি উড়তে পারো, তাহলে তোমার অন্য কিছু, যেমন ধরো সাঁতার, করার ইচ্ছে হবে।'

'শঙ্খচিল কিন্তু সাঁতারও জানে'—হেঁয়ালীর সুরে লোকটি বলল।

'পানির নিচে ডুব-সাঁতার নয়।'

'তবে ওরা পানির নিচে ডুব দিতে পারে'—সে বলল, 'কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।'

'আসলে আমি তাই বলতে চেয়েছি'—ম্যারী বলল, 'পানিতে ডুব দিয়ে ওরা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, এমনকি পানির নিচে মাছের মতো সাঁতরাতেও পারে না।'

'না'—লোকটি সায় দিয়ে বলল, 'তা সত্যি । ওরা মাছের মতো সাঁতরাতে পারে না।'

'এ জন্যই কি তোমার মন খারাপ?'

'না'—লোকটি বলল, 'আমি উড়তে বেশি আগ্রহী।'

ম্যারী আঙুলের ডগা দিয়ে বালি নাড়াচাড়া করে। 'তুমি রেগে গিয়েছ'—মাথা আনত করে সে বলল, 'আমি জানি, তুমি কখনওই খুশি হবে না।'

'উড়তে পারলেই আমি খুশি হব।'

'সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।'

'অসম্ভবেরও কিছু নেই।'

'না'—বলেই ম্যারী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের গরম বাতাস চারপাশে ছড়িয়ে দিয়ে পুনরায় বলল, 'আমার মনে হয় এটা অসম্ভব না।'

‘তুমি কাঁদছো’—ম্যারী বলল।

‘না, ঠিক কান্না নয়।’

‘আমি জানি, তুমি কেন কাঁদছো। তুমি বউয়ের জন্য কাঁদছো।’

‘না, আমার মনে হয় কথাটা সত্যি না।’

‘আমি নিশ্চিত। কারণটা তাই।’

‘মোটেও না।’

‘তাহলে তুমি উড়তে পারো না, কারণটা কি তাই?’

‘না।’

‘তবে কী কারণ?’

‘কিৎস্যু না’—লোকটি বলল, ‘আমি মোটেও কাঁদছিলাম না।’

ভালোবাসার নীল যমুনায় ডুব-সাঁতার খেলা শেষ হবার পরও ম্যারী অস্থির ছিল। ‘এটা কী?’—সে জিজ্ঞেস করে।

‘কিসের কী?’

‘তুমি জানো।’

‘না। সত্যি, আমি জানি না। আমার ভালো লাগছে। তোমার কি ভালো লাগছে?’

‘হ্যাঁ, আমার ভালো লাগছে। কিন্তু তোমার? এটা কী?’

‘আমি ভালো।’

‘তুমি সিলিংয়ের দিকে হাস্যকর দৃষ্টিতে পলকহীন তাকিয়ে আছো।’

‘আমি পিঠের ওপর ভর করে শুয়ে আছি। আমি সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছি, তার কারণ আমি চিৎ হয়ে আছি।’

‘ওড়াউড়ি নিয়ে তুমি ভাবছো’—ম্যারী অনুযোগের সুরে বলল।

'আমি ভাবছি না।'

'তুমি ভাবছো। অনায়াসে আমি বলতে পারি, তুমি ভাবছো। কখন তুমি ওড়াউড়ি নিয়ে ভাবো, তা আমি খুব সহজেই বলে দিতে পারি। দয়া করে তুমি যাহোককি থামবে?'

'ঠিক আছে'—লোকটি বলল।

একটু পরে ম্যারী বলল, 'তুমি এ নিয়ে ভাবছিলে। কি, ভাবছিলে না? সত্যি কথাটা আমাকে বলো?'

'না'—সে বলল, 'আমার মনে হয় না, আমি আদৌ এ নিয়ে ভাবছিলাম।'

'যাহোক, ওড়াওড়ি নিয়ে তোমার ভাবনা আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। প্রতীজ্ঞা করো, তুমি কোনদিনই আমাকে আর ভয় দেখাবে না।'

'প্রতীজ্ঞা করছি'—হালকা স্বরে লোকটি বলল।

লোকটির ঘাড়ের ওপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে ম্যারী জিজ্ঞেস করে, 'এটা কী?'

'এটা একটা পানির পাম্প'—জবাবে লোকটি বলল।

'এর পাখা আছে।'

'না, ওগুলো পাখা নয়। ওগুলো চাকার ব্লেড, যা উপরে পানি তুলতে সাহায্য করে। এটা একটা পানির পাম্প।'

'আমার মনে হয়, এগুলো উপরে ওঠার কাজে লাগে'—ম্যারী বলল। 'তুমি কিন্তু প্রতীজ্ঞা করেছ, আমার সঙ্গে ভণিতা করবে না।'

'এগুলো পানির পাম্পের ব্লেড'—লোকটি জোর গলায় বলল, 'সত্যি।'

'ঠিক আছে'—ম্যারী বলল, 'যাই হোক না কেন, আমি এসেছি তোমাকে বলার জন্য যে, বাঁধাকপির ভেতর অনেক ছোট ছোট পোকা আছে।'

অনেক দিন কেউ ওড়াউড়ি নিয়ে আর কোনও কথা বলেনি।

এক রাতে তারা ময়লা থালাবাসন ধুয়ে মুছে রাখছিল। সেই সময় ম্যারী প্রসঙ্গটা আবার তোলে, ‘ওড়ার জন্য তুমি যদি সত্যি কিছু বানিয়ে থাকো, তাহলে সরাসরি বলে দিলেই পারো’ ম্যারী বলল, ‘শুধু বলো, তুমি করেছো...’

‘হ্যাঁ’—একসময় লোকটি মিনমিনে গলায় বলল।

‘ঠিক আছে, তুমি যদি তাই বানাও, তাহলে সেটা ক’জন মানুষ বহন করতে পারবে?’

‘আমরা দুজন।’

‘আমাদের দুজনকে বহন করতে পারবে?’

‘অবশ্যই।’

মুহূর্তেই ম্যরীর চোখেমুখে একধরনের উজ্জ্বল রোশনাই ছড়িয়ে পড়ে। আচমকা সে দু’হাত বাড়িয়ে লোকটিকে জড়িয়ে ধরে এবং আলতো চুমু খায়। তার হাতের সাবানের ফেনা লোকটির চুলে ছড়িয়ে পড়ে। পরমুহূর্তে ম্যারীর সম্বিত ফিরে আসে এবং তার কপালে চিন্তার সূক্ষ্ম ভাঁজ দেখা যায়।

‘ইতোমধ্যে তুমি যদি বানিয়ে থাকো’—ম্যারী বলল, ‘তাহলে ওখানে কি আমার কুকুরের জন্য একটু জায়গা হবে?’

‘হ্যাঁ’—লোকটি বলল, ‘সেটা করা যাবে। এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখিনি। তবে আশাকরি ওটা করা যাবে।’

‘অসুবিধা হবে?’

‘না, কোনও অসুবিধা হবে না।’

‘উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। তাহলে খুবই ভালো হয়’—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ম্যারী বলল।

‘বেশ তো’—লোকটি বলল, ‘তাহলে কোথায় যেতে চাও?’

ম্যারী মাথায় হেলমেটের ফিতা বাঁধে এবং কুকুরকে সঙ্গে নেয়। ‘আমি জানি না’—সে বলল, ‘তুমি কোথায় যেতে চাও?’

‘তুমি যেখানে যাবে, সেখানেই যাব’—হেঁয়ালীর সুরে লোকটি বলল।

‘তাহলে’—ম্যারী বললো, ‘আমি মনে কিছু করব না যদি...’ কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে সে হঠাৎ থেমে যায়। তারপর কী ভেবে যেন পুনরায় সে সংকুচিত গলায় বলল, ‘আমি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছিলাম । যাহোক, তুমি কোথায় যেতে চাও?’

‘তুমি যেখানে যেতে চাও।’

‘ঠিক আছে’—ম্যারী বলল, ‘ফ্লোরেন্সে যাওয়ার জন্য আমি সব সময় আগ্রহী।’

‘তাই হবে’—লোকটি বলল।

বলেই সে মাথা তুলে খোলা আকাশের দিকে তাকায়। তার মনে হলো, ওড়ার জন্য আজ রাতটা সত্যি অপূর্ব, মনোমুগ্ধকর।

পিটার ক্যারি: অস্ট্রেলিয়ার স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্প লেখক। ভিক্টোরিয়া অঙ্গরাজ্যের ব্যাকাস মার্শ শহরে ১৯৪৩ সালের ৭ মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে ‘অস্কার এন্ড লুসিন্ডা’ এবং ২০০১ সালে ‘ট্রু হিস্টরি অফ দ্য কেলি গ্যাং’ উপন্যাসের জন্য দুবার ‘ম্যান বুকার’ পুরস্কার পান। এছাড়া ১৯৮৫ সালে ‘ইলিওয়েকার’ এবং ২০১০ সালে ‘প্যারোট এন্ড অলিভিয়্যার ইন আমেরিকা’ উপন্যাসের জন্য ‘ম্যানবুকার’ পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় তার নাম উঠে আসে। ২০০৬ সালে ‘থেপ্ট: এ লাভ স্টোরি’, ২০০৮ সালে ‘বেস্ট অফ দ্য বুকার প্রাইজ’ এবং ২০০৭ ও ২০০৯ সালে ‘ম্যানবুকার ইন্টারন্যাশনাল’ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন।

‘ব্লিস’ (১৯৮১), ‘অস্কার এন্ড লুসিন্ডা’ (১৯৮৯) এবং ‘জ্যাক ম্যাগস্’ (১৯৯৮) উপন্যাসের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সম্মানিত সাহিত্য পুরস্কার ‘মাইলস্ ফ্রাঙ্কলিন অ্যাওয়ার্ড’ লাভ। এছাড়া ‘জ্যাক ম্যাগস্’ এবং ‘ট্রু হিস্টরি অফ দ্য কেলি গ্যাং’ উপন্যাসের জন্য ‘কমনওয়েলথ্ রাইটার্স’ পুরস্কার পান। মোট তেরটি উপন্যাস তার। এছাড়া চারটি ছোটগল্প সংকলন এবং অগ্রন্থিত অসংখ্য ছোটগল্প রয়েছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের হান্টার কলেজের ‘মাস্টার অফ ফাইন আর্টস্ ইন ক্রিয়েটিভ রাইটিং’ প্রোগ্রামের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত।

‘সুখী হৃদয়ের গল্প’টি পিটার ক্যারির ‘হ্যাপি স্টোরি’ গল্পের অনুবাদ। গল্পটি লেখকের ‘কালেক্টেড স্টোরিজ ’ সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে।

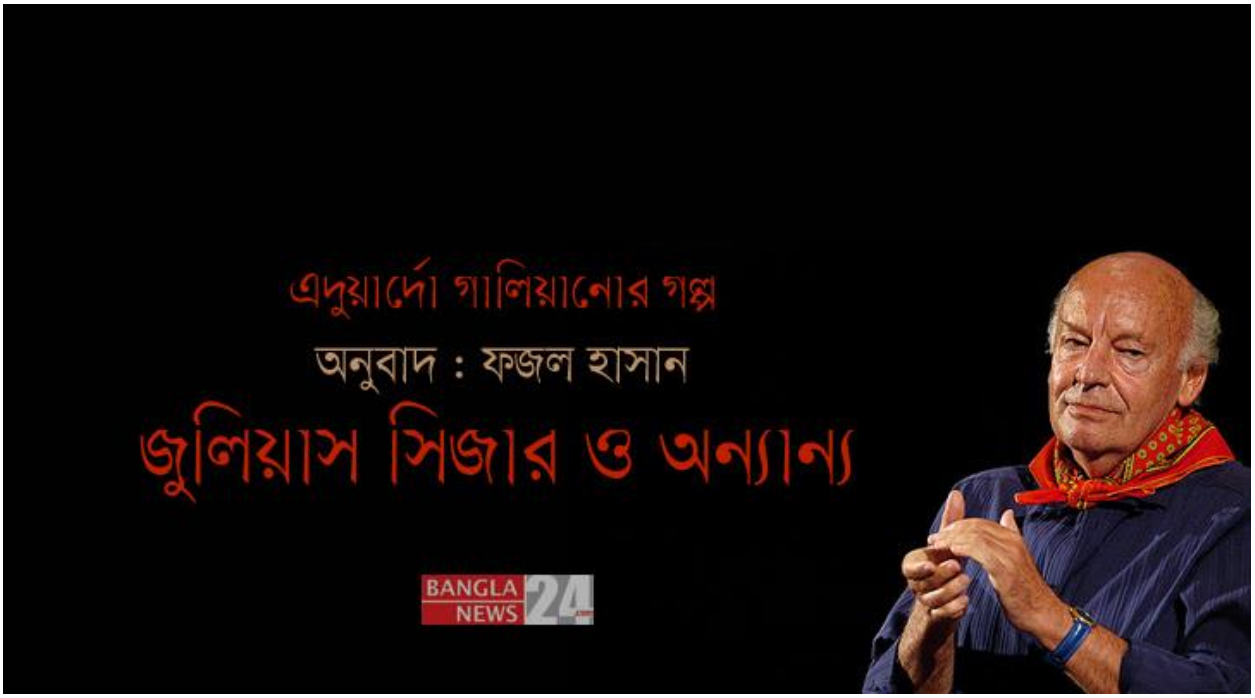

জুলিয়াস সিজার

সবাই তাকে ‘টেকো লম্পট’ বলে সম্বোধন করত এবং বলত যে, সে ছিল প্রত্যেক রমণীর কাছে আকাঙ্ক্ষিত স্বামী এবং প্রত্যেক পুরুষের কাছের ঈপ্সিত স্ত্রী।

অনেকেই জানত, সে কয়েক মাস ক্লিওপেট্রার শোবার ঘরে কাটিয়েছে। এই সময়ে সে একবারও বাইরে উঁকিঝুঁকি দেয়নি।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে রোমে ফিরে আসার সময় সে বিজয়ের স্মারক হিসাবে ক্লিওপেট্রাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এই মহান বিজয় এবং গৌরবের জের ধরে ইউরোপ এবং আফ্রিকায় তার সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে সে গ্লাডিয়েটরদের আমৃত্যু লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছিল। এছাড়া সে ক্লিওপেট্রার দেওয়া উপহার এবং অন্যান্য মূল্যবান ধনরত্ন প্রদর্শন করে আত্মতুষ্টি ও বীরত্ব জাহির করেছিল।

পুরো সাম্রাজ্যের একমাত্র ময়ূরপঙ্খী রঙের টোগা দিয়ে রোম শহর তাকে সুসজ্জিত করেছে এবং জলপাই রঙের পত্রাবলী ও রঙিন ফুলের তৈরি শিরোমাল্য পড়িয়েছে। এবং রাজকবি ভার্জিল তার স্বর্গীয় বংশ পরিচয় মহা সমারোহে উদযাপন করেছিল, যা অ্যানিয়াস, মঙ্গল গ্রহ এবং ভেনাস থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই ঘটনার খুব বেশি দিন পরে নয়, বীরত্বের শিখরে আসীন হয়ে সে নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিপতি হিসাবে প্রচার করা শুরু করে। তার এই ঔদ্ধত ব্যবহারের জন্য আশেপাশের লোকজনের অলঙ্ঘনীয় অধিকার রীতিমত হুমকির মুখে পড়ে।

এবং তার ঘনিষ্ঠ লোকজন ও পাদ্রিরা মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এক আউন্স ওজনের সতর্ক প্রতিরোধ এক পাউন্ড ওজনের মুক্তি লাভের চেয়ে শ্রেয়।

বীর বিক্রম সিজারের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য ঘনিষ্ঠ সহচরগণ তাকে ঘিরে থাকে। এবং তার প্রিয়পাত্র ব্রুটাস, যে হয়ত তার পুত্র, সর্বপ্রথম তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং তার পেছনের দিকে প্রথম ছুরি বিদ্ধ করে। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত অন্যান্যদের ছুরিও তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে। তারপর সবাই বিজয় উল্লাসে রক্তাক্ত ছুরি স্বর্গের দিকে উঁচিয়ে ধরে। তার নিথর দেহ পাথরের ওপর পড়ে থাকে। কোনো ক্রীতদাসও তাকে স্পর্শ করার সাহস পায়নি।

হিরাক্লিস

কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য সম্রাট জিয়ুসের খুব নামডাক ছিল। একসময় খারাপ ব্যবহার করার জন্য সে তার ছেলে হিরাক্লিসকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছিল।

হিরাক্লিসকে, রোমের সবার কাছে সে হারকিউলিস নামে সুপরিচিত ছিল, লিডিয়ার মহারানী ওমফলি ক্রয় করেছিলেন এবং মহারানী অনুগত সেবক হিসাবে সে একদিন একটা সাপ ধরে হত্যা করেছিল।

শৈশবের পরে সে কখনোই কোনো সাপ ধরে টুকরো টুকরো করে কাটেনি। সে একজোড়া সাপ বন্দি করে, যেগুলো রাতের আঁধারে মাছির রূপ নিয়ে ঘুমন্ত মানুষদের ডাকাতি করত।

তার সেই বীরত্ব দেখে মহারানী ওমফলি অভিভূত হতে পারেননি। কেননা তিনি একজন প্রেমিকা চেয়েছিলেন, দেহরক্ষী নয়।

তারা দুজনে প্রায় সব সময়ই অন্দর মহলে থাকত। তবে তারা কয়েক বার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

হিরাক্লিসের পরনে থাকত মুক্তার মালা, স্বর্ণের চুড়ি এবং উজ্জ্বল রঙের অন্তর্বাস। তবে সেই অন্তর্বাস বেশিক্ষণ তার পরনে থাকত না। কেননা তার বিশাল শরীরের মাংসপেশীর চাপে একসময় ওগুলো ছিঁড়ে যেত। অন্যদিকে মহারানীর গায়ে থাকত সিংহের চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক। হেরাক্লিস খালি হাতে নিমিয়ায় সেই সিংহকে হত্যা করেছিল।

রাজ্যের পুরোটা জুড়ে চাউর হয়েছিল যে, যখন হেরাক্লিসের ব্যবহারে মহারানী নাখোশ হতেন, তখন তিনি স্যান্ডেল দিয়ে তার পাছায় চপেটাঘাত করতেন। তবে হেরাক্লিসের হাতে যখন ফাঁকা সময় থাকত, তখন সে মহারানীর পায়ের কাছে বসে সেলাই করত এবং কাপড় বুনত। সেই সময় অন্দরমহলের ক্রীতদাসীরা পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করত, সাজ-সজ্জা করে দিত, খুশবো মাখত এবং সুরা পান করাত।

হেরাক্লিসের আরাম-আয়েশ মাত্র তিন বছর টিকেছিল। দুনিয়ার বারোজন শক্তিশালী মানুষের কাজ করার জন্য তার পিতা জিয়ুস তাকে ফিরে যেতে হুকুম জারি করেছিল।

স্তালিন

তিনি জর্জিয়ার ভাষায় লেখা শিখেছিলেন। জর্জিয়া তার আবাসভূমি। কিন্তু ক্যাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা তাকে রাশিয়ান ভাষায় কথা বলার জন্য বাধ্য করেছিল।

পরবর্তী সময়ে মস্কোতে তার দক্ষিণ ককেশীয় উচ্চারণ তাকে অনেক ভুগিয়েছিল।

সুতরাং তিনি রাশিয়ানদের চেয়েও বেশি করে রাশিয়ান হতে চেয়েছেন। এটা কি সত্যি না যে, নেপোলিয়ান কর্সিকায় জন্মগ্রহণ করার পরেও ফরাসীদের চেয়ে বেশি ফরাসী ছিলেন? এবং ক্যাথারিন দ্য গ্রেট, যিনি জন্মগতভাবে জার্মান ছিলেন, রাশিয়ানদের চেয়ে বেশি রাশিয়ান ছিলেন?

জর্জিয়ান আয়োসিফ জুগ্যাশভিলি রাশিয়ান নাম গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেকে স্তালিন হিসাবে জাহির করেন। স্তালিনের অর্থ হচ্ছে 'ইস্পাত'।

ইস্পাত কঠিন মানুষটি চেয়েছিলেন তার ছেলেও ইস্পাতের মতো দৃঢ় এবং শক্ত হোক। কিন্তু বলা হয়, শৈশব থেকে স্তালিন তার ছেলে ইয়াকভকে আগুনে পুড়িয়ে এবং বরফে ভিজিয়ে হাতুড়ির আঘাতে বড় করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। ইয়াকভ তার মায়ের ছেলে। উনিশ বছর বয়সে সে বৈরী পরিবেশ মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানায়, কেননা সেই সময় সে দুঃসহ কঠিন জীবন বহন করতে পারছিল না।

একদিন সে ট্রিগার টিপে।

গুলি তাকে মারতে পারেনি।

একসময় হাসপাতালে তার ঘুম ভাঙে। বিছানার পায়ের কাছে তার বাবা দাঁড়িয়ে মন্তব্যের সুরে বললেন: ‘গুলিটাও ঠিক মতো নিশানা করতে পারোনি।’

কাফকা

বিশ্বে প্রথম নারকীয় হত্যাযজ্ঞের দামামা বাজার কাছাকাছি সময়ে ফ্রাঞ্জ কাফকা তার অমর সাহিত্য কর্ম ‘মেটাম্যরফোসিস’ রচনা করেন এবং হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার অল্প পরেই রচনা করেন ‘দ্য ট্র্যাপ’।

এগুলো ছিল দুটি দুঃস্বপ্ন:

একজন মানুষ বিশাল তেলেপোকা হয়ে জেগে ওঠে এবং কেন তা হয়েছে, কিছুতেই সে অনুধাবন করতে পারে না। পরিশেষে একদিন ঝাড়ু দিয়ে ঝেঁটিয়ে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে দেওয়া হয়।

আরেকজন লোক ধরা পড়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বিচার করা হয়েছে এবং বিচারে সে দোষী প্রমাণিত হয়েছে। অথচ লোকটি আসল কারণ জানে না কেন সে দোষী। অবশেষে একসময় জল্লাদ তার শিরচ্ছেদ করেছে।

এসব গল্প এবং গ্রন্থের কাহিনী বিশেষভাবে খবরের কাগজে স্থান পায়, যা দিনের পর দিন যুদ্ধের অগ্রগতির কথা প্রকাশ করে।

লেখক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারার অশরীরী ভূত, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে লিখেছেন।

তিনি যৎসামান্য প্রকাশ করেছেন। বলতে গেলে কেউ তার লেখা পড়েনি।

নিঃশব্দে তিনি চলে গেলেন, যেন প্রস্থানের পরেও তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। অন্তিম মুহূর্তে তিনি বিছানায় শুয়ে ডাক্তারকে শুধু বলতে পেরেছিলেন:

‘যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন, নইলে আপনি কিন্তু একজন খুনী।’

মার্ক টোয়েন

ইরাক আক্রমণের কয়েক মাস পরে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে, ফিলিপাইনের স্বাধীনতা যুদ্ধকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করে তিনি এই যুদ্ধে নেমেছেন।

উভয় যুদ্ধই স্বর্গ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

গোমড় ফাঁকা করে বুশ আরও বলেছেন যে, তিনি যা করছেন, তা ঈশ্বর প্রদত্ত নির্দেশ। এবং শত বৎসর পূর্বে প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলেও ঈশ্বরের দৈব বাণী পেয়েছিলেন:

‘ঈশ্বর আমাকে বলেছেন যে, ফিলিপিনোদের হাতে কিছুতেই তাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

তারা নিজেদের শাসন করার জন্য যোগ্য নয়। কাজ করার মতো আমাদের কিছু নেই। বরং তাদের সবাইকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে, সভ্য করতে হবে এবং খ্রিস্টান বানাতে হবে।’

সুতরাং ফিলিপিনোদের ভয়-ভীতির হাত থেকে ফিলিপাইনকে মুক্ত করা হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই পথ অনুসরণ করে রক্ষা করেছে কিউবা, পুয়ের্তো রিকো, হন্ডুরাস, কলাম্বিয়া, পানামা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, হাওয়াই, গুয়াম, সামোয়া …

একসময় লেখক অ্যামব্রোস বিয়ার্স উদ্ঘাটন করে:

'যুদ্ধ হচ্ছে আমাদের ভূগোল শেখার জন্য ঈশ্বরের পদ্ধতি।'

এবং তার সহকর্মী লেখক এবং এন্টি-ইম্পিয়্যারলিস্ট লিগের নেতা মার্ক টোয়েন জাতির জন্য একটা পতাকার নকশা এঁকেছিলেন। সেই পতাকায় তিনি তারকার পরিবর্তে ছোট ছোট মাথার খুলির ছবি দিয়েছিলেন।

জেনারেল ফ্রেডেরিক ফানস্টন অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য টোয়েনকে ফাঁসিতে ঝুলানো উচিত।

টম সয়্যার এবং হাক ফিন তাদের জনককে প্রতিরক্ষা করেছিল।

আলী

সে ছিল প্রজাপতি এবং মৌমাছি।

রিংয়ের মধ্যে সে যেন ভেসে বেড়াত এবং হুল ফোঁটাত।

১৯৬৭ সালে, মোহাম্মদ আলী, জন্মের পর বাবা-মা যার নাম রেখেছিলেন কসিয়াস ক্লে, সৈনিকের পোশাক পরিধান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

‘ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধে আমার কোনো বিদ্বেষ নেই,’ তিনি বলেছিলেন। ‘আমাকে কোনো ভিয়েতনামী নিগার বলে সম্বোধন করেনি।’

ওরা তাকে দেশদ্রোহী বলে দোষারূপ করেছে। এছাড়া তাকে পাঁচ বছরের কারাবাসও দিয়েছে এবং মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অব্যহতি দিয়েছে। ওরা তার ‘বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ’ খেতাব জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে।

এই শাস্তি পরবর্তী সময়ে ট্রফি হিসাবে তার কাছে ফিরে এসেছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়াশিপ খেতাব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে রাজা হিসাবে আখ্যায়িত করে।

কয়েক বছর পরে কলেজের ছাত্ররা একটা কিছু আবৃত্তি করার জন্য তাকে অনুরোধ করে। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বিশ্বের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

‘আমি, আমরা।’

লেখক পরিচিতি : দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম প্রধান লেখক এদুয়ার্দো গালিয়ানো। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক, সাংবাদিক এবং সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। উরুগুয়ের রাজধানী মন্তেবিদেয়োতে ১৯৪০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক পড়ালেখা অসমাপ্ত রেখে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে ষাটের দশকের শুরুতে সাংবাদিক হিসেবে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। দীর্ঘ ৫০ বছর লেখালেখি করেছেন পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বিরুদ্ধে। বলা হয়, তার লেখনির মাধ্যমে তিনি লাতিন আমেরিকার ‘অপহৃত স্মৃতি’কে উদ্ধার করে পুনর্জীবিত করেছেন। ‘মেমোরীজ অফ ফায়ার’ (তিন খণ্ড), ‘ডেইজ এন্ড নাইটস্ অফ লাভ এন্ড ওয়ার’, ‘দ্য বুক অফ অ্যামব্রেসেস’ এবং ‘ওয়াকিং ওয়ার্ডস্’ তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

গল্পসূত্র: অনূদিত গল্পগুলো ‘মিররস্ : স্টোরিজ অফ অলমোষ্ট এভরিওয়ান’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। স্পেনিশ ভাষা থেকে গল্পগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মার্ক ফ্রাইড।

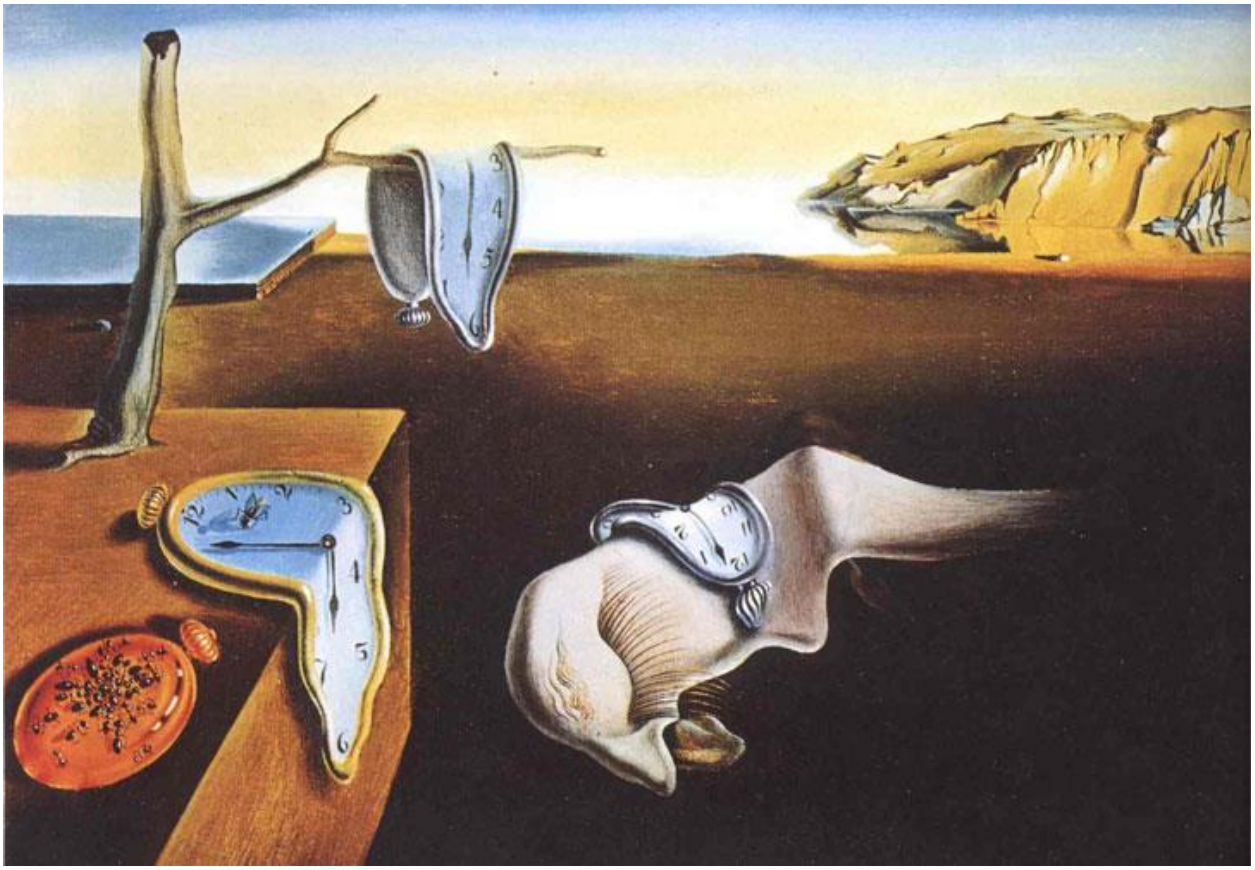

পেইন্টিং: সালভাদর দালি

'আমি কি অংশগ্রহণ করতে পারি?'

অপরিচিত মুখের লোকটি পেটিগ্রিউর দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুমতি চাইলো। লোকটির দেহের গড়ন মাঝারি এবং পরনে সাদামাটা আটপৌরে পোশাক। পেটিগ্রিউ একাকী কোণার একটা টেবিলে বসে আছে। তার হাতে বিয়ারের গ্লাস।

যাহোক, পেটিগ্রিউর ঋজু এবং সুঠাম দেহের গড়ন সুন্দর এবং দৃষ্টিনন্দন। ভিন্ন সময় হলে সে হয়তো লোকটির অনুমতির জবাব অন্যভাবে দিতো। কিন্তু এ মুহূর্তে সে সম্মতি সূচক ভঙ্গিতে ভদ্রভাবে বললো, 'হ্যাঁ, অবশ্যই পারেন। নির্দ্বিধায় বসুন।'

বলেই পেটিগ্রিউ—আগন্তুক লোকটির দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার জন্য কি কোনো পানীয় আনতে বলবো?'

‘না, আমার কিছু লাগবে না, ধন্যবাদ।’

কথা বলার সময় মাঝারি গড়নের লোকটি এমন অঙ্গভঙ্গি করে যেন তার সামনে ভরা বিয়ারের গ্লাস। কাউন্টারের পেছনে মোটামুটিভাবে সাজানো মদের বোতল রাখার সেলফ্‌, দোকানি এবং টেবিলে একজন বা দু'জন করে বসা খদ্দের ছাড়া তেমন বিশেষ কিছু চোখে পড়ার মতো নয়।

‘আগে আমাদের কখনোই মোলাকাত হয়নি। নাকি?’

‘আমার যদ্দুর মনে পড়ে, আগে আমাদের পরিচয় হয়নি।’

‘ভালো, বেশ ভালো। আমার নাম পেটিগ্রিউ, ড্যানিয়েল পেটিগ্রিউ। আপনার নাম?’

‘মেসন। আপনি জানতে চাইলে বলছি, আমার পুরো নাম জর্জ হার্বার্ট মেসন।’

‘হ্যাঁ, এতেই চলবে। আপনারও কি তাই মনে হয় না? জর্জ... হার্বার্ট... মেসন...।’

মেসনের পুরো নামের তিনটি শব্দকে পেটিগ্রিউ এমনভাবে টেনে বললো যেন সে রীতিমতো মুখস্থ করছে। তারপর সে বললো, ‘এখন আপনার টেলিফোন নম্বর বলুন।’

পেটিগ্রিউর অযাচিত দাবির প্রেক্ষিতে মেসন হয়তো পুনরায় বিরক্ত হতে পারতো, কিংবা প্রচণ্ড রাগ করতে পারতো। কিন্তু চোখেমুখে বিরক্তি বা রাগের কোনো চিহ্ন না ফুটিয়ে সে শুধু বললো, ‘আমার নম্বর টেলিফোন বইয়ে খুঁজে পাবেন।’

‘না, হয়তো এই শহরে একই নামের একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারে। যাহোক, এ মুহূর্তে মোটেও আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। অনুগ্রহ করে এবার নম্বরটা বলুন।’

‘তাই তো! ঠিক আছে। যাহোক, এটা তো আর গোপনীয় নয়। দুই-তিন-দুই, পাঁচ...’

‘থামুন, মশাই। আপনি খুব তাড়াহুড়ো করছেন। দুই-তিন-দুই... তারপর?’

‘পাঁচ-চার-পাঁচ-চার।’

‘কি অদ্ভুত ব্যাপার! আপনার টেলিফোন নম্বর খুবই সহজ। অনায়াসে আমি মনে রাখতে পারবো।’

‘আমার টেলিফোন নম্বর আপনার কাছে যদি এতই মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে কেন কাগজে লিখছেন না?’ ভ্রুক্ষেপ করে মেসন বললো।

মেসনের কথা শুনে পেটিগ্রিউ দাঁত কেলিয়ে হাসে। ক্রমশ ঠোঁটের ফাঁকে সেই হাসির রেখা মিলিয়ে যায় এবং চোখেমুখে একধরনের বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে। সে বললো, ‘আপনি কি জানেন না, এতে কোনো ফায়দা হবে না। যাহোক, দুই-তিন-দুই-পাঁচ-চার-পাঁচ-চার। আপনাকেও আমার টেলিফোন নম্বরটা দেওয়া উচিত। সেভেন...’

‘আপনার টেলিফোন নম্বর আমার মোটেও প্রয়োজন নেই, মিস্টার পেটিগ্রিউ।’ মেসনের কন্ঠস্বরে বিরক্তির সুর বেজে ওঠে। তবুও সে আরো বললো, ‘এখন বুঝতে পারছি, আপনাকে আমার টেলিফোন নম্বর দিয়ে রীতিমতো ভুল করেছি।’

‘কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আমার নম্বর নিতে হবে।’

‘অসম্ভব। আপনি আমাকে জোর করতে পারেন না।’

‘ঠিক আছে, চলুন এই সকাল বেলা আমরা একটা কথায় সহমত পোষণ করি।’

‘দয়া করে আমাকে বলবেন, এসব কী হচ্ছে?’

‘শুনুন, আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে।’

‘একই কথা বারবার বলছেন। এটা...’

‘যেকোনো সময় সবকিছু বদলে যেতে পারে। আমি হয়তো অন্যসময় আমাকে আলাদাভাবে দেখতে পাবো এবং আপনিও আপনাকে দেখতে পাবেন। যাহোক, আপনার এই সন্দেহের ব্যাপারে আমার কিছুই করণীয় নেই।’

‘মিস্টার পেটিগ্রিউ, এক্ষুণি আমাকে সবকিছু পরিষ্কার করে বলুন, নতুবা জোর করে আপনাকে তুলে দিতে আমি বাধ্য হবো।’

‘ঠিক আছে।’

পেটিগ্রিউর চোখেমুখে হতাশার ছায়া আরো বেশি গাঢ় হয়। সেই হতাশা মাখা মুখে সে বললো, ‘কিন্তু আমার মনে হয়, এতে ভালো কিছু হবে না। জানেন, আমরা যখন আলাপ শুরু করেছি, তখন আমার মনে হয়েছিল যে, আপনি একজন আসল মানুষ। কেননা আপনি যেভাবে...’

‘কসম লাগে, কথাটা আপনি আরেকবার বলুন। আমি একজন আসল মানুষ নই,’ অপমানিত মেসন বিড়বড় করে।

'কথাটা আমি এমনভাবে বলিনি। যথাসম্ভব সহজ ভাষায় বলেছি।'

'হায় ঈশ্বর! আপনি কি উন্মাদ, মাতাল, নাকি অন্য কিছু?'

'ওরকম কিছুই না। আমি তো ঘুমিয়ে আছি।'

'ঘুমিয়ে আছেন?' পলকেই অবিশ্বাসের একটুকরো কালো মেঘ উড়ে এসে মেসনের চোখেমুখে ছায়া ফেলে।

'হ্যাঁ, যা বলেছিলাম, প্রথমেই আমি আপনাকে আমার মতো পরিস্থিতিতে পড়া অন্য একজন আসল মানুষ হিসেবে ভেবেছিলাম। আমি ছিলাম গভীর ঘুমে নিমজ্জিত, স্বপ্ন দেখায় মগ্ন, ঘটনা জানার জন্য সচেতন এবং নাম ও টেলিফোন নম্বর আদান-প্রদানের জন্য রীতিমতো উদ্বিগ্ন। আমার মনে হয়েছিল, পরদিন সকালে আমাদের এই অভিজ্ঞতাকে একে অপরের কাছে সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে। তাহলে মন সম্পর্কে সেটা হতো একটা স্মরণীয় ঘটনা, তাই না? ঘুমের ভেতর স্বপ্নের গভীরে থেকেও একজন মানুষ অন্য আরেকজন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। তবে এটা খুবই দুঃখজনক যে, কদাচিৎ একজন অন্যজনের স্বপ্নকে অনুধাবন করতে পারে। গত কুড়ি বছরে আমি মাত্র চার কিংবা পাঁচবার এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, একবারও সফল হতে পারিনি। আমি হয়তো ঘটনার বিশদ ভুলে গেছি, নতুবা বিশেষ প্রকৃতির লোকের সাক্ষাত পেয়েছি, যা আজকের ঘটনার মতো একই ধরনের। তবে আমি আমার কাজ চালিয়ে যাবো...'

'আপনি অসুস্থ।'

'আরে না।'

সঙ্গে সঙ্গে হালকা প্রতিবাদের সুরে পেটিগ্রিউ বললো। তারপর একটু থেমে কণ্ঠস্বর বদলিয়ে সে আরও বললো:

'অবশ্য এটা কল্পনা করা স্বাভাবিক যে, আপনার মতো মানুষ আছে। যদিও বেমানান, কিংবা আপনি যদি সরাসরি বুঝতে পারেন, তাহলে আমার মনে হয় এ বিষয়ে তর্ক করা উচিত নয়। আমি যা বলেছি, হয়তো বলাটা আমার ভুল হয়েছে।'

'এটা সত্যি আশাব্যাঞ্জক যে, আপনি নিজেই কথাটা বলেছেন।'

ইতোমধ্যে মেসন খানিকটা শান্ত হয়েছে। একপর্যায় সতর্কতার সঙ্গে সে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে। তারপর ফুঁ করে এক মুখ ধোঁয়া বাতাসের মধ্যে ছেড়ে বলে, 'এ বিষয়ে আমি বেশি কিছু জানি না। তবে আপনার ভুল হলে আপনি বেশি দূর এগোতে পারবেন না। এখন আমাকে নিশ্চিত হতে দিন যে, পাঁচ মিনিট আগে আপনার মস্তিষ্কের ভেতর আমার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আমার নাম, ইতোমধ্যে আপনাকে বলেছি, জর্জ হার্বার্ট মেসন। আমার বয়স ছেচল্লিশ বছর, বিবাহিত, তিন সন্তানের জনক এবং আমি আসবাবপত্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। ধুর ছাই! সাধারণ স্মরণ শক্তি সম্পন্ন একজন লোকের মতো আমার জীবন কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে গেলে সারা রাত কেটে যাবে। চলুন, আমরা পান শেষ করি। তারপর আমার ঘরে চলুন। সেখানে আমরা...'

'আমার স্বপ্নের ভেতর আপনি একজন মানুষ,' পেটিগ্রিউ উঁচু গলায় বললো। তারপর কন্ঠস্বর স্বাভাবিক করে আরো বললো, 'দুই-তিন-দুই-পাঁচ-চার-পাঁচ-চার। আমি আপনাকে ফোন করবো, তবে নম্বরটা যদি আদৌ থেকে থাকে। আমি জানি, অন্য প্রান্তে তখন বর্তমানের এই আপনি থাকবেন না। দুই-তিন-দুই...'

'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, মিস্টার পেটিগ্রিউ?'

'কারণ যে কোনো মুহূর্তে আপনার একটা কিছু ঘটতে পারে।'

'কী... এটা কি একধরনের হুমকি?'

পেটিগ্রিউ ঘনঘন নিঃশ্বাস টানতে থাকে। ক্রমশ তার কোমল চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে এবং খসখসে পশমী জ্যাকেটের নকশি কাজগুলো ঝাপসা হয়ে আসে।

'টেলিফোন?' আচমকা পেটিগ্রিউ চিৎকার করে ওঠে। 'আমি যে সময় ভেবেছি, নিশ্চয়ই এখন দেরি হয়ে গেছে।'

'টেলিফোন?' কয়েকবার দ্রুত পলক ফেলে মেসন পেটিগ্রিউর দিকে তাকিয়ে পুনরাবৃত্তি করে। সেই সময় আস্তে আস্তে পেটিগ্রিউর মুখের আদল মিলিয়ে যেতে থাকে।

'আমার বিছানার পাশের টেবিলে! আমি জেগে উঠছি!'

মেসন এক হাত বাড়িয়ে অন্য হাত আকড়ে ধরতে যায়। কিন্তু বাড়িয়ে দেওয়া হাতের অনেকটা অংশ নেই এবং যেটুকু আছে, তাও ইতোমধ্যে অবশ হয়ে গেছে। নিজের প্রসারিত হাতের দিকে সে পলকহীন তাকিয়ে থাকে। তার হাতে কোনো আঙুল নেই, এমনকি হাতের এপিঠ-ওপিঠ এবং চামড়াও নেই।

লেখক পরিচিতি: প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক, কবি এবং সমালোচক স্যার কিংসলে উইলিয়াম আমিসের জন্ম ১৯২২ সালের ১৬ এপ্রিল, দক্ষিণ লন্ডনের ক্ল্যাপহ্যামে। ১৯৫৪ সালে প্রথম উপন্যাস 'লাকি জিম' প্রকাশিত হওয়ার পরপরই একজন বোদ্ধা লেখক হিসেবে তার নাম সাহিত্যাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। এই উপন্যাসের জন্য তাকে 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান' বলা হতো। তিনি চল্লিশটিরও বেশি গ্রন্থের (বিশটিরও বেশি উপন্যাস) রচয়িতা। সর্বশেষ উপন্যাস 'দ্যা বায়োগ্রাফার্স ম্যাসটাশ' ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়। অসংখ্য ছোটগল্প এবং কবিতাও লিখেছেন তিনি। 'দ্যা ওল্ড ডেভিলস্' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৬ সালে 'ম্যান বুকার' পুরস্কার পান। ১৯৯১ সালে 'নাইট' উপাধি অর্জন করেন। ২০০৮ সালে 'দ্যা টাইমস্' তাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের পঞ্চাশজন প্রথিতযশা ব্রিটিশ লেখকের মধ্যে নবম স্থানে আসীন করেছে। ১৯৯৫ সালের ২২ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

গল্পসূত্র: 'মেসনের জীবন' গল্পটি ১৯৭২ সালে লেখা কিংসলে আমিসের 'মেসন'স্ লাইফ' ছোটগল্পের অনুবাদ। গল্পটি ২০১১ সালে প্রকাশিত লেখকের 'কমপ্লিট স্টোরিজ' সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে। এর আগে গল্পটি ১৯৭৬ সালে 'গোস্টলি, গ্রিম অ্যান্ড গ্রুসাম' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গল্পটিতে ঘুমের ভেতর দু'জন অপরিচিত লোকের সাক্ষাতের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।

'আমার মগের ভেতরের কফির দাগগুলো দেখো,' শ্যারন বললো। 'এই মগের দিকে তাকালে তুমি ভড়কে যাবে। কফির দাগগুলো দেখতে অনেকটা আবহাওয়ার মানচিত্রের মতো। মনে হয়, এতে দিনক্ষণ, সপ্তাহ এবং বছর–সবই আছে। মগের দাগগুলো আমাকে রীতিমতো বিষিয়ে তুলেছে। মনে হয় যেন আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত কলঙ্কের চিহ্ন কফির এই দাগগুলো।'

শ্যারন তার কথার যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য আমার দিকে কফির মগ উঁচু করে উল্টেপাল্টে দেখায়। তারপর কাউন্টারের দিকে ফিরে যাওয়ার সময় বললো, 'আমি প্রতিদিনই ঘষামাজা করে মগ পরিষ্কার করি।'

'আপনার কাছে কি ডকেট আছে? আপনার নাম কি?' কাউন্টারের সামনে অপেক্ষারত লোকটিকে উদ্দেশ্য করে শ্যারন জিজ্ঞেস করে। সেই সময় শ্যারন হয় সরাসরি লোকটির মুখের দিকে তাকিয়েছিল, নতুবা হাসি মুখে বলেছে। তবে এই দু'টো পরিস্থিতি কোনোভাবেই একসঙ্গে নয়। কেননা সে এই দু'টো অঙ্গভঙ্গি একসাথে করতে পারে না।

লোকটি পকেটে হাত ঢুকিয়ে এলোপাথাড়ি ডকেট খুঁজতে থাকে এবং খোঁজার ফাঁকেই সে তড়িঘড়ি করে তার নাম বললো, 'রিচার্ড।' তার উচ্চারণ অস্ট্রেলিয়ানদের মতো হওয়ায় শ্যারন শুনতে পেলো 'রেচড়' এবং সে তা-ই দ্রুত টাইপ করে। তারপর সে রিচার্ডের মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে হাসি মুখে তাকায়।

একসময় লোকটি শ্যারনের কাছ থেকে রশিদ সংগ্রহ করে দরজার দিকে পা বাড়ায়। মুহূর্তেই শ্যারন মুখের হাসি মুছে ফেলে লোকটির গন্তব্যের দিকে পলকহীন দৃষ্টি আবদ্ধ করে।

'হায় ঈশ্বর, এই অফিস একটা নরকের গর্ত,' লোকটি চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধের শব্দ শুনে শ্যারন অনেকটা আপন মনে মন্তব্যের সুরে বললো। তারপর সে প্রত্যাশার চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হতাশার ভঙ্গিতে বললো, 'আমার কেন যে মরণ হয় না?'

'আমারও অবস্থা তথৈবচ,' শ্যারনের কথার সঙ্গে সহমত পোষণ করে আমি বললাম। তারপর তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বললাম, 'আমারও কেন যে মরণ হয় না?'

'আমি কিছুতেই বিশ্বেস করতে পরছি না, এখনো আমরা এখানে কেন আছি?' শ্যারন বললো। 'এরই মাঝে দু'বছর কেটে গেছে এবং এখানে আমরা বহাল তবিয়তে আছি।'

'আমারও বিশ্বেস হয় না,' কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি বললাম। 'হতাশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কেন আমাদের মৃত্যু হয় না?'

শ্যারনের গল্প করার মূল বিষয় হলো হতাশা এবং অসুস্থতা। যাদের মধ্যে এই ধরনের মানসিক উপসর্গ আছে, তাদের সঙ্গে ওর একটা আলাদা সম্পর্ক রয়েছে। অন্যেরা যেমন শব্দজট খেলা পছন্দ করে, সে-ও তেমনই হতাশা এবং রোগ-বালাইয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সময় কাটাতে পছন্দ করে। এটাই তার নিজস্বতা, বলা যায় বিশেষ গুণ।

'ক্ষুধামান্দ্য,' সকালে এক মহিলা নাটবল্টু, ওয়েদার বোর্ড নিষ্কাষণ এবং পশমি কাপড়ের বায়না দিতে এসেছিল, তাকে দেখে শ্যারন মন্তব্য করে।

শুধু তাই নয়। রীতিমতো শ্যারন আমাকে আরো বললো, ‘পাঁচ ডলারের বাজি। জানি, তুমি জানতে চাইবে আমি কেমন করে বললাম, তাই না? দেখো, মহিলার ঠোঁট শুষ্ক, কঙ্কালসার হাতের মুঠো এবং চোখের নিচে কালি পড়েছে।’

কিন্তু আমাদের এই কথাবার্তা ছিল কয়েক ঘন্টা আগে। ইতিমধ্যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করে আমরা রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছি।

বিরক্তি কাটনোর জন্য আমি একসময় প্রস্তাব করি, ‘চলো, দশ মিনিটের জন্য বাইরে গিয়ে সিগারেট ফুঁকে আসি।’

শ্যারন বিনা বাক্যে আমার প্রস্তাব লুফে নেয়। আমরা বাইরে এসে ময়লা ফেলার বিশাল পাত্রের পাশে একটা বেঞ্চের উপর বসি এবং সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করি। সেই সময় নির্মাণ শ্রমিকেরা গাড়ির পার্কিংয়ে আসা-যাওয়ার পথে আমাদের দেখে হাত নেড়ে অভিবাদন করে। ওদের চেহারা তামাটে, রোদে পোড়া তামাকের মতো গোলাপী এবং ধূসর রঙের মিশেল।

একসময় দু’ঠোঁটের মাঝে চেপে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট সরিয়ে শ্যারন জিজ্ঞেস করে, ‘ওটা কি?’

যেদিকে তাকিয়ে শ্যারন জিজ্ঞেস করে, সঙ্গে সঙ্গে আমি সেদিকেই তাকাই। টেলিফোন বুথের কাছে জীর্ণশীর্ণ রড্যাডেনড্রন গাছের ঝোপঝাড়। গাছটা মৃতপ্রায়। গেটের বাইরে যেখানে ট্রাকগুলো বাঁক নিয়ে বড় রাস্তায় যায়, সেখানে গাছটা লাগানো হয়েছিল। সেই রড্যাডেনড্রন ঝোপের ভেতর একটা মৃত প্রাণী পড়ে আছে।

‘এটা একটা মুণ্ডুহীন কুকুরের মৃত দেহ,’ উত্তেজিত হয়ে সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে শ্যারন বললো। তারপর নিজেকে খানিকটা আশ্বস্ত করে বললো, ‘চলো, খবরটা কাউকে জানাই। হায় ঈশ্বর, একটা কুকুরের মৃত দেহ। তা-ও আবার মাথা নেই।’

কাঠমিস্ত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য শ্যারন হাত নাড়ে। তার হাত নাড়ানো দেখে দোকান থেকে প্রায় সবাই ছুটে আসে। আমরা রড্যাডেনড্রন গাছের নিচে ঝোপের ভেতর পড়ে থাকা মৃত কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছি। হ্যামিশ তো প্রায় তার ফর্ক-লিফট বিশাল গাড়িটা মৃত কুকুরের উপর

দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছিল। অফিসের হিসাব-রক্ষণ বিভাগের মেয়েগুলো একঝলক দেখার জন্য বাইরে ছুটে আসে। আমরা সবাই দর্শক, তবে খুব কাছাছাছি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম না। আমরা আনুমানিক পাঁচ বা ছয় ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। কেননা মৃত প্রাণী তো মৃত প্রাণীই।

‘এটা মুণ্ডুহীন একটা কুকুরের মৃতদেহ,’ উত্তেজিত হয়ে সিগারেটে কয়েকবার ঘনঘন টান দিয়ে পুনরায় শ্যারন বললো। ‘চলো, অন্যদের খবরটা দিয়ে আসি। হায় ঈশ্বর, মাথা ছাড়া একটা মরা কুকুর।’

‘এমন পাষণ্ড কে আছে যে, কুকুরের মাথা কাটতে পারে?’ উৎসুক দর্শকেরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বলাবলি করে।

‘অসহ্য!’ কুকুরের মাথা যেখানে থাকার কথা, ভালো করে দেখার জন্য আমরা সেদিকে তাকাই। কুকুরটার গায়ের রঙ সাদা এবং পশম ছোট করে ছাটা।

লন্ড্রি দোকানের গ্লেন বললো, ‘প্রাণী সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ বিভাগের লোকজনদের খবর দেওয়া প্রয়োজন।’

বলেই সে একটা ফিতা দিয়ে মাপামাপি শুরু করে। তারপর একসময় সে আরো বললো, ‘ওরা গাড়ি নিয়ে এসে কুকুরটা তুলে নিয়ে যাবে।’

জটলা বেঁধে আমরা সেখানে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। শ্যারন এবং আমার হাতের জলন্ত সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবুও শ্যারন সিগারেট ফুঁকতে থাকে।

‘জানি না, কতক্ষণ ধরে কুকুরটা এখানে পড়ে আছে,’ শ্যারন সমবেদনার সুরে বললো।

গ্লেন বললো, ‘আমি কুকুর ভালোবাসি।’ তার কন্ঠস্বর দুঃখ-ভারাক্রান্ত শোনালো। সে ফিতা বন্ধ করে বললো, ‘আমিই কুকুর রক্ষণাবেক্ষণ করার লোক।’

প্রাণী সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ বিভাগ থেকে বলা হলো যে, ওদের লোক এক ঘন্টার মধ্যে আসবে। ইতিমধ্যে আমাদের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। শ্যারন এবং আমি অফিসের ভেতর ফিরে আসি এবং যার যার নির্ধারিত জায়গায় বসি। ঢোকার মুখেই দু'টি নীল রঙের কাউন্টার। এগুলোই আমাদের বসার জায়গা। অফিসের ভেতরে ঢোকার সময় আমরা খদ্দেরদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাই। খদ্দেররা যুবতী মেয়েদের হাসিমুখ পছন্দ করে। আমি যদিও বেশ হাসিখুশী, তবুও কেন জানি খদ্দেররা শ্যারনকে বেশি পছন্দ করে।

'আমার মনে হয়, কুকুরটা আগে মারা গেছে,' আমি বললাম। 'এবং পরে কেউ মাথাটা কেটেছে। আসলে এটাই সহজ।'

'কুকুর নিয়ে আমি ভীষণ বিরক্ত,' শ্যারন বললো।

বলেই সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

সেই সময় কাউন্টারের কাছে এসে একজন বৃদ্ধ মহিলা বললো, 'ওয়াশার।'

'চার নম্বর সারিতে,' নির্দিষ্ট জায়গার দিকে তর্জনী উঁচিয়ে হাসিমুখে শ্যারন বললো। 'হাতের বাম দিকে দস্তা এবং ডান দিকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম।'

মহিলা চলে যাওয়ার পরে শ্যারন পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। একসময় সে বললো, 'আমাদের ট্রেড অফিসের কর্মী চার্লির বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগ রয়েছে'। সে

টেবিলের উপর রাবার ব্যান্ড নাড়াচড়া বন্ধ করে। তারপর সে পানির নলের মুখ আটকানোর স্টপার থরে থরে সাজিয়ে একটা টাওয়ার বানাতে চেষ্টা করে।

'তোমাকে কে বলেছে?'

'উইলি।'

শ্যারনের তৈরি স্টপারের টাওয়ার ধসে পড়ে। টেবিলের উপর থেকে সে স্টপারগুলো দ্রুত সরিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বললো, ‘এই অফিসে কাজ করা এবং মৃতদের আবাসভূমিতে কাজ করা—দু’টো একই জিনিস। কেমন করে যে এখানে এই নিরামিষ জায়গায় আরেকটা গরমকাল কাটাবো, কিছুতেই ভেবে পাই না। মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাবো।’

‘কুকুরের মাথা কে কাটতে পারে?’ স্বগোক্তির মতো করে আমি বললাম। ‘কে এই অমানবিক কাজটা করেছে? আমি আসলে সত্যি ঘটনা জানতে চাচ্ছি।’

কুকুরের খবর শোনার পরে টেনিফোনের অপর প্রান্তে প্রাণী সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মহিলাকে ভীষণ উত্তেজিত মনে হলো।

‘কি বললেন, মরা কুকুরের মাথা নেই? তাহলে তো এটা কোনো দুর্বত্তদলের কাজ। ওরা নৃশংস কাজ করায় পটু। সত্যি, এটা চিন্তার বিষয়। মুণ্ডুহীন কুকুর মরে পড়ে আছে, এটা ভয়ানক। যাহোক, শীঘ্রই আমরা একজনকে পাঠাচ্ছি।’ মহিলা টেলিফোনের লাইন কেটে দেওয়ার সময় আমি অপর প্রান্ত থেকে শুনতে পেলাম চিৎকারের মতো উঁচু গলায় সে কাউকে ডাকছে, ‘এই মার্লিন।’

প্রাণী সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভ্যান এসে যখন পৌঁছে, তখন শ্যারন উপরের চা-ঘরে ময়লা জিনিসপত্র পরিষ্কার করছিল। অন্য কেউ করার আগে আমি তড়িঘড়ি করে তাদের স্বাগত জানানোর জন্য গাড়ী পার্কিংয়ে ছুটে যাই। ভ্যান থেকে অল্পবয়সী এক যুবতী মেয়ে বেরিয়ে আসে। ওর চুল খাটো করে কাটা এবং হাতের কব্জিতে চামড়ার বন্ধনী।

‘চলুন, মুণ্ডুহীন কুকুরটা দেখে আসি,’ তাড়া দিয়ে যুবতী মেয়েটি বললো। বলেই সে দু’হাতের তালু ঘষে এবং শব্দ করে দু’বার তুড়ি বাজায়।

আমরা রড্যাডেনড্রন গাছের দিকে হাঁটতে থাকি। তখন অপরাহ্নের শেষ বেলা এবং ব্যবসার প্রয়োজনে লোকজনের চলাফেরা স্তিমিত হয়ে এসেছে। গাড়ির পার্কিং এলাকায় হাতে গোণা কয়েকটা ট্রাক। চতুর্দিকে সূর্যের আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অস্তমিত সূর্য ধীর গতিতে নিচে নামছে এবং আস্তে আস্তে বিলবোর্ড, ওভারব্রিজ আর ট্রামের তারের নিচে হারিয়ে যাচ্ছে। গ্লেন আপন মনে ঝাড়ু দিয়ে আমাদের পেছনের উঁচুনিচু জায়গা পরিষ্কার করছে।

প্রাণী সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মেয়েটির সঙ্গে আমরাও রড্যাডেনড্রন গাছের কাছে যাই। সেখানে পৌঁছানোর পরপরই মেয়েটি সোজা হেঁটে গিয়ে খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে আশেপাশের শুকনো ডালপালা এবং মরা পাতা সরিয়ে ভলো করে মুণ্ডুহীন মরা কুকুরটাকে দেখার চেষ্টা করে। সেই সময় বাতাসের তোড়ে কয়েকটা ঝরাপাতা উড়ে এসে তার মুখে পড়ে। আমি মেয়েটির পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম। কাছাকাছি থেকে দেখার জন্য সে আমাকে কাছে ডাকে।

তার মুখের সামনে একঝাঁক মাছি ধোঁয়ার মতো উপরে উড়ে গেলো। সে থমকে দাঁড়ায়। তারপর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, ‘এদিকে আসুন। দেখে যান, কি এটা।’

আমি সন্তর্পণে পা টিপে সামনে এগিয়ে যাই এবং মুণ্ডুহীন কুকুরটার দিকে তাকাই। মরা কুকুরটার আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র, বিশেষ করে হালকা পানীয়ের দুমড়ানো-মোচড়ানো খালি ক্যান, শুকনো ঝরাপাতা, রুপালি রঙের ছেঁড়া ঠোঙা এবং ভাঙা ময়লা পাত্র, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আসলে ওটা কুকুরের মৃতদেহ নয়, বরং মগি প্রজাতির খাড়া পশমওয়ালা বিশাল দেহের একধরনের বিড়াল। ছোট মাথাটা নিচে পড়ে থাকার জন্য মনে হয়েছে

মাথা নেই। এখনো মাথায় রক্তের দাগ লেগে আছে। চোখের পাতা খোলা, তবে বিড়ালটা মৃত।

‘আহ্,’ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে। তবে সেই মুহূর্তে আমি শুধু ওটুকুই বলতে পেরেছি।

‘আমার ধারণা, আপনারা কেউ কাছাকাছি যাননি,’ যুবতী মেয়েটি বললো। প্রসঙ্গ টেনে সে আরো বললো, ‘তাই ভালো করে দেখতে পারেননি।’

‘আসলে আমরা দেখতে চাইনি,’ আমি বললাম।

বলেই আমি কয়েক কদম পেছনে সরে যাই এবং ভালো করে দেখার জন্য মাথাটা একদিকে কাত করে পুনরায় তাকাই। তবে এবার মুণ্ডুহীন বিড়াল নয়, বরং রড্যাডেনড্রন গাছের নিচে ঝোপের ভেতর পড়ে থাকা একটা সাধারণ মরা বিড়াল দেখি।

‘মরা বিড়াল আমরা যেদিক থেকে যেভাবে দেখেছি, সেভাবে দেখলে আপনিও মনে করতেন ওটা মুণ্ডুহীন একটা কুকুরের মৃতদেহ,’ যুবতী মেয়েটির কথার প্রতিবাদ করে আমি বললাম।

মহিলা রড্যাডেনড্রন গাছের নিচ থেকে খানিকটা পিছিয়ে এসে আমার মতো তাকিয়ে পুনরায় পরখ করে। কয়েক মুহূর্ত আমরা বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বললো, ‘হ্যাঁ, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। কুকুরের মাথার চেয়ে বিড়ালের মাথা ঢের ছোট। তাই আপনারা হয়তো দেখতে পাননি।’

‘হ্যাঁ, তাই,’ চটজলদি আমি মহিলার কথার সঙ্গে সহমত পোষণ করে বললাম। ‘ঠিকই বলেছেন, কুকুরের মতো লম্বা নাক বা শরীরের অন্য কিছুই আমরা দেখিনি।’

মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং দু'হাতের তালু দিয়ে মুখ মোছে। তার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে।

‘আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন না,’ যুবতী মেয়েটি বললো, ‘মুণ্ডুহীন কুকুর আমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি আসলে বলতে চাচ্ছি, মাথাবিহীন কুকুর একধরনের বর্বরতা। পুলিশকে খবর দেওয়া আমাদের উচিত, কেননা এই হত্যাকাণ্ডের আড়ালে যদি কোনো সূত্র লুকিয়ে থাকে। তবে মরা বিড়াল কখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। মরা বিড়াল কিন্তু মরা বিড়ালই। হয়তো রাস্তা পেরোনোর সময় গাড়ীর নিচে চাপা পড়েছে এবং কেউ একজন তুলে এই ঝোপের ভেতর ছুড়ে ফেলেছে। এধরনের দুর্ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। এটা খুবই মামুলি একটা ঘটনা।’

মেয়েটির কথায় সায় জানিয়ে আমি বারবার মাথা দোলাই।

‘মরা বিড়াল নিয়ে আমি অফিসে ফিরে যাচ্ছি,’ একসময় কন্ঠস্বরে বিরক্তির খানিকটা তেতো রস মিশিয়ে যুবতী মেয়েটি বললো। ‘চুল্লিতে পোড়ানোর জন্য আরেকটা বিড়াল,’ তারপর স্বগোক্তির মতো করে বলার সময় সে একটা অশ্লীল শব্দও উচ্চারণ করে।

পাশের উঁচু ব্রিজ পেরিয়ে সাঁই সাঁই করে একের পর এক ট্রাক চলে যাচ্ছে এবং একসময় দিগন্তের নীলিমায় মিশে যাচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে মেয়েটি হাতের কব্জিতে চামড়ার বন্ধনী শক্ত করে চেপে ধরে।

তারপর সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করে, 'মরা বিড়াল তুলে নেওয়ার জন্য কি আমাকে কয়েকটা প্লাস্টিকের ব্যাগ দেওয়া যাবে?'

আমি দ্রুত কয়েকটা প্লাস্টিকের ব্যাগ এনে মেয়েটিকে দিই। সাধারণ বাজার-সওদা বহন করার মতো প্লাস্টিকের ব্যাগের একপাশে আমাদের হার্ডওয়্যার দোকানের লোগোর ছাপ আছে। মেয়েটি নিচু হয়ে মরা বিড়ালের পা ধরে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে। আমি কয়েক কদম পিছিয়ে যাই। মেয়েটি বিড়ালসহ ব্যাগটা আরেকটা প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর ভরে, যেন একটা ব্যাগ ছিঁড়ে গেলেও কোনো অসুবিধে না হয়। মেয়েটি যখন দাঁড়িয়ে ব্যাগের ভেতর ভরছিল, তখন ব্যাগের মুখ খোলা ছিল এবং ব্যাগের সেই ফাঁক গলিয়ে বিড়ালের পা বের হয়েছিল। যাহোক, আমি দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি যে, মেয়েটি আগে বিড়ালের মাথা ঢুকিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি আমার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছে।

'ওটা একটা বিড়াল,' আমি অফিসে ফেরার পথে দোকানের ভেতর ঢুকে গ্লেনকে বললাম। 'ওটার মাথা ছিল, কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি।'

'ওটা বিড়াল ছিল?' গ্লেনের চোখেমুখে আনন্দ এবং কণ্ঠস্বরে স্বস্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। 'যাক, ওটা একটা বিড়াল ছিল। ভালো, খুব ভালো।' বলেই সে পুনরায় ঝাড়পোছের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমি যখন কাউন্টারে ফিরে আসি, তখন অফিস বন্ধ করার সময়। শ্যারন দিনের বিক্রির হিসেব গুণছিল। তার দু'হাতের মুঠোভর্তি দশ সেন্টের খুচরো। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে সে মাথা তুলে তাকিয়ে বললো, 'অই মেয়েটি সমকামী।'

একটু থেমে শ্যারন রীতিমতো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পুনরায় বললো, 'মেয়েটি সমকামী'—এ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে পাঁচ ডলারের বাজি ধরতে রাজি আছি। নিশ্চয় তুমি ভাবছো, আমি কেমন করে নিশ্চিত হলাম?'

লেখক পরিচিতি : নিউজিল্যান্ডের ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার এলিনর ক্যাটনের জন্ম কানাডার ওন্টারিওতে, ১৯৮৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। তিনি ক্রাইস্টচার্চের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যান্টারবেরিতে ইংরেজি সাহিত্যে এবং ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটন থেকে ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে পড়াশোনা করেছেন। তার প্রথম উপন্যাস 'দ্য রিহার্সেল' প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে। 'লুমিনারিস'তার দ্বিতীয় উপন্যাস এবং এই উপন্যাসের জন্য তিনি ২০১৩ সালে সর্বকনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে 'ম্যান বুকার' পুরস্কার লাভ করেন। 'দ্য রিহার্সেল' এবং 'লুমিনারিস' উপন্যাসের জন্য তিনি একাধিক দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান। ২০০৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'আইওয়া রাইটার্স ওয়ার্কশপ ' ফেলো নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে তাকে 'উপন্যাসের সোনালী কন্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইতিমধ্যে তার ছোটগল্প 'গ্রানটা' সহ বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। কথাসাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাকে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটন থেকে ২০১৪ সালে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি অকল্যান্ডে বসবাস করেন ।

'মৃতদের আবাসভূমি' গল্পটি এলিনর ক্যাটনের 'নেক্রোপলিস' গল্পের অনুবাদ। গল্পটি ২০০৭ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত নিউজিল্যান্ডের 'সানডে স্টার টাইমস্' পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে গল্পটি 'দ্য বেস্ট নিউজিল্যান্ড ফিকশন ৫' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে এই গল্পটি 'সানডে স্টার টাইমস্' পত্রিকা আয়োজিত প্রতিযোগিতায় উন্মুক্ত বিভাগে সেরা গল্পের পুরস্কার লাভ করে ।

নকল বিয়ে | মূল: লি রুই | অনুবাদ: ফজল হাসান

চাইনিজ আর্টওয়ার্ক

শুরু থেকেই লোকটির মনে সন্দেহ হয়েছিল যে বিয়েটা আসলে নকল। যখন প্রোডাকশনের দলনেতা, যে কি না বিয়ের জামিনদারও ছিলেন, চোখেমুখে বিকৃত হাসির রেখা ফুটিয়ে মহিলা এবং তিন বা চার বছরের একটা মেয়েকে নিয়ে উঠোনে প্রবেশ করে, তখনই লোকটি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে যে ইতিমধ্যে দলনেতা অবশ্যই মহিলার গরম হাঁড়িতে নুডুলস্ রান্না করেছে। কিন্তু তারপরেও সে তার ভাঙা মনকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে মহিলা এবং মেয়েটিকে গ্রহণ করেছে। কুড়ি বছর আগে লোকটির স্ত্রী মারা গেছে এবং বিয়ের পরে দু'মেয়েও নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই দীর্ঘ সময় একলা জীবন কাটানোর পর তার অব্যবহৃত লাঠিটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। যাহোক, যখন মহিলা এবং সে বিয়ের নিবন্ধনের কাগজে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিচ্ছিল, তখন দলনেতা খড়ের চাটাই থেকে একটুকরো খড় ছিঁড়ে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা পিঁয়াজ এবং ডিমের অংশ বের করে পুনরায় দুর্গন্ধ মুখের ভেতর ঠেলে দিয়ে পরম আয়েসে চিবুতে থাকে।

'ভালো! তৈরি মেয়েসহ আরেকটা পরিবার। তোমার মতো নিঃসঙ্গ পুরুষ, এত গরীব যে বিয়ে করার মুরোদ নেই। আর তুমি! তোমার স্বামী না-ফেরার দেশে চলে গেছে এবং তুমি ফসল তোলার সময় এখানে ভিক্ষে করতে এসেছো। যেইমাত্র মুখ হা করবে, সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে মুখের ভেতর খাবার ঢুকে যাবে। এক গরীবের সঙ্গে আরেক গরীবের মিলন— নিখুঁত যুগলবন্দী। দুনিয়ার যেকোনো জায়গায় যাওয়া যাক না কেন, সব জায়গাতে একই ছবি দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষরা মহিলাদের সঙ্গে শোয়,

মহিলারা আন্ডা-বাচ্চা জন্ম দেয় এবং পরবর্তীতে সবাই একসঙ্গে বসবাস করে। বিয়ের সময় সরকারি দলিলের জন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই। যখন বিয়ের রেশ কেটে গিয়ে সবকিছু থিতিয়ে যাবে, তখন কাউকে ডেকে বললেই হবে যে প্রমাণের জন্য একখানা সরকারি কাগজ দরকার। ’

যাহোক, বিয়ের পর নতুন দম্পতি যখন গেইট পেরিয়ে বাইরে আসছিল, তখন দলনেতা এগিয়ে এসে লোকটির কানে ফিসফিসিয়ে বললো, ‘তোমার যা ইচ্ছে, তাই তুমি করতে পারবে না । তোমার নতুন বউ কিন্তু শানচি প্রদেশের ইউলিন এলাকার হিজিয়ালিং গ্রাম থেকে এসেছে। আমি স্কুলের শিক্ষক লিউকে মানচিত্র খুঁজে গ্রামটা দেখতে বলেছি এবং সে দেখেছে। তোমার নতুন বউ কোথাও পালিয়ে যাবে না। সুতরাং আজ রাতে জোর-জবরদস্তি এমন কিছু করো না, যাতে আজই তোমার তৃষ্ণা মেটাতে হবে। এখন থেকে অনেক রাত পাবে। তখন তুমি মনের সাধ মিটিয়ে তৃষ্ণা মেটাতে পারবে। হে, হে... তোমার বউয়ের মধ্যে এমন কিছু গোপনীয় জিনিস আছে, আমি হলফ করে বলতে পারি তুমি কিছুতেই পস্তাবে না।’

আচমকা লোকটির মস্তিষ্কের ভেতর প্রচণ্ড রাগের লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠে, ‘লুচ্চা, কি এমন নিশ্চয়তা আছে যে তুমি তার গরম হাঁড়িতে নুডুলস্‌ রান্না করোনি?’ যদিও তার রাগ বিস্ফোরিত হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশ তা স্তিমিত হয়ে আসে। দলনেতা তাকে নতুন বউ যুগিয়ে দিয়েছে। অথচ বিনিময়ে তাকে কিছুই দেয়নি। হয়তো দলনেতা মহিলার গরম হাঁড়িতে নুডুলস্‌ রান্না করেনি, কিন্তু তার বউ যে আনকোরা— নিশ্চয়তা কী? রাগ করার জন্য সে আপন মনে হাসলো। তার মনে হলো, সে যেন একটা বুড়া ব্যাঙ, রাজহংসীর নরম মাংসের লোভে ছুটে চলেছে।

লোকটি ঘরে পৌঁছানোর পরপরই কোথায় চাল, আটা, তেল ও নুন আছে— তা মহিলাকে দেখিয়ে দিয়েছে। এছাড়া উনুনে কিভাবে আগুন জ্বালাতে হয়, তা-ও সে শিখিয়ে দিয়েছে। একসময় সে কাঁধের উপর একটা শক্ত লাঠির দু'মাথায় কয়েকটা বালতি ঝুলিয়ে পানি এনে বড় বড় পাত্র পূর্ণ করে রাখে। তারপর সে একটা কুঠার নিয়ে কাঠ কাটতে যায়। গত কুড়ি বছর সে প্রচুর পরিমাণে পানি এনেছে এবং বন-জঙ্গলে কাঠ কেটেছে। কিন্তু মেয়েদের বিয়ের পর সে এসব কাজে সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তবে আজকের কথা আলাদা। হঠাৎ পেশিতে শক্তির জোয়ার এসে তার সমস্ত শরীর চাঙ্গা করে তুলেছে। দলনেতার সঙ্গে গোগ্রাসে মদ্যপান করার কারণে তার কন্ঠনালী এবং বুকের ভেতর জ্বালাপোড়া করছে। যে কুঠার দিয়ে সে পাহাড়ের গায়ে সজোরে আঘাত করে মাটি পর্যন্ত কাপিয়ে তুলতে পারে, সেই ধারালো চকচকে কুঠারের প্রতিটি কোপে সে গাছের বাকল কেটে ভেতর থেকে সাদা কাঠের গুঁড়ো বের করে আনে। তার আশেপাশে সাদা কাঠের গুঁড়ো মনে হয় যেন কেউ শুভ্র তুষার ছড়িয়ে দিয়েছে।

সে যখন কাঠ কাটছিল, তখন মহিলা এসে নিচু হয়ে কাটা কাঠ তুলছিল। সেই সময় মহিলার থলথলে বুকের দিকে চকিতে লোকটির দৃষ্টি চলে যায়। লোকটির কাছে মনে হলো মহিলা যেন তার বুকের মধ্যে জামার ভেতর এক জোড়া রাজহংসী লুকিয়ে রেখেছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে হাসতে থাকে এবং মনে মনে ভাবে— কয়েকজন যাজক ওই সুন্দর মাংসপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে অনায়াসে ভারসাম্য রাখতে পারবে।

সত্যি বলতে কি, লোকটি গতকালই মহিলাকে প্রথম দেখেছে। যখন শুনেছে যে গ্রাম থেকে একজন মহিলা ভিক্ষা করতে এসেছে এবং দলনেতার বাড়িতে রাত্রি যাপন করবে, তখন সে মহিলাকে দেখতে গিয়েছিল। তবে দেখা করার সময় সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে মহিলা একজন স্বামীর খোঁজেও এসেছে। যাহোক, গতকাল তাকে দেখা আর আজকের দেখার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। তখন মহিলাকে সে অন্য একজনের স্ত্রী হিসেবে দেখেছে। কিন্তু আজ সেই মহিলা তার নিজের বউ। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময় তার দৃষ্টি মহিলার ওপর গিয়ে স্থির হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তার অবাধ্য চোখের তারা মৃদু আলোর ঝলকানিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে মহিলার শরীরের উপরে-নিচে, সামনে-পেছনে এবং মাথা থেকে পা অবধি কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে আনে। তার তীক্ষ্ণ চাহনি দেখে মহিলা অস্বস্তিবোধ করে এবং নিঃশব্দে একাগ্রমনে হাতের কাজ করতে থাকে। তবে মাঝে মাঝে সে চোখ তুলে লোকটিকে পরখ করার চেষ্টা করে এবং চোখাচোখির ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে। মহিলার মৌনতাকে বিদীর্ণ করে লোকটির অন্তর্দৃষ্টি সব কিছুই অবলোকন করতে পারে। লোকটি ভাবে— মহিলা এমনভাবে শান্ত এবং চুপচাপ না থাকলেই পারে। মহিলার এই অস্বাভাবিক মৌনতার জন্য সে বুকের ভেতর একধরনের উষ্ণতার অলৌকিক সংঘর্ষ উপলব্ধি করে। কিছুতেই সে ধারণা করতে পারে না যে, মহিলা আদৌ তার ক্ষুধা নিবারণ করতে সক্ষম হবে কি না। তবে সে অপেরায় দেখেছে যে তিনজন মানুষ—যারা আগে কেউ কাউকে কখনো দেখেনি— দিব্যি ঘর-সংসার করে যাচ্ছে। কিন্তু এটা তো আর অপেরা নয়। তাকে কাছে পাওয়ার অনেক আগেই মহিলা জেনে গেছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কী সব ঘটনা ঘটে। মহিলার জীবনে শুধু আট বা দশ বারই ঘটনা ঘটেনি, তার তিন-চার বছরের একটা সন্তানও আছে। যাহোক, লোকটি নিজেকেই নিজে বললো— কপর্দহীন এবং শুকনো লাঠির মালিক, এসব নিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? প্রচুর পরিমাণে সুরা পান করার জন্য এখনো তার বুকের ভেতর জ্বালাপোড়া করছে। তবুও সে শক্ত হাতে কুঠার ধরেছে। আত্ম-গরিমায় সে কিছুতেই একজন ভিক্ষুক মহিলার সামনে নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ করতে পারে না। যেইমাত্র সে দেখতে পেল মহিলা দরজা পেরিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করেছে, তখন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহিলার উঁচু খোলা বুক— যেখানে দাঁড়িয়ে অনায়াসে যাজকরা ভারসাম্য রাখতে পারবে। তার ভীষণ হাসি পায়। হেঁয়ালি করে সে নিজেকে বললো, তুমি একটা আস্ত বোকা। এখনো ভাবছো, শিকার কি মোটা, না চিকন। যে জিনিসে ক্ষুধা মেটে, সেটাই সুস্বাদু খাবার।

দুপুরের খাবার খাওয়ার পরও বাতি জ্বলছে। বাতির সেই মৃদু আলোয় মেঝের উপর বিছানো চাটাই এবং দেওয়ালের গায়ে তিনজন মানুষের ছায়া উপরে-নিচে ওঠানামা করছে । যাহোক, সন্ধ্যের অনেক আগেই মহিলা ঘরবাড়ি পরিষ্কার করেছে। উনুনে তখনও কয়েকটা কয়লার টুকরা জ্বলছিল। মহিলা একপাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগুনের শিখায় এবং বাতির আলোয় তার চোখমুখ রীতিমত চিকচিক করছে। কিন্তু লোকটির কোনো ভাবান্তর নেই।

মহিলাকে যা জিজ্ঞেস করার, কিংবা তার সাথে যেসব কথা বলবার ছিল— ইতোমধ্যে লোকটি তা জিজ্ঞেস করেছে, এমনকি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে আমতা আমতা করে যা বলতে চেয়েছিল, তাও বলেছে।

মহিলা অপেক্ষার প্রহর গোণে । চুলার আগুনের তাপ এসে ঠিকরে পড়েছে তার চোখেমুখে। তবে সেই চোখমুখে অলৌকিক অদৃষ্টের একধরনের চাপা ভাব ফুটে আছে।

মহিলা এবং লোকটির মধ্যকার টানাপোড়েন নিয়ে বাচ্চা মেয়েটি মোটেও চিন্তিত নয়। লোকটির একটা বাঁশি নিয়ে মেয়েটি আপনমনে নাড়াচাড়া করে। মাঝেমাঝে তার দু'ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে দু' একটা শব্দ বা বাক্য বেরিয়ে আসে।

ক্রমশ লোকটির মনের আকাশে অধৈর্য্য এবং বিরক্তির কালো মেঘ জমা হতে থাকে। মহিলার নির্লিপ্ত চাহনি তাকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে। একসময় সে চট করে মাথা থেকে টুপি খোলে। তারপর টুপিটা মহিলার দিকে এগিয়ে ধরে আদেশের সুরে বললো— 'এই নাও, এটা ধুয়ে দাও।'

হাত বাড়িয়ে মহিলা হাসি মুখে টুপিটা ধরতে যায়। অমনি লোকটি মহিলার কাঁধে ধরে নিজের দিকে সজোরে হেঁচকা টান দেয়।

'মা, বন্দুক!' দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা বন্দুকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বাচ্চা মেয়েটি আর্তচিৎকার করে ওঠে।

মহিলা কোনো প্রতিবাদ করেনি, এমনকি প্রতিরোধও গড়ে তোলেনি। সে শুধু দৃষ্টি আনত করে ফিসফিসিয়ে বললো— 'মেয়েটি ঘুমানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

'না, পাশের ঘর ফাঁকা আছে'— উত্তেজনায় লোকটি কাঁপতে থাকে। সে জানে না, কেন তার সমস্ত শরীর এমন করে কাঁপছে। তবে সে জানে, গতরাতে দলনেতা মহিলার গরম হাঁড়িতে নুডুলস্ রান্না করেছে। মনে মনে ভাবে, এখন তাকে নেতার উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে হবে। আর মহিলা কি না বলে— অপেক্ষা করুন!

মহিলা কোনো কথা না বলে একটা বালিশের উপর আলতো করে মেয়েটির মাথা রাখে। তারপর পকেট থেকে সে একটা লজেন্স বের করে মেয়েটির মুখে পুরে দেয়।

লোকটি বাতি না জ্বালিয়ে আহত শিকারী জন্তুর মতো মহিলাকে টেনে-হিঁচড়ে মাদুরের উপর এনে শোয়ায়। কুড়ি বছর ধরে লোকটির ভেতর সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো জমে থাকা কামনার জ্বলন্ত লাভা একসময় গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে বিস্ফোরিত হয়। তারপর আদিম আঁধারে দু'টো শরীর এক হয়ে যায়, যে আঁধারে একজন আরেকজনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করতে পারে, কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পারে না, এমনকি কে পুরুষ বা কে রমণী— তাও কিছুতেই বোঝা যায় না।

একটা ইঁদুর খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে। হঠাৎ ইঁদুরটি পা ফসকে লোকটির ও মহিলার উত্তপ্ত শরীরের ওপর পড়ে এবং ভয় পেয়ে নিমিষেই দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর চাটাইয়ের ওপর ইঁদুরের নখের আঁচড়ের খসখস আওয়াজ শোনা যায়।

প্রথম দিন এভাবে কেটে যায়।

দ্বিতীয় দিন এভাবেই কেটে যায়।

তৃতীয় দিনও এভাবেই কেটে যায়।

লোকটি তার পাগলামির কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার এমন কোনো শক্তি বা সামর্থ নেই, যা দিয়ে সে নিজের অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসা আদিম পাগলামিকে প্রতিহত করতে পারে। তবে সে ভাবে, কাছে পাওয়ার আগের রাতে কেমন করে দলনেতা মহিলার গরম হাঁড়িতে নুডুলস্ রান্না করেছে। ভাবনাটা একটা তেজি লোমশ দৈত্যের মতো তার মস্তিস্কের মাঝখানে দশ বারের বেশি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে।

যাহোক, ধীরে ধীরে লোকটির পাগলামির পারদ নিচে নেমে আসে। তখন সে মহিলার তুলতুলে নরম উষ্ণ বুকের মাঝে মুখ গুঁজে নিশ্চুপ শুয়ে থাকে। একসময় যখন পাগলামি পুরোপুরি উবে যায়, তখন আবার তার দেহের ভেতর আত্মসম্মান এবং বিশ্বাস ফিরে আসে। একদিন সকালের নাস্তা খাওয়ার পর

সে অপেক্ষা করে কখন মহিলা হাতের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে। একসময় লোকটি বুকপকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বললো— 'এখানে।'

টাকা না নিয়ে মহিলা ফাঁকা দৃষ্টিতে লোকটির দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

'কম হয়েছে ? এই নাও, আরো দশ টাকা।'

তখনো মহিলা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করো না। ইতোমধ্যে তুমি থাকার জন্য ঘর পেয়েছ এবং একজন জীবন্ত পুরুষ মানুষও পেয়েছো। এছাড়া তোমার বাল-বাচ্চা আছে, যারা গ্রামের বাড়িতে অধীর আগ্রহে তোমার ফেরার আশায় পথ চেয়ে আছে।'

'না, না ...'— মহিলা দু'পাশে মাথা দুলিয়ে সতর্ক হয়ে যায়।

'গোল্লায় যাও। অন্য কাউকে বোকা বানাও।' লোকটির সারা শরীরে রাগে টগবগ করতে থাকে। 'এখানে তুমি তিন মাস থাকবে, পাঁচ মাস, খুব বেশি হলে এক বছর। তারপর একদিন যখন সুযোগ পাবে, সেদিন সবকিছু ফেলে চলে যাবে। তখন আমি আবার একা হয়ে যাবো। কি, ঠিক বলিনি? তোমার কি কখনো মনে হয়েছে, আমি কিসের পেছনে ছুটছি? কোনোকিছু ছাড়াই কি আমি তোমাদের দু'জনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছি? তুমি যদি ভাবো আমার কোনো চাহিদা নেই, তাহলে এক্ষুণি কেটে পড়ো। আমি একজন রক্ত-মাংসের সুস্থ-সবল পুরুষ মানুষ। বাঁদর-নাচের মতো আমাকে কেউ নাচাতে পারবে না।'

লোকটির কথা শুনে মহিলার চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে।

যাহোক, কোনো কারণে মহিলার অশ্রুভেজা চোখ দেখার পর লোকটি তার মনের ভেতরে একধরনের আত্মতৃপ্তির অলৌকিক হালকা পরশ অনুভব করে। সে জানে, এই শান্ত-শিষ্ট মহিলার মৌনতাকে না ভাঙার জন্য গত কয়েকদিন ধরে নিজেকে বোকা ভাবছে। সেই সময় চারদিক থেকে ক্রমশ হতাশা এসে তাকে ঘিরে ধরেছে। সে তখন আকাশের সিঁড়ি বেয়ে রাতের অন্ধকার নেমে আসার দীর্ঘ অপেক্ষায় থেকেছে। যখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার জমাট বেঁধে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে, তখনই উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য তার দুরন্ত মন আনচান করেছে। কিন্তু এখন সবকিছুই স্বাভাবিক। একসময় সে সাদা কাগজে ঢাকা জানালার ফাঁক গলিয়ে তাকিয়ে দেখে মহিলা তার জিম্মায় বহাল তবিয়তে আছে।

আচমকা মহিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললো, 'বড়ভাই ...'

‘তাহলে এখন তুমি আমাকে বড়ভাই বলে সম্বোধন করছো?’— লোকটি বুকের গভীর থেকে জোর করে ঠেলে একখণ্ড শুকনো হাসি চোখেমুখে ফুটিয়ে ভ্রুকুটি করে বললো। তারপর সে সামান্য নড়েচড়ে বসলো। ভাবটা এমন যেন কিছুই হয়নি।

‘বড়ভাই, এ বছর আমাদের গ্রামে ভালো ফসল হয়নি। আমাদের কোনো বিকল্প পথ জানা নেই। আমি জানি, আপনার সঙ্গে আমি ঠিক কাজ করিনি। আপনি এখানে যদি আমাদের আশ্রয় দিতে না চান, তাহলে আমরা চলে যাবো। যাহোক, আপনার লেপের কভার খুলে আমি ধুয়ে দিয়েছি। কিন্তু ছেঁড়াটুকু সেলাই করার সময় পাইনি। ওটা সেলাই করেই চলে যাবো।’

মহিলার আর্তি শুনে চকিতে লোকটির চোখের পাতা ভিজে ওঠে এবং তা সংবরণ করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তিন বছর আগে দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের সময় শেষবারের মতো তার লেপের কভার ধোওয়া হয়েছিল। গত কয়েকদিন ধরে মহিলা ঘরের ভেতর এবং বাইরের গেরস্থালির সমস্ত কাজ করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটি ইতোমধ্যে মহিলা এবং শিশু মেয়েটিকে এ বাড়িতেই রাখার কথা ভেবেছে। সে আরো ভেবেছে, মহিলাকে নিয়ে হেজিয়ালিং যাবে এবং বিয়ের সনদপত্র নিয়ে আসবে। যদিও মহিলা খুবই সাদাসিধা এবং সরল মনের মানুষ, তবুও নকল বিয়ে সবসময়ই নকল। তবে তার রাগের মূল কারণ হলো, মহিলা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিপুণভাবে তার সামনে মিথ্যাকে সত্য বলে উপস্থাপন করেছে, যা তার নরম হৃদয়কে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে।

যাহোক, শেষ মুহূর্তে মহিলার কান্নাভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে লোকটির পুরুষোচিত কঠিন হৃদয়ে বরফ গলতে শুরু করে।

‘তুমি যদি এখানে থাকতে চাও, থাকতে পারো। আর যদি চলে যেতে চাও, তাও করতে পারো। তবে তুমি কি করবে, তা আমি বলতে পরবো না।’

লোকটির সামনে মহিলা নতজানু হয়ে বসে আছে। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে সে বললো— ‘বড়ভাই, মেয়েটির বাবা এবং আমি কোনোদিনও আপনার কথা ভুলবো না।’

মহিলার কথা লোকটির কানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তার মেজাজ পুনরায় গরম হয়ে যায় এবং সে রীতমত রাগে-ক্ষোভে জ্বলতে থাকে। ‘তুমি ফিরে যাও এবং তোমার অপদার্থ স্বামীকে বলো যে আমার বন্দুকের গুলি তার কাছে পৌঁছাবে না। তবে গুলি যদি ওখানে পৌঁছে, তাহলে আমি তাকেই প্রথম খুন করবো। বদমাশ কাঁহাকার!’

‘বড়ভাই, সে একজন নিরীহ গরীব মানুষ। আজই আমি আপনার লেপের কভার সেলাই করবো এবং আগামীকাল আমরা চলে যাবো।’

বড়দের মধ্যে কী নিয়ে এত কিছু ঘটছে, তা বাচ্চা মেয়েটির বোধগম্য নয়। সে শুধু মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হেঁচকি তুলে অনবরত কাঁদতে থাকে।

লোকটি ভেবেছিল, মহিলা এবং বাচ্চা মেয়েটি হয়তো কোনো অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের অবতারণা করবে। ঠিক তাই। এখন সেই দৃশ্যই ঘটছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে, মহিলা এবং সে যখন বিয়ের কাগজে টিপসই দিচ্ছিল, তখন তার মনে হয়েছিল মহিলা, যে কিনা শুরুতেই তার স্ত্রী হতে পারতো, এতদিন অন্যের ঘরণী হয়ে থেকেছে। ক্রমশ ভাবনাটা দাবানলের মতো তার হৃদপিণ্ড থেকে মস্তিস্কের ভেতর এসে জমা হতে থাকে। যেভাবে শুরু হয়েছিল, সেভাবেই স্বামী-স্ত্রীর পুরো নাটকটা অত্যন্ত অল্প সময়ে শেষ হয়ে যায়।

সেই রাতে খাওয়ার পর আরেকবার বাতি জ্বালানোর সময় হয়। কিন্তু লোকটি এবং মহিলা যে যার জায়গায় অনড় থাকে। ইতোমধ্যে বাচ্চা মেয়েটি চাটাইয়ের এক কোণে জুবুথুবু হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মহিলা লোকটির জন্য অপেক্ষা করছে।

লোকটি তখন ধূমপান করছে। চরম বিরক্তিতে তার মন বিষিয়ে আছে। জানা সত্ত্বেও সে এই রাত অযথা কিছুতেই ভেস্তে যেতে দেবে না। তার কোনো ধারণা নেই যে আজ রাতের এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেলে আগামীতে তাকে আরো কত বছর পুনরায় খরার রাত কাটাতে হবে। একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে সে ছাইদানি ভরিয়ে ফেলেছে। একসময় ভরা ছাইদানির ছাইগুলো সে চাটাইয়ের একপাশে জমা করে। তার মনের ভেতর নিরাশার কালো ছায়া দীর্ঘ হতে থাকে। যা শুরু থেকেই নকল ছিল, সে এখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু গত কুড়ি বছর ধরে জমে থাকা নিসঃঙ্গতা তাকে সীমাহীন যন্ত্রণা দিচ্ছে। এই যন্ত্রণার পরিধি যতই বড় হচ্ছে, ততই তার উত্তেজনা এবং বিদ্বেষ বেড়ে চলেছে। লোকটি জানে না, এই উত্তেজনা এবং বিদ্বেষ থেকে কিভাবে সে পরিত্রাণ পাবে। মহিলা, যে আগামীকাল ভোরেই চলে যাবে, তার জন্য অপেক্ষা করছে। অকস্মাৎ লোকটি তার সুন্দর পাইপটা হেঁচকা টানে তুলে নিয়ে চুলোর গায়ে সজোরে আঘাত করে এবং চতুর্দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে আদেশের ভঙ্গিতে বললো— ‘ঘুমোতে যাও।’

মহিলা জামার বোতাম খোলে এবং মলিন জামার ফাঁক গলিয়ে তার বুকের সমস্তটা বেরিয়ে আসে। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির মস্তিস্কের ভেতর বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায়। উত্তেজিত গলায় সে জিজ্ঞেস করে, 'বদমাশ দলনেতা কি তোমার গরম হাঁড়িতে নুডুলস্ রান্না করেছে?'

মহিলা অপ্রতিভ হয়ে মাথা নিচু করে এবং খোলা বুক ঢাকার চেষ্টা করে।

'সত্যি করে বলো! সে কি তোমাকে স্পর্শ করেছে, নাকি করেনি?'

এক মুহূর্তের জন্য মহিলা খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলনায় দোলে। তারপর অনিচ্ছায় সে সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা দোলায়।

'ওই বদমাশটা এখন আমাকে তার উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়াতে চায়। ওর চৌদ্দগোষ্ঠী খাবে।'

একসময় লোকটির মনের ভেতর প্রবল ঝড় থেমে আসে এবং আস্তে আস্তে তার মস্তিষ্কের সমস্ত বন্ধ দরজা খুলতে থাকে। আচমকা সে সামনের দিকে ঝুঁকে মহিলাকে ধরতে যায়। ঘটনার ক্রুদ্ধতায় তার চোখের তারা জ্বলজ্বল করে এবং মুখের উপর পাশবিকতার হিংস্র ছবি ফুটে ওঠে। এই মহিলার জন্যই এখন তার জীবন আরো বেশি কঠোর হয়ে যাচ্ছে। আকস্মিক বিক্ষুব্ধ আবেগ এবং মহিলাকে কাছে পাওয়ার তীব্র বাসনা তাকে চতুর্দিক থেকে শক্ত করে চেপে ধরে। অবশেষে সে মহিলার ভেতর একদলা উষ্ণ তরল পদার্থ উৎক্ষেপণ করে।

একসময় মহিলা নিঃশব্দে নেতিয়ে পড়া লোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। তার উত্তপ্ত নরম বুক দ্রুত উঠানামা করতে থাকে। পিদিমের টিমটিমে অস্পষ্ট আলোয় ঘরের অন্ধকার কিছুতেই দূর হয় না।

লোকটি খসখসে তালু দিয়ে মহিলার চোখের উষ্ণ পানি মুছে দেয়।

লেখক পরিচিতি: সমকালীন চীনা কথাসাহিত্যের অন্যতম 'শেকড়-সন্ধানী' লেখক লি রুই। ১৯৪৯ সালে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে জন্মগ্রহণ। ১৯৭৪ সালে সাহিত্য জগতে এসে এ পর্যন্ত পাঁচটি উপন্যাস, একাধিক নভেলা এবং অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করেন। ইংরেজিতে অনূদিত উপন্যাসের মধ্যে 'সিলভার সিটি' (১৯৯৭) এবং 'ট্রীজ উইথআউট উইন্ড' বা 'নো-উইন্ড ট্রী' (২০১২) উল্লেখযোগ্য। চীনের রাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে 'সিলভার সিটি' উপন্যাসটি। তবে 'থিক্ আর্থ' ছোটগল্প সংকলনের জন্যই তিনি পাঠকমহলে সুপরিচিত। এই গল্পসংকলনের জন্য 'চায়না টাইমস' সাহিত্য পুরস্কার এবং অষ্টম 'ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন তিনি। এছাড়াও সাহিত্য কর্মে বিশেষ অবদানের জন্য অর্জন করেন ফ্রান্সের শিল্প-সাহিত্যের পুরস্কার। তার লেখা গল্প এবং উপন্যাস বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়— বিশেষ করে ইংরেজি, সুইডিশ, ফরাসী, জাপানী, জার্মান এবং ডাচ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

গল্পসূত্র: 'নকল বিয়ে' লি রুইয়ের ইংরেজিতে 'শ্যাম্ ম্যারেজ' গল্পের অনুবাদ। চীনা ভাষা থেকে গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন উইলিয়াম শ্যাফার এবং ফেংহুয়া ওয়াং। গল্পটি লেখকের 'থিক্ আর্থ' গল্পসংকলনে অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে বিখ্যাত এই গল্পটি হাওয়ার্ড গোল্ডব্লাট সম্পাদিত 'চেয়ারম্যান মাও উড নট বী সারপ্রাইজড়' গল্পসংকলনে সন্নিবেশিত করা হয়। লেখকের বাস্তব জীবনে দেখা একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে গল্পটি লিখিত।

অতিপ্রাকৃত

চিনুয়া আচেবে'র গল্প
অনুবাদ: ফজল হাসান

জুলিয়াস ওবি টাইপ রাইটারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার টেবিলের ওপর মাথা রেখে হেলদোল শরীরের বস নাক ডেকে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। সবুজ রঙের উর্দি পরে দারোয়ানও তার আস্তানায় বসে গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত। গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে একজন খদ্দের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকেনি। বিশাল দাঁড়িপাল্লার একপাশে একটা খালি ঝুড়ি পড়ে আছে। মেশিনের চতুর্দিকে ধুলোবালির সঙ্গে গাঢ় রঙের কয়েকটি পামের বীচি ছড়িয়ে আছে। চারপাশে শুধু মাছি পুরো উদ্দোমে ভনভন করে ওড়াউড়ি করছে।

জুলিয়াস জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে দাঁড়ালে নাইজার নদীর পাড়ের বড় বাজার স্পষ্ট দেখা যায়। আগে এই বাজার ইবোদের অন্যান্য বাজারের মতই সপ্তাহের চারদিন বসত। তবে শ্বেত মানুষের আগমন এবং উমুরুতে বিশাল পাম তেলের নদী-বন্দর করার পর থেকে প্রতিদিনই বসে। যাহোক, তা সত্ত্বেও এখনও আদি নোকো দিবসে বাজারের ব্যস্ততার মতই মানুষের আনাগোনা অব্যহত রয়েছে। এলাকার মানুষের কাছে এই নোকো দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। কেননা মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, এই দিনে ঈশ্বর তার দৈবানুগ্রহ বর্ষণ করে। এলাকার মানুষের মুখে কথিত আছে যে, এই দিনে ঈশ্বর একজন বৃদ্ধ মহিলার বেশে কাকভোরে বাজারের মাঝখানে আগমন করে এবং দূরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সে তার অলৌকিক পাখা দিয়ে চারদিকে—সামনে, পেছনে, ডানে এবং বামে—বাতাস করে। তখন চতুর্দিক থেকে দলে দলে পুরুষ এবং মহিলারা তাদের উৎপাদিত শস্য এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী, যেমন পামের বীচি, তেল, কোলা বাদাম, কাসাভা, মাদুর, ঝুড়ি, মাটির পাত্র ইত্যাদি নিয়ে

বাজারে এসে হাজির হয়। দিনের শেষে বাড়ি ফেরার সময় তারা বিভিন্ন রঙের কাপড়চোপড়, ধোঁয়ায় পোড়া মাছ, লোহার হাঁড়িপাতিল এবং থালাবাসন কিনে নিয়ে যায়।

বিশাল নদীর অপর পাড়ের মানুষেরা নৌকা দিয়ে মিষ্টি আলু এবং নানা ধরনের মাছ নিয়ে আসে। মাঝেমাঝে এসব নৌকা এত বড় যে, তাতে করে এক ডজন বা তারচেয়েও বেশি লোক অনায়াসে আসতে পারে। আবার অনেক সময় নৌকা খুবই ছোট থাকে। সেসব ডিঙ্গি নৌকায় করে শুধু স্বামী-স্ত্রীরা আসে। নদীর পাড়ে তারা নৌকা বেঁধে মাছ নিয়ে বাজারে যায় এবং বেশি দর-কষাকষি না করে মাছ বিক্রি করে। তারপর মহিলারা বাজারের ভেতর ঢোকে এবং তেল-নুন ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীর জিনিসপত্র ক্রয় করে। তবে তারা সুযোগ মত সস্তায় কাপড়চোপড়ও কেনে। এছাড়া ছেলেমেয়েদের জন্য শিমের কেক অথবা ইগারা এবং মহিলাদের তৈরি আকারা ও মাই-মাই ক্রয় করে। সারাদিন বেচা-কেনার পর তারা সূর্যাস্তের সময় বাড়ির দিকে রওনা হয়। তখন গোধূলির রক্তিম আভায় নদীর পানি চিকমিক করে। ক্রমশ তাদের ডিঙ্গি নৌকা জনারণ্যের আড়ালে হারিয়ে যেতে থাকে। একসময় অন্ধকার আকাশ ফুঁড়ে একটুকরো সোনালী চাঁদ উদ্ভাসিত হয়। ফিরতি পথে সেই আবছা আলো-আঁধারিতে দু'টো অস্পষ্ট শরীর নৌকা বেয়ে চলে যায়।

জুলিয়াস ওবি উমুরুর আদিবাসি নয়। সে কুড়ি মাইল বা তারচেয়ে বেশি দূরের কোনও এক গ্রাম থেকে এসেছে। কিন্তু ১৯২০ সালে সে যখন মিশনারি স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন সে এক নাইজার কোম্পানিতে কেরানির চাকরি নিয়ে উমুরুতে আসে। এই কোম্পানি পাম তেলের ব্যবসা করে। উমুরুর বিখ্যাত বাজারের পেছনেই কোম্পানির অফিস। তাই কাজে যোগ দেওয়ার দুই বা তিন সপ্তাহের মধ্যেই সে বাজারের তুমুল হৈচৈ এবং কোলাহলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। অনেক সময় প্রধান কেরানি যখন অফিসে অনুপস্থিত বা উপস্থিত থেকেও ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের জনমানুষের কর্মচঞ্চলতা দেখে। আপনমনে সে ভাবে, গতকাল বাজারে এত মানুষ ছিল না, তবুও সেখানে একধরনের গমগম ভাব ছিল। তাহলে নিশ্চয়ই দুনিয়ায় আরও অনেক মানুষ আছে। অবশ্য লোকে বলাবলি করে, যারা বাজারে আসে, তারা সবাই আসল মানুষ নয়। জ্যানেটের মা-ও এমন ধরনের কথা বলেছেন।

'তুমি যে বাজারের ভীড় ঠেলে অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়েদের যাতয়াত করতে দেখেছো, ওরা সবাই রক্ত-মাংসের আসল মেয়ে নয়। ওরা নদী থেকে আগত ম্যামি-ওয়োটা'—জ্যানেটের মা বললেন।

'কিভাবে ওদের চেনা যায়?' জুলিয়াস জিজ্ঞেস করে। কেননা পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা এ ধরনের অযৌক্তিক এবং অন্ধবিশ্বাস থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু তার অগ্রসর মানসিকতার প্রকাশ

সে করেনি, বরং সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছে। সে ভালো করেই জানে, এসব কুসংস্কার নিয়ে মায়েদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করা মোটেও সমুচিত নয়।

'সব সময় তুমি বুঝতে পারবে'—জ্যানেটের মা ব্যাখ্যা করে বলেন—'কেননা ওরা এত বেশি সুন্দরী যে, এই তামাম দুনিয়ার কোনও রক্ত-মাংসের মেয়েদের পক্ষে অতটা সুন্দরী হওয়া মোটেও সম্ভব নয়। এছাড়া তুমি যদি সরাসরি ওদের দিকে তাকাও, তাহলে দেখবে ওরা পলকেই ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেছে।'

এসব অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় জুলিয়াস জানালার কাছে এসে বাইরের বিরান বাজারের দিকে অপলক তাকিয়ে ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু কে আছে যে ভাবতে পারে, কোলাহলপূর্ণ বাজার এখন এমনভাবে জনশূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করবে? একমাত্র কারণ হলো কিটিকপা বা জলবসন্ত।

উমুরু যখন ছোট্ট একটা গ্রাম ছিল, তখন সেখানে হাতেগোণা কয়েকজন মানুষের বসতি ছিল। কিন্তু এখন উমুরু একটা বিশাল এবং কর্মচঞ্চল নদী-বন্দর শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। একসময় কিটিকপা আসে। ইবো নৃ-গোষ্ঠী মানুষের কাছে কিটিকপার চেয়ে ভয়াবহ আর কোনও অসুখ নেই। এই অসুখকে তারা দেবতার অভিশাপ হিসেবে দেখে। যারা এই রোগে আক্রান্ত হয়, তারা শুধু অভিশপ্তই নয়, বরং সমাজের চোখে অপমানিত হিসেবে পরিগণিত হয়। একই এলাকার মানুষের মধ্যে এবং ধীরে ধীরে এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের লোকদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। লোকেরা যখন বলে, অই গ্রামে কিটিকপা এসেছে, তখন আশপাশের গ্রামের লোকজন সেই রোগাক্রান্ত গ্রামের লোকজনের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

জুলিয়াস খুবই চিন্তিত। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে জ্যানেটের সঙ্গে তার কোনও দেখা-সাক্ষাত নেই, এমনকি যোগাযোগও নেই। জ্যানেট তার বাগদত্তা এবং শীঘ্রই তারা বিয়ে পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছে। জ্যানেটের মা সাবধান করে বারবার জুলিয়াসকে বলেছে যে, যতদিন না পর্যন্ত জেহোবাহ্‌র অলৌকিক শক্তিতে এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, ততদিন সে যেন কিছুতেই জ্যানেটকে দেখতে না আসে। জ্যানেটের মা একজন গোঁড়া খ্রিস্টান। একটি মাত্র কারণে তিনি তার মেয়েকে জুলিয়াসের সঙ্গে বিয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন, তা হলো জুলিয়াস গির্জার সঙ্গীত দলের সঙ্গে গান পরিবেশন করে।

‘তুমি ঘরেই থাকবে’—সতর্ক করার ভঙ্গিতে জ্যানেটের মা বললেন। তারপর একটু থেমে তিনি রাস্তার উল্টোদিকের একটা বাড়ির দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, ‘তুমি জানো না, রাস্তায় কখন কার সঙ্গে তোমার মোলাকাত হবে। অই বাড়ির লোকজন এই রোগে আক্রান্ত।’

জুলিয়াসকে বিদায় জানানোর জন্য জ্যানেট খানিকটা পথ একসঙ্গে হাঁটে। তারপর একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে বিদায় জানানোর অন্তিম মুহূর্তে তারা পরস্পর করমর্দন করে, যা সামাজিকতার দিক থেকে খুবই বেমানান।

জ্যানেটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জুলিয়াস সরাসরি বাড়ি ফিরে আসেনি। সে নদীর ধারে গিয়ে আনমনে এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করেছে। হয়ত সে অনেকক্ষণ হেঁটেছে। কেননা এসময় সে রাতের অশুভ শক্তির একওয়ে বা কাঠের বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ি ফিরে আসে। সেই অশরীরী শক্তি পুরো শহরের একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাওয়ার আগে বাড়ি ফেরার জন্য তার হাতে মাত্র আধ ঘন্টার মত সময় ছিল।

তড়িঘড়ি করে বাড়ি ফেরার সময় জুলিয়াসের পায়ের নিচে কী একটা জিনিস ভেঙে গিয়ে একধরনের পিচ্ছিল পদার্থ রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়ে। সে থমকে দাঁড়ায় এবং সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে ফুটপাথের দিকে তাকায়। তখনও বিশাল আকাশের গায়ে চাঁদ ভালো করে ওঠেনি। তবে অস্পষ্ট ফ্যাঁকাসে আলোয় সে দেখতে পারে যে, ওটা খুব বেশি দূরে নয়। বুঝতে পারে, পায়ের চাপে সে একটা অশুভ ডিম ভেঙে ফেলেছে। ডিমের চারপাশে কচি পাম গাছের পাতা। এই রাতের বেলা অশুভ ডিম কারও জন্য অমঙ্গলের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। সে ভাবে, সেই অশুভ ডিমটিকে পায়ের চাপে ভেঙে সে নিজের কপালেই অমঙ্গল ডেকে এনেছে।

‘ননসেন্স’—বিরক্তির স্বরে বলেই জুলিয়াস তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। রাতের এই অশুভ শক্তি দূরে কোথাও দেখা দিয়েছে। ক্রমশ ভয়ঙ্কর বাতাসে অশুভ শক্তির হিঁসহিঁস আওয়াজ বাড়তে থাকে। যদিও অশুভ শক্তির অবস্থান অনেক দূরে, কিন্তু জুলিয়াস জানে, এই অশুভ শক্তির জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয়। সুতরাং সে সরাসরি রাস্তার পাশের মিষ্টি আলুর ক্ষেতের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। কদাচিৎ সে একাজ করে। যখনই সে অশুভ শক্তির বজ্রনিনাদ শুনেছে, তখনই তাকে এ ধরনের কাজ করতে হয়েছে। তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। মনে হয়, আওয়াজটা তার দিকেই ধেয়ে আসছে এবং একসময় সে পায়ের শব্দও শুনতে পাচ্ছে। কুড়িজন লোকের একসঙ্গে দৌড়ানোর মত শব্দ অনুরণিত হতে থাকে। মুহূর্তেই যেন শব্দ পাশ কেটে চলে গেল এবং অবশেষে রাস্তার উল্টোদিকে মিলিয়ে যায়।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে জনমানবহীন ফাঁকা বাজারের দিকে তাকিয়ে পুনরায় সমস্ত রাত কাটিয়ে দেয় জুলিয়াস। মাত্র এক সপ্তাহ আগে ঘটনা ঘটেছে। অথচ মনে হয় এই অল্প সময়কে কেউ যেন বর্তমানের একরাশ নিঃসঙ্গতার কালো চাদরে ঢেকে দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নিঃসঙ্গতা আরও গভীর ও দীর্ঘ হতে থাকে। একদিকে জুলিয়াস দাঁড়িয়ে আছে এবং অন্যদিকে জ্যানেট ও তার মার অসার দেহ পড়ে আছে, যাদেরকে জলবসন্ত এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

পাদটীকা

**ইবো: দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ার আদিবাসী। এরা আফ্রিকার সবচেয়ে বড় নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়। গ্রামাঞ্চলে এরা সাধারণত কারুশিল্পী, কৃষিজীবী এবং ব্যবসায়ী হয়। ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের সূচনা লগ্ন থেকে এদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। এদের জীবনকাহিনী নিয়ে চিনুয়া আচেবে তার বিখ্যাত উপন্যাস 'থিংস্ক ফল এপার্ট' রচনা করেন, যা আফ্রিকার কথাসাহিত্যের এক অমূল্য সাহিত্য কর্ম হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত এবং সমাদৃত।

**উমুরু: দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ার একটি শহর।

**নোকো দিবস: দেবদেবীর নামানুসারে ইবো আদিবাসীদের চারদিনের সাপ্তাহিক বাজারের একদিন। ইবো সম্প্রদায়ের কাছে এইদিন অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। কেননা তারা বিশ্বাস করে, এই দিনে ঈশ্বর তার দৈবানুগ্রহ বর্ষণ করে।

**ইগারা: আফ্রিকার আদিবাসী সম্প্রদায়।

**আকারা: আফ্রিকা এবং ব্রাজিলের একধরনের খাবার, যা পাম তেলে ভাজা খোসা ছাড়ানো কালো মটরশুটি দিয়ে তৈরি করা হয়।

**মাই-মাই: মটরশুটি দিয়ে তৈরি একধরনের কেক।

**ম্যামী-ওয়োটা: পশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকার একধরনের জলজ ঐশ্বরিক শক্তি বা জলপরী, যা ক্যারাবীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত এই শক্তি নারীর রূপ ধারণ করে। এই জলপরী আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার শিল্প-সাহিত্য, কবিতা ও সঙ্গীতে এক বিশেষ ভূমিকা দখল করে আছে।

**কিটিকপা: দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ার আদিবাসী ভাষায় জলবসন্ত।

**জেহোবাহ্: হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত ইজরাইলী ঈশ্বরের প্রকৃত নাম।

**একওয়ে: ইবো আদিবাসীদের তৈরি ড্রাম জাতীয় একধরনের কাঠের বাদ্যযন্ত্র।

লেখক পরিচিতি: পশ্চিম আফ্রিকার কথাসাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে কয়জন সাহিত্যিকের উল্লেখযোগ্য এবং বিশেষ অবদান রয়েছে, তাদের মধ্যে নাইজেরিয়ার এই বিখ্যাত লেখক চিনুয়া আচেবে অন্যতম। পুরো নাম অ্যালবার্ট চিনুয়ালুমোগু আচেবে। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, কবি, সাহিত্য সমলোচক এবং অধ্যাপক। জন্ম নাইজেরিয়ার শহরে, ১৯৩০ সালের ১৬ নভেম্বর।

বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গণে আলোড়নকারী তার বিখ্যাত উপন্যাস 'থিংস ফল এপার্ট' ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'নো লঙ্গার অ্যাট ইজ' (১৯৫৮), 'অ্যারো অফ গড' (১৯৬৪), ' এ ম্যান অফ পিপল' (১৯৬৬), 'সিভিল পিস' (১৯৭১) 'অ্যান্টহিলস্ অফ দ্য সাভানা' (১৯৮৭), 'এনাদার আফ্রিকা' (১৯৯৮) এবং 'হোম অ্যান্ড এক্সাইল' (২০০০) তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

একাধিক বিখ্যাত ছোটগল্পের রচয়িতা এই লেখক ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'বিওয়ার, সৌল ব্রাদার অ্যান্ড আদার পোয়েমস্' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'কমনওয়েলথ্ পোয়েট্রি প্রাইজ' লাভ করেন। কথাসাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০০৭ সালে অর্জন করেন 'ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল' পুরস্কার। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তার সাহিত্যকর্ম অনূদিত হয়েছে । তবে দেশ-কালের নির্মোহ উপস্থাপনার কারণে মাঝে মাঝে তাকে বিরুপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি দেশীয় বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের সাহিত্যকর্মকে বিক্রয়যোগ্য করতে চেয়েছেন। ২০১৩ সালের ২১ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

গল্পসূত্র: 'অতিপ্রাকৃত' গল্পটি চিনুয়া আচেবের ইংরেজিতে 'দ্য স্যাক্রিফিসিয়্যাল এগ' গল্পের অনুবাদ। গল্পটি ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত লেখকের 'গার্লস্ অ্যাট ওয়্যার অ্যান্ড আদার স্টোরিজ' গল্পসংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এই গল্পটি জেমস ডেলি সম্পাদিত 'দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রেটেস্ট শর্ট স্টোরিজ' গল্পসংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রুফাস ওকিকি ওরফে রুফ দারুণ জনপ্রিয় এক যুবক। গ্রামের লোকেরা তার জনপ্রিয়তার কারণ বিস্তারিত বলে না। তবে বোঝা যায়, এই জনপ্রিয়তা আসলে তার প্রতি গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। কারণ আজকালকার দিনের আর পাঁচটা যুবকের মত যেন-তেন একটা চাকরির লোভে গ্রাম ছেড়ে সে শহরে যায়নি। তাছাড়া রুফ গ্রাম্য বেয়াদব নয়—আদব-কায়দা জানে। হারকোর্ট বন্দরে এক সাইকেল মিস্ত্রির দোকানে সে দুই বছর কাজ করেছে। সেখানে থেকে গেলে তার ভবিশ্যত আরও উজ্জ্বল হতে পারত। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে পেছনে ফেলে রুফ তার গ্রামের প্রিয় মানুষগুলোর কাছে ফিরে এসেছে, তাদের দুর্দিনে পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে। অবশ্য মোফিয়া গ্রামে রুফের মত যুবকের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা খুব একটা নেই। কারণ মোফিয়ার নেতৃত্ব ইতোমধ্যেই পিপলস এলায়েন্স পার্টি ও এর যোগ্য সন্তান মান্যবর মার্কাস ইবি'র হাতে চলে গেছে। মার্কাস ইবি গ্রামের সর্দার এবং বিদায়ী জাতীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী। বিদায়ী সরকারের ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা এখন অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেছে। পাশাপাশি মান্যবর মন্ত্রী মার্কাস ইবিও যে তার আসনে পুনর্নির্বাচিত হবেন সে বিষয়েও কারও কোনও সন্দেহ নেই। তার প্রতিপক্ষের অবস্থা অনেকটা গোবরে পোকার মত—নিজের চেয়ে কয়েকগুণ বড় গোবরের ঢিবি ঠেলতে ঠেলতে যার নাভিশ্বাস উঠে গেছে। কিছুদিন আগেও যে দলের কোনও নাম-গন্ধ ছিল না তার অবস্থা এমন হাস্যকর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

রুফ মান্যবর মন্ত্রীর নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়েছে। প্রচার-প্রচারণায় সে একজন এক্সপার্ট—হোক সেটা গ্রাম্য নির্বাচন কিংবা স্থানীয় সরকার নির্বাচন কিংবা জাতীয় নির্বাচন। রুফের একটা বড় গুণ, সে খুব

অনায়াসেই পাবলিকের মেজাজ-মর্জি ধরতে পারে। এবার দায়িত্ব নিয়েই মান্যবর মন্ত্রীকে সে জানিয়ে দিয়েছে, গত ইলেকশনের পর থেকেই মোফিয়াবাসীদের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

রাজনীতি যে কতটা দ্রুত সম্পদ, খেতাব আর ডক্টরেট ডিগ্রি এনে দিতে পারে গত পাঁচ বছর ধরে মোফিয়ার জনগণ তা দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও ডক্টরেট ডিগ্রিটা এখনও তারা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের ধারণা, গ্রামে এতদিনে বুঝি একজন ডাক্তার পাওয়া গেল। যাইহোক, এইসব খেতাব আর সুযোগ-সুবিধা এমন এক লোকের কপালে জুটেছে যাকে তারা পাঁচ বছর আগে বিনামূল্যে ভোট দিয়েছিল। তবে এবার তাদের চিন্তাভাবনা একটু ভিন্ন। খুব সম্ভবত তাদের ভোটগুলো এবার আর বিনামূল্যে কারও বাক্সে পড়বে না।

কিছুদিন আগেও মার্কাস ইবি মিশন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি যে খুব সফল ছিলেন তা নয়। গ্রামে হঠাৎ একদিন রাজনীতি ঢুকল আর তিনিও বুদ্ধিমানের মত রাজনীতিতে ঢুকলেন। কেউ কেউ অবশ্য বলে, তার এক নারী সহকর্মী গর্ভবতী হয়ে যাওয়ায় দুদিন বাদে এমনিতেই তার চাকরিটা যেত। আজ তিনি গ্রামের সর্দার। লম্বা লম্বা দুটো গাড়ি, বিশাল একটা বাড়ির মালিক। এত বড় বাড়ি এ অঞ্চলের মানুষ এর আগে কখনও দেখেনি। তবে সত্যি বলতে, এসবের কোনও কিছুই মার্কাস ইবির মগজ ধোলাই করতে পারেনি। তিনি এখনও জনগণের জন্য নিবেদিত। যখনই সময় পান তখনই রাজধানীর বিলাসিতা ছেড়ে গ্রামে ছুঁটে আসেন—যেখানে সাপ্লাইয়ের পানি নেই, ইলেকট্রিসিটিও নেই। অবশ্য কিছুদিন আগে তিনি তার গ্রামের বিশাল বাড়িতে একটা জেনারেটার বসিয়েছেন। মার্কাস ইবি জানেন, তার এই সৌভাগ্যের উৎস কোথায়। তিনি সেইসব পাখিদের মত নন যারা হুট করে উড়ে আসে, গেরস্তের দানাপানি খায়, আবার হুট করে উড়াল দিয়ে চলে যায়। তাই গ্রামের সম্মানে তিনি নতুন বাড়িটার নাম রেখেছেন, ‘মোফিয়া ম্যানসন’। স্বয়ং আর্চবিশপ বাড়িটার উদ্বোধন করে গেছেন। উদ্বোধনের দিন পাঁচটা বড় বড় ষাঁড় আর অসংখ্য খাসি জবাই করে তিনি গ্রামের মানুষকে আপ্যায়িত করেছিলেন।

আদর-আপ্যায়নে খুশি হয়ে সেদিন মার্কাস ইবির প্রশংসায় সবাই ছিল পঞ্চমুখ। এক বৃদ্ধ মন্তব্য করেছিল, ‘আমাদের সন্তান ইবি সত্যিই একজন ভালো মানুষ। তিনি হাম্বলদিস্তা নন যে পেটে কিছু ঢোকা মাত্রই সব পিষে ফেলবেন।’ কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে না হতেই তারাই আবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, ‘আগেরবার আমরা ব্যালটের ক্ষমতা বুঝতে পারি নাই। কিন্তু এইবার আর ভুল করব না।’ তবে মান্যবর সর্দার মার্কাস ইবিও অপ্রস্তুত ছিলেন না। পাঁচ মাসের সরকারি বেতন অগ্রিম তুলে কয়েক শ’ পাউন্ড ভাঙিয়ে তিনি চকচকে শিলিং জোগাড় করেছিলেন। ছোট ছোট পাটের ব্যাগে

শিলিংগুলো ভরে চ্যালাপ্যালাদের নামিয়ে দিয়েছিলেন ভোটের মাঠে। এই কাজে রুফের ওপরই তার ভরসা ছিল সবচেয়ে বেশি।

এক রাতে রুফ ওবিফি জিনুয়া'র বাড়িতে গণ্যমান্য কয়েকজন মুরুব্বির সাথে বৈঠকে বসল। ওবিফি জিনুয়া গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। রুফ বলল, 'এই গ্রাম থেকে আমরা একজন মন্ত্রী পেয়েছি। সে আমাদেরই সন্তান। একটি গ্রামের জন্য এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে। আপনারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন, এত বড় সম্মানের জন্য আমাদের গ্রামকে কেন বেছে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা আমিই বলছি, কারণ পিএপি নেতারা আমাদের এই গ্রামকে খুব পছন্দ করেন। মান্যবর মার্কাসকে আমরা ভোট দেই আর না দেই, পিএপি আবারও ক্ষমতায় আসবে। ভুলে যাবেন না, তারা কথা দিয়েছে, এবার আমাদের গ্রামে সাপ্লাইয়ের পানির ব্যবস্থা হবে।'

রুফ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ বাদে জিনুয়ার ঘরে পাঁচজন বয়স্ক লোক ছিল। একটা ফাটা, কালিপড়া চিমনির হারিকেন ঘরে হলুদ আলো ছড়াচ্ছিল। প্রবীণ লোকগুলো বসে ছিল নিচু টুলে আর তাদের ঠিক সামনে মেঝেতে রাখা ছিল দুটো করে শিলিং। বন্ধ দরজার ওপারে উজ্জ্বল চাঁদটা তাকিয়ে ছিল জিনুয়ার বাড়ির দিকে।

জিনুয়া বললেন, 'তুমি যা যা বললে, আমরা সেগুলোকে সত্য মানি। আমরা সবাই মার্কাসকেই ভোট দেব। মার্কাসকে বলো, সে আমাদের ভোট পেয়ে গেছে আর সাথে আমাদের বিবিদেরটাও। তবে যে কথা না বললেই নয়, দুই শিলিং খুবই লজ্জাজনক।' এই বলে জিনুয়া মেঝেতে রাখা শিলিং-এর কাছে হারিকেনটা এগিয়ে আনলেন। তিনি হয়ত আরেকটু নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে ওখানে আসলে দুই শিলিং-ই রাখা আছে। নিশ্চিত হয়ে তিনি আবারও বললেন, 'হ্যাঁ, দুই শিলিং আসলেই লজ্জাজনক। মার্কাস যদি হতদরিদ্র হতো তাহলে আমরা তাকে গতবারের মত বিনামূল্যেই ভোট দিতাম। কিন্তু সে এখন অনেক বড় হয়েছে, তার চালচলনও বড় মানুষদের মত। আমরা আগে কখনও তার কাছে টাকা-পয়সা চাইনি, ভবিষ্যতেও চাইব না। কিন্তু আজকের দিনটা আমাদের। গাছে উঠে খালি হাতে নেমে আসা বোকামি নয় কি?'

রুফ জিনুয়ার সাথে একমত হলো। কারণ সেও গাছে উঠলে খালি হাতে নামে না। গতকাল সে মার্কাসের দামি একটা আলখাল্লা চেয়ে নিয়েছে। আর গত রোববার মার্কাসের ফ্রিজ থেকে সে যখন পঞ্চমবারের মত বিয়ারের বোতল নিতে যাচ্ছিল তখন মার্কাসের স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠেছিল। তবে মার্কাস সবার সামনেই বউকে ধমক মেরেছিলেন। মার্কাস ইবি যে মহিলাকে বিয়ে করেছেন সে একসময় মিশন স্কুলে তার সহকর্মী ছিল। মূলত এই মহিলার কারণেই চাকরিটা তিনি হারাতে বসেছিলেন। সম্প্রতি রুফ

একটা ভেজাল জমির মামলায় জিতে এসেছে। এর পেছনেও মার্কাসের হাত ছিল। এই কারণেই মুরুব্বিদের কথার অর্থ বুঝতে রুফকে বেগ পেতে হয়নি।

'অল রাইট'—এটুকু ইংরেজিতে বলে রুফ ইবো ভাষায় বলল, 'ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা উচিত না।' টুল থেকে উঠে গায়ের আলখাল্লাটা টেনে-টুনে ঠিক করে চটের ব্যাগে হাত ঢোকাল রুফ। তারপর যাজকের মত ঝুঁকে পড়ে প্রত্যেকের সামনে একটা করে শিলিং রাখল। তারপরও লোকগুলো হতাশায় মাথা ঝাকাল। রুফ আবারও উঠে আরও এক শিলিং করে মেঝেতে রাখল।

কিন্তু এরপরও লোকগুলো সাড়া-শব্দ করল না। এবার রুফ বলল, 'এর চেয়ে বেশি হবে না।' অবশ্য বৃদ্ধ লোকগুলোও জানত মান-সম্মান বাঁচিয়ে কতদূর এগুতে হবে। তাই রুফ যখন বলল, 'যান, ইচ্ছা হলে আমাদের শত্রুকেই ভোট দিন'—তখন তারা সুর নরম করে রুফকে শান্ত করল এবং মেঝে থেকে যার যার শিলিংগুলো তুলে নিল।

শত্রু বলতে রুফ প্রগ্রেসিভ অর্গানাইজেশন পার্টিকেই (পিওপি) বুঝিয়েছে। পিওপি উপকূলবর্তী আদিবাসীদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল। তাদের দাবি, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই তারা এই দল গঠন করেছে। ঘোষণাপত্রে দলের প্রতিষ্ঠাতারা দাবি করেছেন, 'রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নিগ্রহের কবল থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ।' অবশ্য পিএপি'র মত দলের সাথে মাঠের লড়াইয়ে এই দলের যে কোনও খাওয়া নেই তা ছিল দিবালোকের মতই স্পষ্ট। গাড়ি আর মাইক দিয়ে গুটি কয়েক গ্রাম্য টাউট-বাটপারকে মাঠে নামিয়ে দিলেই তো আর ইলেকশনে জেতা যায় না। মাইক বাজিয়ে টাউট-বাটপারদের এরকম চেঁচামেচি আদর্শ বোকামির পর্যায়েই পড়ে। তবে ভোটে জিততে পিওপি কত টাকা নিয়ে মাঠে নেমেছে সে বিষয়ে কারও সঠিক ধারণা ছিল না। যদিও অনেকেই বলে, ওদের বাজেট একেবারে খারাপ না। ভোট শেষে অন্তত টাউট কর্মীগুলো যে বড়লোকের খাতায় নাম লেখাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

গত রাত পর্যন্ত সবকিছু পরিকল্পনা মাফিকই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই পিওপি'র কর্মীবাহিনীর নেতা রুফের সাথে দেখা করতে এলে সবকিছু বদলে যেতে শুরু করে। আগন্তক রুফের পূর্বপরিচিত—বন্ধুর মত। তবে তাদের সাক্ষাৎপর্বটা ছিল নিরুত্তাপ, অনেকটা ব্যবসায়ীদের মত। কেউ কোনও বাড়তি কথা বলেনি। এক পাউন্ডের পাঁচটা নোট রুফের সামনে মেঝেতে রেখে আগন্তুক বলল, 'তোমার ভোটটা আমরা চাই।' কোনও কথা না বলে চেয়ার থেকে উঠে রুফ দরজা বন্ধ করে দিল, তারপর আবারও চেয়ারে এসে বসল। প্রস্তাবটা ভেবে দেখার জন্য এটুকু সময়ই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। কথা বলার সময়

রুফের চোখ মেঝেতে থাকা চকচকে নোটগুলো থেকে একবারের জন্যও সরেনি। তার চোখে বারবার ভেসে উঠছিল নিজের একটি কোকো বাগান আর সেই বাগানে চাষীদের কাজ করার দৃশ্য। বোঝা যাচ্ছিল সে সম্মোহিত হয়ে গেছে।

ফিসফিস করে রুফ বলল, 'তুমি তো জানো আমি মার্কাসের জন্য কাজ করছি। ব্যাপারটা খুব বাজে হবে যদি আমি...'

আগন্তুক বলল, 'বাক্সে যখন ভোটটা ফেলবে তখন তো আর মার্কাস থাকবে না। আমাদের আরও অনেক কাজ আছে। ঝটপট বলে ফেল, এগুলো তুমি রাখবে না নিয়ে যাব?'

রুফ নিশ্চয়তা চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ ঘটনা কি আরও কেউ জানবে?'

আগন্তুকের জবাব ছিল, 'আমরা ভোটের জন্য এসেছি, খোশগল্প করতে আসি নাই।'

'অল রাইট'—রুফ ইংরেজিতে বলল।

রুফের জবাব পেয়ে আগন্তুক তার সঙ্গীকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিল। ইঙ্গিত পেয়ে দ্বিতীয় লোকটি লাল কাপড়ে মোড়ানো একটা মাটির পাত্র রুফের সামনে ধরল। ওটার মধ্যে একটা ইয়ি আছে—জিনিসটা ভীতিকরই বটে। সদ্যজাত মৃত সন্তানের আত্মাকে মোফিয়াবাসীরা ইয়ি বলে। তারা বিশ্বাস করে, আত্মা ধরে রাখলে সেটা আবার তার মায়ের গর্ভে ফেরত আসবে। এ আত্মা পবিত্র। লোকটি লাল কাপড়টা সরিয়ে দিল।

আগন্তুক বলল, 'এটা বান্তার কাছ থেকে এনেছি। তুমি ভালো করেই জানো এর মানে কী। কসম খেয়ে বলো, তুমি মাদুকাকে ভোট দেবে। আর না দিলে এই ইয়ি তোমার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে।'

ইয়িটা দেখামাত্র রুফের বুক ধরফর করে উঠল। কারণ মরা মানুষের আত্মা নিয়ে বান্তার কাজকর্ম সম্পর্কে তার পূর্বধারণা ছিল। তবে রুফ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে জানত। সে ভাবল, গোপনে মাদুকাকে একটা ভোট দিয়ে দিলে মার্কাসের তাতে কী-ই বা আসবে-যাবে? কিচ্ছু না।

'আমি মাদুকাকেই ভোট দেব, না দিলে এই ইয়ি তার সাক্ষী থাকবে।'

‘দ্যাস অল’—ভুল উচ্চারণে কথাটা বলেই আগন্তুক তার সঙ্গীকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আর মাটির পাত্রটাকে আবারও লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল।

লোক দুজন যখন তাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন রুফ দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, ‘মার্কাসের বিরুদ্ধে মাদুকা জয়ী হতে পারবে না।’

ওরা বলল, ‘এবারের ইলেকশনে কিছু ভোট পেলেই তার চলবে। পরেরবার সে আরও বেশি ভোট পাবে। কারণ মানুষ ততদিনে জেনে যাবে মাদুকা পাউন্ড দেয়, শিলিং না।’

নির্বাচনের দিন ভোর বেলা। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এমনই একটা মহৎ দিনে জনতা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। বাড়িঘরের দেয়ালে, গাছের বাকলে আর টেলিগ্রাফের খুটিতে বিবর্ণ-ছিন্নভিন্ন পোস্টার শোভা পাচ্ছে। যে কয়টা এখনও অক্ষত আছে গুটি কয়েক পড়ালেখা জানা মানুষের জন্য সেগুলো এখনও প্রার্থীদের বার্তা বহন করে চলছে—পিপলস এলায়েন্স পার্টিকে ভোট দিন! প্রগ্রেসিভ অর্গানাইজেশন পার্টিকে ভোট দিন! পিএপি-কে ভোট দিন! পিওপি-কে ভোট দিন! আর যে পোস্টারগুলো ছেঁড়া ছিল, তা থেকেও মানুষ যতটুকু পারছিল পড়ার চেষ্টা করছিল।

নির্বাচনের দিনেও মান্যবর সর্দার মার্কাস ইবি তার স্বভাবসুলভ ঢঙে সব কাজ করছিলেন। একদিনের জন্য তিনি জনপ্রিয় একটা ব্যান্ড দলকে ভাড়া করেছেন। ভোট কেন্দ্র থেকে যতটা দূরে থাকলে আইন লঙ্ঘিত হবে না, ব্যান্ড দলটি ঠিক ততটাই দূরে থেকে গান-বাজনা চালিয়ে যাচ্ছে। ভোট দেওয়ার আগে গ্রামের অনেকেই ব্যান্ড সঙ্গীতের তালে তালে নেচে-গেয়ে হাতের ব্যালট পেপার উঁচু করে মার্কাসের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছিল। মান্যবর মার্কাস ইবি লম্বা সবুজ গাড়িতে তার ‘সংরক্ষিত’ আসনে বসে হাসিমুখে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছিলেন। একজন মুরুব্বি গোছের লোক তার দিকে এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করে বললেন, কংগ্র্যাচুলেশন!’ আর তার দেখাদেখি বাকিরাও একই কাজ শুরু করে দিল। শত শত লোক একে একে তার সাথে হাত মিলাল আর ইংরেজিতে ‘কংগ্র্যাস’ বলে অগ্রিম অভিনন্দন জানাল। আর ওদিকে রুফ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ভোটারদের বুদ্ধি-পরামর্শ আর মিষ্টি বিতরণ করতে করতে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল।

‘ভুলে যাবেন না...’—গ্রামের একদল অশিক্ষিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে রুফ একথা বলা মাত্রই তারাও সমস্বরে বলে উঠল, ‘আমাদের মার্কা মোটর গাড়ি...। মার্কাস যে গাড়িটাতে বসে আছেন ওটাই আমাদের মার্কা।’

রুফ বলল, ‘মা-জননীরা! শুকরিয়া, শুকরিয়া। ঠিক এই গাড়িটাই। যে বাক্সে এই গাড়ির ছবি দেখবেন সেটাই আপনাদের। মানুষের মাথাওয়ালা বাক্সটার দিকে ভুলেও তাকাবেন না। ওই বাক্সটা মাথাখারাপ লোকদের জন্য।’

মহিলারা রুফের কথা শুনে হাসতে হাসতে ভোট কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেল। রুফ ব্যস্তভঙ্গিতে চট করে একবার মন্ত্রী মহোদয়ের দিকে তাকাল। মান্যবর মন্ত্রী মুচকি হেসে তাকে সাধুবাদ জানালেন।

রুফ আবারও চিৎকার করে বলল, ‘গাড়ি মার্কায় ভোট দিন।’ রুফের গলার সবকটা রগ তখন স্পষ্টতই চোখে পড়ছিল।

রুফ বলল, ‘গাড়ি মার্কায় ভোট দিন। একদিন আপনারাও এই গাড়িতে চড়তে পারবেন।’

রুফের কথা শেষ হতে না হতেই এক মহিলা বলে উঠল, ‘আর যদি তোমরা চড়তে না পার তাহলে তোমাদের ছেলে-পুলেরা চড়বে।’

আর ওদিকে ব্যান্ড দল নতুন একটা গান ধরেছে, ‘যদি চড়তে পার গাড়িতে তবে হাঁটছো কেন মাটিতে...’

মান্যবর সর্দার মার্কাস ইবি দৃশ্যত শান্ত মেজাজেই বসে আছেন। জয়ের ব্যাপারে তার পূর্ণ আত্মবিশ্বাস আছে। তবে তিনি একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। পত্রপত্রিকাগুলো তার ‘নিরঙ্কুশ’ বিজয়ের আভাস দিলেও একটি ভোটও যাতে হাতছাড়া না হয় সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। একারণেই ভোটারদের প্রথম দলটা ভোট দিয়ে কেন্দ্র থেকে বের হয়ে আসার পর তিনি তার কর্মীদের একে একে নিজের ভোটটা দিয়ে আসার হুকুম দিলেন।

মার্কাস বললেন, ‘রুফ, তুমিই আগে যাও।’

রুফের চঞ্চলতা দপ করে থেমে গেল, বুক ধরফর করে উঠল। সে অবশ্য কাউকে বুঝতে দিল না। সকাল থেকেই ভেতরের কাপুনিটা সে আড়াল করে রেখেছে। এমন চালাকি এর আগে কখনও তাকে করতে হয়নি। মন্ত্রীর হুকুম পেয়ে রুফ তার স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা দেখিয়ে ভোট কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেল। কেন্দ্রে ঢোকার আগে একজন পুলিশ তার দেহ তল্লাশি করল। ভেতরে যাওয়ার পর পোলিং অফিসার সামনে থাকা ব্যালটা বাক্স দুটি রুফকে দেখিয়ে দিলেন। রুফের চঞ্চলতা আবারও থেমে গেল। বেলট বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না ভোটটা কাকে দেবে—গাড়ি মার্কায়, না মাথা মার্কায়। পকেট থেকে ব্যালট পেপার বের করে রুফ বেশ কিছুক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে

রইল। মার্কাসের সাথে সে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে—হোক না তা গোপনে! সে সিদ্ধান্ত নিল, পাউন্ডগুলো ফেরত দিয়ে দেবে... পাঁচ পাউন্ড! কম তো নয়। এতগুলো টাকা এখন কি আর ফেরত দেওয়া সম্ভব? তাছাড়া ইয়ি ছুঁয়ে সে কসম খেয়েছে। রুফের চোখে আবারও ভেসে উঠল চকচকে লাল পাউন্ড আর নিজের কোকো বাগানে চাষীদের কাজ করার দৃশ্য।

রুফ শুনতে পেল, পুলিশের লোকটা ফিঁসফিঁস করে পোলিং অফিসারকে বলছে, ‘ও বেটা ওখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কী করছে?’

বিদ্যুতের ঝলকের মত রুফের মগজে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ব্যালট পেপারটা সমান দুই ভাগে ভাঁজ করে সে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর চট করে দুটো বাক্সে দু' টুকরো ব্যালট পেপার ফেলে দিল। বাক্সে ব্যালট পেপার ফেলার আগে সে নিশ্চিত হয়ে নিল সঠিক অংশটা মাদুকার বাক্সে পড়ছে কিনা। তারপর রুফ শব্দ করে বলল, ‘আমি মাদুকাকে ভোট দিলাম।’

পোলিং অফিসার নিয়মমাফিক রুফের হাতে অমোচনীয় কালি লাগিয়ে দিলেন যাতে দ্বিতীয়বার সে আর ভোট দিতে আসতে না পারে। হাতে কালি লাগিয়ে রুফ ঠিক সেভাবেই ভোট কেন্দ্র থেকে বের হয়ে গেল যেভাবে সে ঢুকেছিল—স্বভাবসুলভ চঞ্চল পায়ে।

চিনুয়া আচেবে: আফ্রিকান সাহিত্যের কিংবদন্তী, প্রয়াত ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবের জন্ম ১৯৩০ সালে পূর্ব নাইজেরিয়ায়। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় স্থানীয় একটি পাবলিক স্কুলে এবং তিনি দেশটির ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েটদের একজন। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর আচেবে নাইজেরিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন-এ রেডিও প্রোডিওসার হিসেবে যোগ দেন এবং পরে বহিঃসম্প্রচার বিভাগের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। এ সময়েই তাঁর লেখক জীবনের শুরু।

আচেবের প্রথম উপন্যাস The Things Fall Apart ১৯৫৮ সালে, No Longer at Ease ১৯৬০ সালে, Arrow of God ১৯৬৪ সালে, A Man of the people ১৯৬৬ সালে এবং Anthills of Savannah প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। চিনুয়া আচেবে ছিলেন সাহিত্য ম্যাগাজিন Okike'র সম্পাদক এবং The Heinemann Series on African Literature এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্জন করেন পঁচিশটি সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি। আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের জনক বলে খ্যাত চিনুয়া আচেবে তার The Things Fall Apart উপন্যাস ও সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য ২০০৭ সালে ভূষিত হন Booker International Prize-এ। চিনুয়া আচেবের মৃত্যুবরণ করেন ২০১৩ সালের ২১ মার্চ।

আলৌকিক মুক্তিপণ

তাওফিক আল হাকিম

অনুবাদঃ তাসনীম আলম

অলঙ্করণ: খেয়া মেজবা

প্রাচ্যের এক নিভৃত পল্লীতে বাস করেন পাদ্রী। খুব ভোরে পাখিরা আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠার আগেই তিনি শয্যা ত্যাগ করেন। এ জনপদের অজ্ঞ বাসিন্দাদের মধ্যে তিনিই ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন। লোকেরা তাকে ভীষণ ভক্তি করে। তিনি তাদের কাছে ইশ্বরের প্রতিনিধি। বাড়ির সামনেই তিনি একটি পাম গাছ লাগিয়েছেন। প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগেই গাছটিতে পানি দেয়া তার নিত্যদিনের অভ্যেস। খুবই পরিপুষ্ট আর ঝকঝকে পাম গাছটি। যত্নে ভালোবাসায় দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠছে।

সেদিন গাছে পানি দেয়া শেষ করে কেবল বাড়িতে ঢুকতে যাবেন এমন সময় কয়েকজন লোক খুবই করুণ সুরে তাকে ডাকে। ‘পিতা! আমাদের রক্ষা করুন। আমার বৌ মৃত্যুশয্যায়। শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার আগে সে একবার আপনার দুআ চায়।’

‘কোথায় থাকে তোমার স্ত্রী?’

‘এই তো পাশের এক গ্রামেই আমাদের বাড়ি। আপনার বাহন প্রস্তুত আছে।’—বলেই একটু দুরে দাঁড়ানো দুটো গাধার দিকে ইঙ্গিত করে।

নিশ্চয় যাবো আমি। একটু অপেক্ষা করো ছেলেরা। আমি অন্য পাদ্রীদের একটু বলে আসি আর আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে আনি।'

আমাদের হাতে একদম সময় নেই। একজন বলে অধৈর্য কন্ঠে। মেয়েটি আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা। মৃত্যুর পূর্বে মেয়েটির জন্য একটু দুআ করে দিবেন অনুগ্রহ করে। এক্ষুণি চলুন পিতা। খুব দূরে নয়। সূর্য মাথার উপর ওঠার আগেই আপনি ফিরে আসতে পারবেন।'

ঠিক আছে বাবারা। চলো তবে আর দেরি করবো না। খুব আগ্রহ নিয়েই পাদ্রী একটি গাধার পিঠে উঠে বসেন। অন্যটিতে সেই মেয়েটির স্বামী। দ্রুত বেগে চলে গাধা দুটি। প্রায় চারঘন্টা একটানা চলার পরও গ্রামের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না পাদ্রীর। যতবারই জিজ্ঞেস করেন, লোকটি উত্তর দেয় এই তো সামনে। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর তারা পৌঁছে এক গ্রামে। ঘেউ ঘেউ করে এক কুকুর আর কিছু লোক তাদের অভ্যর্থনা জানায়। পাদ্রীকে তারা নিয়ে যায় গ্রামের বড় এক বাড়িতে। যেখানে একটি মেয়ে খাটে শুয়ে উপর দিকে তাকিয়ে আছে মৃতের মতো।

পাদ্রী মেয়েটিকে ডাকে মৃদুস্বরে। কিন্তু মেয়েটি কোনো জবাব দেয় না। শেষ মুহূর্ত মনে করেই পাদ্রী পাশে বসে তার জন্য প্রার্থনা শুরু করে। একটু পরেই মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোঁপাতে থাকে। হয়তো মেয়েটির আত্মা বেরিয়ে যাচ্ছে— ভাবে পাদ্রী। কিন্তু মেয়েটি এদিক ওদিক তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে, কোথায় আছি আমি?

বিস্মিত পাদ্রী বলে, তুমি তো তোমার বাড়িতেই আছো মা।

এক গ্লাস পানি খাবো।

আনন্দে চিৎকার করে স্বামীটি। পানি আনো কে আছো!

অনেক পানি খায় মেয়েটি। আবার বলে, 'এখানে কোনো খাবার নেই? আমার যে খুব খিদে পেয়েছে।
'

সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে খাওয়াতে। মেয়েটি পেটপুরে খায় মানুষের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে। তারপর সুস্থ মানুষের মতো হেঁটে চলে যায় বাইরে। সবাই হতবাক হয়ে পড়ে। ছুটে এসে পড়ে পাদ্রীর পায়ে। অজস্র চুমুতে ভরে দেয় তার হাত পা।

'প্রভু! আমাদের পবিত্র পুরুষ! কী মহিমা আপনার! মৃত নারীকে জীবিত করে দিলেন। আপনার আগমনে আমাদের গ্রাম পবিত্র হয়ে গেল। জানি না কিভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবো আমরা। কী বিনিময় দিয়ে আপনার ঋণ শোধ করবো।'

‘আমি দুআ ছাড়া কিছুই করিনি। ধন্যবাদ বা পুরস্কার পাবার কোনো অধিকার নেই আমার। এ সবই মহান আল্লাহর মহিমা। তিনিই জীবনমৃত্যুর মালিক।’

‘আপনি যতই বিনয় প্রকাশ করুন না কেন এটা এক অলৌকিক নিদর্শন যা আল্লাহ আপনার হাত দিয়ে দেখিয়েছেন।’—একজন বলে।

‘পিতা! আপনি আমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন এ অনুগ্রহ করে। আমরা কিছুতেই আপনাকে ছাড়বো না। আমাদের সমাজে পবিত্র পুরুষদের সম্মান জানানোর বিশেষ কিছু রীতিনীতি আছে।’ সুস্থ হয়ে যাওয়া মেয়েটির স্বামী বলে।

স্ত্রী মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে তাই সে কিছুতেই তিনদিনের আগে পাদ্রীকে তার বাড়ি থেকে যেতে দিবে না। এটা সর্বনিম্ন সময় পাদ্রীর জোরাজুরিতে, না হলে আরো অনেকদিন সে পাদ্রী রেখে দিত বিশেষ যত্ন-আত্মি করে। সবরকম আরাম আয়েশের সুব্যবস্থা করে পাদ্রীকে একরকম জোর করেই তিনদিন রাখে।

পাদ্রীর ফিরে যাওয়ার দিন লোকটি অনেক কিছু দেয়। রুটি, ফলমূল আর গির্জার জন্য পাঁচ পাউন্ড। কোনোরকমে গাধার পিঠে বসে যেই রওনা দিবে এমন সময় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে এক যুবক। এসেই মাটিতে বসে বিলাপ শুরু করে, পিতা! আমার পিতৃতুল্য চাচা খুব অসুস্থ। আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমাদের গ্রামেও পৌঁছেছে তাই তিনি অস্থির একটিবার আপনাকে দেখতে চান মরবার আগে।

‘কিন্তু বাবা আমি যে বাড়ি যাচ্ছি এখন।’— খুব অসহায় হয়ে পড়েন পাদ্রী। বাড়ি যাওয়া জরুরি আবার ভক্তদের মনে কষ্ট দিতেও তার খারাপ লাগে।

লোকটা গাধার দড়ি টেনে ধরে। ‘সামান্য সময় লাগবে যেতে আসতে। আমি কিছুতেই যেতে দেবো না আপনাকে। চাচাই আমার সব। তার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাই পিতা!’

‘ঠিক আছে চলো। কোথায় থাকে তোমার চাচা?’

‘খুব কাছেই। কয়েক মিনিটের দূরত্ব এখান থেকে।’

না গিয়ে কোনো উপায় ছিল না পাদ্রীর। মিনিট নয় ঘন্টাখানেক পর আরেকটি গ্রামে পৌঁছেন তিনি। এখানেও একটি কক্ষে মৃত্যুপথযাত্রী একটি লোক শুয়ে আছে। আত্মীয় পরিজনরা তাকে ঘিরে বিলাপ করছে। পাদ্রী তার পাশে বসে প্রার্থনা শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুমূর্ষু লোকটি উঠে বসে আর পানীয় খাবার চায়। তারপর সুস্থ হয়ে যায় পুরোপুরি। এবার এ গ্রামের মানুষেরা বিস্ময়ে অভিভূত

হয়ে পাদ্রীকে নিয়ে মেতে উঠে। কিছুতেই তারা পাদ্রীকে তিনদিনের আগে গ্রাম ছেড়ে যেতে দিবে না। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এটা তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। পাদ্রীকে গ্রামের লোকেরা তিনদিন ধরে সম্মান ও শ্রদ্ধায় ভাসিয়ে দেয়।

তিনদিন পর আবারো অনেক মালামাল আর মানুষের ভালোবাসা নিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা করতেই পাশের গ্রামের আরেকটি লোক তার পথ রোধ করে। তাদের গ্রামে একটু পদধুলি না দিয়ে পাদ্রী কিছুতেই যেতে পারেন না। তারা কেন বঞ্চিত হবে তার আশীর্বাদ থেকে। পাদ্রী এবারও অসহায় আত্মসমর্পণ করেন মানুষের ভালোবাসার কাছে। এ গ্রামে এসে পাদ্রী এক পঙ্গু লোককে একটু স্পর্শ করে দিতেই সে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। ছেলে বুড়ো সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠে পাদ্রীর অলৌকিক ক্ষমতা তাদের গ্রামেও ঘটেছে বলে। এ গ্রামেও তিন রাত কাটে পাদ্রীর ভক্তকুলের আদর আপ্যায়নে। অবশেষে তার ফেরার সুযোগ ঘটে। এ গ্রামের লোকেরা আগের গ্রামের লোকদের চেয়ে বেশি উপহার দেয় আর বেশ কিছু টাকাও দেয় গির্জার কল্যাণার্থে। সবমিলিয়ে প্রায় বিশ পাউন্ড পেয়েছেন পাদ্রী যা তার জামার মধ্যে গোপন স্থানে যত্ন করে রেখেছেন। তবু পথে চোর ডাকাতের ভয়। ভক্তদের সে আশঙ্কার কথা বলতেই তারা তাকে এগিয়ে দিতে পিছু পিছু হেঁটে আসে।

'আমরা জান দিয়ে আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো। আমাদের ভালোবাসা আপনাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। আপনজনের কাছে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবো আমরা। আপনার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই আমাদের জীবনে।'

পাদ্রী বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'আপনাদের অনেক কষ্ট দিচ্ছি আমি নিরুপায় হয়েই। পথে ডাকাতের খুব উৎপাত না হলে এ পথটুকু একাই যেতাম।

'এটা কোনো কষ্টই নয় আমাদের জন্য। এ আমাদের কর্তব্য। সত্যিই দিন দুপুরে এ পথে খুন রাহাজানি অপহরণ হর হামেশাই হয়।'

পাদ্রীও তাদের সুরে সুর মেলান। 'প্রশাসনও ব্যর্থ তাদের দমন করতে। আমি অনেকবার অভিযোগ জানিয়েছি কিন্তু পুলিশ তাদের ধরতে পারেনি। এ পথে চলাচল করা যাত্রীরা প্রায়ই অপহৃত হয় আর পরিবারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় করা হয়। একবার এক গাড়িতে যাত্রীদের সাথে পুলিশও ছিল। এক যাত্রী গাড়ি থেকে নামতেই ডাকাতদল তাকে আটক করে। তার চিৎকারে পুলিশ কিছুই করেনি। পুলিশও ভয় পায় এদের ক্ষমতাকে।'

হেসে উঠে লোকগুলো। 'কোনো ভয় নেয় পিতা! যতক্ষণ আমরা আছি কেউ কিছু করতে পারবে না আপনার। খুব নিরাপদেই আপনি বাড়ি ফিরে যাবেন আমাদের সঙ্গে।'

না না। আমি একটুও ভয় পাচ্ছি না তোমরা আছো বলে। যে সম্মান আর ভালোবাসা দিয়েছ আমাকে তার কোনো তুলনা হয় না। তোমাদের শ্রদ্ধাভক্তি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। '

'এভাবে বলবেন না পিতা। আপনি যে কত মূল্যবান আমাদের কাছে তা বোঝাতে পারবো না।' বাকী পথটুকু লোকগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাদ্রীর অলৌকিক ক্ষমতার কথাই আলোচনা করে। একসময় পাদ্রী বলে, 'গত কয়েকদিনে যা ঘটেছে তা আর কখনো আমার জীবনে ঘটেনি। সত্যিই কি আমার অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে মনে করো তোমরা?'

'নিশ্চয় পিতা। কোনো সন্দেহের তো কারণ নেই সবকিছুই ঘটেছে আমাদের চোখের সামনে।'

'আমি তো প্রেরিত পুরুষ নই। কোনো অলৌকিক ক্ষমতাও তো আমার নেই। গত নয়দিনে যা ঘটেছে সব তোমাদের জন্যই ঘটেছে।'

'আমাদের জন্য! কী বলতে চান পিতা!'

তোমরাই সব। সব কিছু ঘটেছে তোমাদের কল্যাণেই।'

আমরাই সব!! লোকগুলো একে অপরের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। ফিসফিস করে কথা বলে নিজেদের মধ্যে। পাদ্রী বলতে থাকেন, 'এটা হলো তোমাদের নিখাদ বিশ্বাসের ফল। বিশ্বাসে মেলায় বস্তু। তোমরা ভাবতেই পারবে না তোমাদের মনে কত বিস্ময়কর শক্তি লুকিয়ে আছে। তোমাদের আন্তরিক বিশ্বাস অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সত্য বিশ্বাস যে কত ক্ষমতা রাখে তোমরা জানো না। অলৌকিকত্ব তো মানুষের মনেই চাপা থাকে। যেমন পাথরের নিচে থাকে পানির উৎস। বিশ্বাসের জোরে সেই অলৌকিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।'

বিশ্বাসের বিস্ময়কর ক্ষমতা নিয়ে বক্তৃতা দিতে পাদ্রী এতটাই আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন যে তার ভক্তরা যে এক এক করে কেটে পড়েছে তিনি বুঝতেই পারেননি। বাড়ির সীমানায় এসে গাধা থামিয়ে যেই ধন্যবাদ জানাতে পিছু ফেরেন দেখেন আশে পাশে কেউ নেই। খুবই অবাক হন পাদ্রী তবু বাড়ি ফিরে এসেছেন বলে খুব স্বস্তি পান। গাধা থেকে নামতে না নামতেই তার পরিজন, অন্যান্য পাদ্রী ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। অশ্রুসিক্ত হয়ে তাকে চুমু খায়। পিতা! পিতা! তারা কথা রেখেছে তবে। ফিরিয়ে দিয়েছে আপনাকে সুস্থ শরীরে। যতটাকা যায় যাক আপনি আমাদের কাছে অমূল্য।

পাদ্রী তো হতবাক। এত কান্নার কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছেন না। আবার টাকা দেয়ার কথা শুনে তো আরো অবাক।

'কিসের টাকা? টাকা দেয়ার কথা আসছে কেন?'

'যে টাকা আমরা আপনার মুক্তিপণ হিসেবে ডাকাতদের দিয়েছি।'

'কোন ডাকাত? কিসের ডাকাত!

'যারা আপনাকে অপহরণ করেছিল। প্রথমে তো তারা এক হাজার পাউন্ড দাবি করলো। তারপর বলে আপনার ওজনে সোনা নিবে। বহু অনুনয় বিনয় করে পাঁচশ পাউন্ডে রাজি হয় তারা। গির্জার ফান্ড থেকে এ টাকা পরিশোধ করেছি আমরা।'

'পাঁ চ শ পাউন্ড!!!!!!!!! চিৎকার করে উঠে পাদ্রী। ওরা বলেছে যে ওরা আমাকে অপহরণ করেছে!!!!

হ্যাঁ। আপনি যাবার তিনদিন পর একদল লোক এসে মুক্তিপণ দাবি করে। তারা জোর দিয়ে বলে টাকা না পেলে তারা হত্যা করবে আপনাকে। আর যদি তাদের দাবি মিটানো হয় তবে সুস্থ শরীরে আপনাকে ফেরৎ দিবে।' পাদ্রীর এক এক করে মনে পড়ে গত নয়দিনের সব ঘটনা।

আপন মনেই বলে, সব মিলে যাচ্ছে এতক্ষণে। ঐ মৃত নারী, অসুস্থ লোক, পঙ্গু লোক সবাই মিলে বোকা বানিয়ে রেখেছিল আমাকে। কত দক্ষ অভিনয় তাদের!

সবাই আবার খুঁটে খুঁটে দেখে পাদ্রীকে। 'বাবা! আপনার সুস্থতা ছাড়া আর কিছু চাই নি আমরা। প্রভুর অশেষ কৃপায় ফিরে পেয়েছি আপনাকে। ওরা আপনাকে কোনো কষ্ট দেয়নি তো? কিভাবে রেখেছিল আপনাকে। কী কী করে নিলো আপনাকে দিয়ে।'

হতভম্ব পাদ্রী জবাব দেয়, 'ওরা আমাকে দিয়ে অলৌকিক কাজ করিয়েছে। আর গির্জার টাকা দিয়ে সে অলৌকিক কাজের মূল্য দিতে হয়েছে।'

লেখক পরিচিতি:

[তাওফিক আল হাকিম আরবী নাট্যসাহিত্যের অগ্রপথিক। ছোটগল্পেও তার সমান দক্ষতা। ১৮৮৯ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। আইন ও সাহিত্য নিয়ে পড়ালেখা করেন কায়রো এবং প্যারিসে। চাকরি জীবনে বিভিন্ন সরকারি পদ অলঙ্কৃত করেন এবং ইউনেস্কোর দুত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার নাটক গল্প থেকে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে। ইউরোপের অনেক ভাষায় তার রচনা অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

অলঙ্করণ: খেয়া মেজবা

একসঙ্গে দলবেঁধে চলা ছেলেবন্ধুদের কোনো দলে যখন একটি মেয়ে এসে জুটে যায় তখন আপনি নিশ্চিত হয়েই বলতে পারেন, ওই দলটি কোনো বিষয়ে আর একমত হতে পারবে না এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের দিকটিই দেখবে। সেবার আমরা ক'জন তরুণ বন্ধু এসে জুটেছিলাম একটি দলে। আমাদের মধ্যে ছিল গভীর সহমর্মিতা, সবসময়ে ছিল মতের মিল, আমরা ছিলাম পরস্পরের প্রতি সম্মত আর সবসময়ে থাকতাম একসঙ্গে। বেশ চলছিল দিনগুলো। তোওরের ছিল গ্যারেজ আর মাংস-ব্যবসায়ী দুই আদর্শ ভাই পিপ্পো মরগান্তির ছিল কসাইখানা, রিনালদোর ছিল বার এবং আমার হরেক কিসিমের কাজ; ওই সময়ে আমি রেজিন ও তার উৎপাদন বিষয়ে কাজ করছিলাম। যদিও সবাই ছিলাম তিরিশের নিচে আমাদের কারুরই ওজন বারো কি তের স্টোনের কম ছিল না। সবাই জানতাম চাকু ও শুকর মাংসের দক্ষ ব্যবহার। দিনের বেলা আমরা কাজ করতাম। কিন্তু সন্ধ্যা সাতটার পর সবাই থাকতাম একসঙ্গে— স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচ দেখতাম অথবা যেতাম কাসতেল্লি রোমানির অভিযানে কিংবা উষ্ণ জলহাওয়ায় অসতিয়া বা ল্যাডিস পোলিতে। আমরা ছিলাম ছ'জন, তবু বলতে হবে আমরা সবাই মিলে ছিলাম একজন। তাই আমাদের একজন খেয়ালি হয়ে পড়লে অন্য পাঁচজনও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে পড়তাম খেয়ালি। অলঙ্কারের ব্যাপারটি তোওরই শুরু করেছিল। এক সন্ধ্যায় সে সোনার বড়সড় আকারের একটা হাতঘড়ি পরে রেস্টুরেন্টে এলো, ঘড়িটাতে বিনুনি করা সোনার বেষ্টনী প্রায় ইঞ্চিখানেক চওড়া। আমরা জিগ্যেস করলাম, সেটা তাকে কে দিয়েছে। 'ইতালীয় ব্যাংকের পরিচালক' তার জবাব। এ কথায় সে বোঝালো, নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে ওটা কিনেছে। তারপর সে হাত থেকে খুলে ঘড়িটা আমাদের দেখালো; অন্য দশটা ঘড়ির মতোই, ডাবল কেস্ড, তবে হাত ফেরতা।

বিনুনি করা শক্ত বেল্টটাসহ যথেষ্ট ভারিক্কী মেজাজের জিনিস। ঘড়িটা আমাদেরকে বেশ নাড়া দিলো। কেউ একজন বললো, 'একটা বিনিয়োগ।' কিন্তু তোওরের উত্তর, 'কী বলতেছো, বিনিয়োগ মানে? পছন্দসই একটা জিনিস পরছি, ব্যাস এই তো?' পরদিন একই রেস্টুরেন্টে বসেছি আমরা, দেখলাম মরগান্তিরও যথারীতি নিজের একটা হাতঘড়ি, বিনুনি করা সোনার চেইনসহ, কিন্তু ততটা ওজনদার নয়। তারপর আদর্শ ভাইয়েরা প্রত্যেকে একটা করে, তোওরেরটা থেকে বড়, বিনুনি করা চেইন খুব বেশি পুরু নয় কিন্তু প্রশস্ত। তারপর রিনালদো এবং আমি। যেহেতু আমরা দুজন তোওরের ঘড়িটা পছন্দ করেছিলাম, আমরা তাকে জিগ্যেস করলাম সে ওটা কোথায় পেয়েছিল এবং একসঙ্গে গেলাম করসোর একটা ভালো দোকানে এবং প্রত্যেকে কিনলাম একটা করে।

মে'র প্রথমদিকে আমরা মাঝেমধ্যেই সন্ধ্যাবেলা মন্তেমারিওতে যেতাম এক কসাইখানায়— ওয়াইন, তাজা মটরশুঁটি আর ভেড়ার দুধে তৈরি পনির খেতে। এক সন্ধ্যার ঘটনা, তোওর মটরশুঁটি খাচ্ছে, তার আঙুলে আমরা দেখলাম একটা আংটি, ভারী এবং হীরে বসানো, খুব বড় আকারের না কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর। 'চমৎকার!' আমরা আশ্চর্য হলাম। 'এটা দ্যাখো...' কিছুটা রূঢ়ভাবেই সে বললো, 'কিন্তু বাঁদরের মতো অনুকরণ করতে যাইও না। আমি এইটা কিনছি কিছুটা আলাদা হইতে।' যাহোক সে ওটা খুলে আমাদের হাতে দিলো এবং আমরা সবাই দেখলাম— আদতেই একটা চমৎকার ডায়মন্ড, স্বচ্ছ আর বেশ মানানসই। কিন্তু তোওরের ছিল অনমনীয় ও বড় আকারের চোয়াল এবং চওড়া তুলতুলে মুখাবয়ব, শুকরছানার মতো দুটো চোখ, একটা নাক, যা দেখে মনে হয় মাখন দিয়ে বানানো আর তার মুখটাকে দেখায় কব্জাভাঙা মানিব্যাগের মতো। তার ছোট এবং মোটা আঙুলে ওই রিং এবং গুঁড়ির মতো কব্জিতে ঘড়িটাসহ তাকে অনেকটাই রমণীদের মতো দেখালো। হীরের আংটি, সে যেমন চেয়েছিল কেউ তার অনুকরণ করলো না। যাহোক, আমরা প্রত্যেকে আমাদের জন্য নিজেদের ধরনে একটা করে আংটি কিনলাম। আদর্শ দু'ভাই কিনলো একই রকম দুটো অঙ্গুরীয়, লালচে সোনার বেষ্টনী কিন্তু তাতে আলাদা পাথর বসানো— একটা সবুজ, আরেকটা নীল; রিনালদো নিজের জন্য কিনলো বেশ প্রাচীনগন্ধী একটা অঙ্গুরি— খোদাই করা ও রেখাঙ্কিত, একটা বাদামি মণি বসানো যাতে নগ্ননারীর একটা আদল খোদাই করা। মরগান্তি, যে সবসময়ে একটা ফোঁড়ন কাটতে ব্যস্ত, সংগ্রহ করলো প্লাটিনামে তৈরি একটা রিং, কালো পাথর বসানো; আমি নিজে খুব প্রথাগত হবার কারণে নিলাম বর্গাকৃতির একটা রিং যাতে চওড়া একটা হলুদ পাথর বসানো, এরকম নেবার উদ্দেশ্যও ছিল, যখন পার্শেল সিল করতাম তখন ওটা ব্যবহার করা যেত। রিং-এর পর এলো সিগারেট কেস। যথারীতি এটাও তোওর-এরই প্রবর্তনা, একটা লম্বা চওড়া কেস দিয়ে শুরু— সোনার অবশ্যই, উপরে খোদাই করা ক্রুশচিহ্ন, একদিন সে ওটা আমাদের নাকের ডগায় খুলে ধরলো। তারপর সবাই তাকে অনুকরণ করেছে, কেউ একই ধরনে, কেউ অন্যভাবে। সিগারেট কেসের পর আমরা সবাই নিজেদের খেয়ালের দিকে ফিরি— কেউ কিনলো পাথর বসানো ব্রেসলেট, হাতের অন্য কব্জিতে পরার জন্য; কেউ চাপ নিয়ন্ত্রিত ঝর্না কলম, কেউ ক্রুসচিহ্ন দেয়া ও ম্যাডোনার নকশা খোদাই করা ছোট্ট চেইন কণ্ঠায় পরার জন্য আর

কেউ কিনলো সিগার-লাইটার। তোওর, সবচেয়ে যে বেশি দাম্ভিক, কিনলো আরও তিনটি রিং; এখন তাকে আগের চেয়ে আরও বেশি রমণীয় দেখালো, বিশেষত যখন সে তার বড়সড় কোমল বাহু এবং অলঙ্কৃত হাতসহ তার জ্যাকেট ও হাফহাতা শার্ট পরে বেরোয়।

সে সময়ে আমরা ছিলাম অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত; এবং জানি না কেন কিন্তু সেটা ছিল সেরকমই একটা সময় যখন কোনো কিছু ভুল পথে এগোয়। খুব বেশি পরিমাণে যদিও নয়, কিছুটা তিক্ত— তিক্ততার চেয়েও বেশি কিছু, কিছু তীক্ষ্ণ প্রক্ষেপ। তারপর এক সন্ধ্যায়, রিনালদো, যে বারের মালিক, রেস্টুরেন্টে এলো একটা মেয়েসহ, তার নতুন ক্যাশিয়ার। তার নাম লূক্রেজিয়া, বিশের মতো বয়স হবে কিন্তু তাকে দেখলে তিরিশ বছর বয়স্কা নারীর মতো মনে হয়। ত্বক দুধের মতো শাদা, কালো চোখ, বড়, দৃঢ় ও অভিব্যক্তিশূন্য, মুখ লাল, কালো চুল। তাকে দেখায় খোদাই করা মূর্তির মতো, সে বেশির ভাগ সময়েই ছিল নিশ্চল এবং প্রায় নির্বাক। রিনালদো আমাদেরকে বিশ্বাস করালো, সে তাকে পেয়েছে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং সে বললো, মেয়েটির সম্পর্কে সে কিছুই জানে না, এমন কি সে কোনো পরিবারভুক্ত কিনা কিংবা কার সঙ্গে বাস করে, এসবের কিছুই তার জানা নেই। ‘সেই ক্যাশটেবিলের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত’, সে যোগ করে, ‘একজন মেয়ে যে আকৃষ্ট করে তার সুন্দর চাউনি দিয়ে এবং তারপর দূরত্ব বজায় রাখে তার আচরণ দিয়ে।’ একজন সাধারণ মেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়, সুন্দর কিন্তু চটপটেদের দিয়েও কাজ হয় না, তারা কেবল ঝামেলা বাঁধায়। লূক্রেজিয়ার উপস্থিতি ওই সন্ধ্যায় আমাদের মধ্যে খুব একটা বিব্রতকর অবস্থার কারণ ঘটালো। জ্যাকেট পরে সারাটা সময় আমরা ঋজু হয়ে বসে থাকলাম কোনো ধরনের চুটকি কিংবা স্থূল কথাবার্তা না বলে। আমরা কথা বললাম খুব সংযত থেকে, খাওয়া সারলাম ভদ্রভাবে, তোওর এমনকি ফল খেতে চাকু আর কাঁটা চামচ ব্যবহারের চেষ্টা করলো, খুব একটা সাফল্য দেখাতে না পারলেও। পরদিন আমরা লূক্রেজিয়াকে কর্তব্যরত দেখতে দৌড়ালাম। সে একটা ছোট টুলে বসে ছিল, তার পশ্চাদ্দেশ, বয়সের তুলনায় যা খুব বেশি চওড়া, উপচে পড়ছে দু'পাশে আর তার তুখোড় বুক চেপে রেখেছে ক্যাশ রেজিস্ট্রারের চাবি। আমরা সেখানে হা-মুখ দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিলাম। সবকিছুর উপর সে চোখ রাখছে শান্তভাবে, মূল্যতালিকা ভাগ করছে কোনো দ্রুততা ছাড়া, বারবার যান্ত্রিক চাবি টিপছে, এমনকি সেদিকে না তাকিয়ে, তার নিশ্চল দৃষ্টি সোজা বার কাউন্টারের দিকে। সে শান্ত, নৈর্ব্যক্তিক স্বরে বারম্যানকে জানাচ্ছে, ‘দুটো কফি... একটা বিটার... একটা লেবুরস... একটা বিয়ার...’। সে কখনো হাসে না, সে কখনো খরিদ্দারের দিকে তাকায় না; এবং কেউ কেউ আছে যারা তার খুব কাছাকাছি হয়, সে তাকাবে এই আশায়। তার পরনে সংযত পোশাক, কিন্তু তা গরীব মেয়েদের মতোই— যেরকম সাধারণ হাতা ছাড়া শাদা পোশাক, কিন্তু তা পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি আর ভালোভাবে ইস্ত্রি করা। সে কোনো অলঙ্কার পরেনি, এমনকি কানের দুলও না, যদিও তার কানের লতি ছিল ছিদ্র করা। আমরা, যা ছিল অবধারিত, বিদ্রূপ করা শুরু করলাম যখন দেখলাম সে কতটা সুন্দর, রিনালদোর সাহসেই, যে তাকে নিয়ে গর্ব করতো। কিন্তু সে প্রথম কিছু রসিকতা সহ্য করার পর বললো, ‘সন্ধ্যায় রেস্টুরেন্টে তো আমাদের দেখা হতেছে তাই না? তাই আপাতত শান্তভাবে ছাড়ুন এখন..., কাজের সময় বিরক্তি

আমি পছন্দ করি না।’ তোওর, তাকে সম্বোধন করেই কথাগুলো বলা কারণ সেই ছিল সবচেয়ে বেশি উঁকিঝুঁকিপ্রবণ আর সে বরাবরই অশোভন আচরণ করে যাচ্ছিল, সে কৃত্রিম বিস্ময়ে বললো, ‘দুঃখিত... আমরা হতদরিদ্রজন, জানি না ঠিক কিভাবে একজন রাজপুত্রীর সঙ্গে বাতচিৎ করতে হয়... আমি দুঃখিত... কোনো আক্রমণের ইচ্ছায় কিছু বলি নাই।’ সে জবাব দেয়, শুষ্কভাবে, ‘আমি কোনো রাজপুত্রী নই, একজন দরিদ্র মেয়ে, বাঁচার জন্য যাকে কাজ করতে হয়, ... আর আমি আক্রান্ত নই... একটা কফি... আর একটা লেবুরস... ’। আমরা অনেকটা মনোযন্ত্রণা নিয়ে ফিরে গেলাম।

সন্ধ্যায় সবার দেখা হলো, যথারীতি রেস্টুরেন্টে। রিনালদো ও লুক্রেজিয়া পৌঁছুলো সবার শেষে; আমরা তখন খাবার দিতে বললাম। যখন আমরা খাবারের অপেক্ষা করছিলাম তখন অল্প সময়ের জন্য বিব্রতকর বোধটা ফিরে এলো; তখন বেয়ারা টমেটো আর লাল মরিচ কেটে বানানো ‘আলা রোমানো ’র একটা বড় ডিশ দিয়ে গেল। আমরা সবাই পরস্পরের দিকে তাকালাম এবং তোওর আমাদের মিলিত অনুভবের প্রকাশ ঘটালো, ‘বলছিলাম কি, যখন খেতে বসি তখন আমি খোলাখুলি হইতেই পছন্দ করি... আমাকে অনুসরণ করো তাহলে তোমরাও ভালো বোধ করবা।’ বলেই সে একটা মুরগির ঠ্যাঙে মনোযোগ দিলো এবং অলঙ্কৃত দু’হাতে তা মুখে তুলে খাওয়া শুরু করলো। এটা ছিল সঙ্কেত; বিব্রতকর কয়েক মুহূর্তের পর আমরাও হাতেই খাওয়া শুরু করলাম— সবাই, কেবল রিনালদো বাদে এবং অবশ্যই লুক্রেজিয়াও, যে বুকের একটা অংশ উঁচিয়ে আস্তে আস্তে কামড়াতে শুরু করলো। সে মুহূর্তগুলোর পর আমরা মুক্ত হলাম এবং খুব সহজভাবে ফিরে গেলাম আমাদের পুরনো যথেচ্ছ পথে। আমরা তখন বকছিলাম খুব যখন খাচ্ছিলাম, খাচ্ছিলাম আর কথা বলছিলাম। মুখভর্তি করে গবগব করে গিললাম গ্লাস ভরতি ওয়াইন, জবুথবু হয়ে ফিরে গেলাম চেয়ারে, বললাম সচরাচর বলা পরিহাসচটুল গল্পগুলো। আসলে এক অবজ্ঞা ভরা বিরোধিতা ছাড়াও স্বাভাবিকের চেয়ে খারাপ ব্যবহার করলাম আমরা; আমার মনে পড়ে না, যেমনটি ওই সন্ধ্যায়, ওরকম আনন্দের সঙ্গে এবং অত বেশি কখনও খেয়েছি কিনা। যখন আমরা খাওয়া শেষ করলাম, তোওর তার ট্রাউজার বাঁধবার বখলস খুলে দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তুললো জমপেশ এক ঢেকুর, যা অবশ্যই সিলিং কাঁপিয়ে দিত কিন্তু আমরা দরজার বাইরে পাতাকুঞ্জে ছাওয়া আচ্ছাদনের নিচে ছিলাম, তাই সেরকম কিছু ঘটলো না। ‘আহ! খুব ভালো বোধ করতেছি এখন!’ সে ঘোষণা করলো। তারপর একটা খিলাল নিয়ে, যা সে সর্বদাই করে, দাঁতের ফাঁকফোকর খোঁচাতে শুরু করলো, সবগুলো, একটার পর একটা, তারপর সবগুলো আবার এবং সবশেষে খিলালটা দাঁতের ফাঁকে রেখে যে গল্পটা সে ছাড়লো সেটা আদতেই অশ্লীল। এতে লুক্রেজিয়া উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, ‘রিনালদো, আমি ক্লান্ত বোধ করতেছি... যদি কিছু মনে না করো, আমাকে কি এখন বাড়ি পৌঁছায়া দিবা?’ আমরা সবাই অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলাম; বড়জোর দুদিন মাত্র গেল সে রিনালদোর ক্যাশিয়ার হয়েছে, এরই মধ্যে চিরপরিচিতার মতো তাকে তার খ্রিস্টীয় নামে সম্বোধন করছে। কাগজে বিজ্ঞাপন, সত্যিই! তারা বাইরে গেল এবং তোওর দ্বিতীয় ঢেকুর তুললো, ‘সময়টা খেয়াল করো... যথেষ্ট খাইছি... তার মেজাজ দেইখছো? কেমন সুড়সুড় করে চইলা

যাইতেছিল পেছন পেছন, কি ভালো মানুষ, কি ভদ্র একেবারে ভেড়ার মতো। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন! আমি বরং বলব বৈবাহিক বিজ্ঞাপন।'

পরের দু'তিনদিন একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটলো; লুক্রেজিয়া নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মতো খাচ্ছে এবং আমরা বাকিরা ভান করার চেষ্টা করছি যে সে সেখানে নেই। কিভাবে করতে হবে সেটা না জেনেই রিনালদো লুক্রেজিয়া এবং আমাদের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি করেছিল। একটা ফন্দি যে ছিল আমরা সেটা বুঝেছিলাম। যেভাবে জল গড়িয়ে যায় গভীরের দিকে, কোনো চিহ্ন না রেখে। কিন্তু মেয়েটি রিনালদোর কাছে চাচ্ছিল যে আমাদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক হোক। অবশেষে, এক সন্ধ্যায় কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই, সম্ভবত তখন খুব গরম পড়েছিল, আমরা জানি উত্তাপ মানুষের স্নায়ুতে প্রভাব ফেলে, রিনালদো খাওয়ার মধ্য পর্যায়ে, আমাদেরকে আক্রমণ করে বসলো। এভাবে, 'তোমাদের সঙ্গে আমার খাইতে আসার এই শেষ।' আমরা সবাই হতভম্ব, তোওর প্রশ্ন করলো, 'ওহ্, সত্যিই তাই নাকি? আমরা কি জিগ্যেস করতে পারি, কেন?' 'কারণ আমি তোমাদের পছন্দ করি না।' তুমি আমাদের পছন্দ করো না? ভালো কথা, আমি নিশ্চিত আমরা সবাই সেকারণে দুঃখিত— আদতেই ভয়ানকভাবে দুঃখিত।' 'তোমরা একপাল শুয়োর। আমি এটা বলি এবং বার বার বলি... তোমাদের সঙ্গে খাইতে আমি অসুস্থ বোধ করতেছি।' এসময়ে ক্রোধে আমাদের সবার মুখ লাল হয়ে গেল এবং কেউ কেউ লাফিয়ে উঠল টেবিল ছেড়ে। তোওর বললো, 'তুমি— তুমিই হতেছ সব থেকে ধাড়ি শুয়োর। কে তোমাকে আমাদের বিচার করার অধিকার দিছে? সবসময় কি আমরা একসঙ্গে ছিলাম না? সব সময়ে কি আমরা একই কাজ করতাম না?' 'তুমি থামো।' রিনালদো তাকে থামিয়ে দিলো, 'তোমার অলঙ্কার সমেত তোমাকে ওইসব মহিলাদের মতো মনে হয়, অবশ্যই বুঝতেছ যে আমি কাদের কথা বলতেছি... আর যা দরকার তা হলো কিছু সুগন্ধী... তুমি কি কখনো কিছু সুগন্ধী মাখার কথা ভাবো নাই?' শেষ এই ঝাপটা ছিল আমাদের সবাইকে লক্ষ করে; এবং এর উৎস কোথায় সেটা বুঝতে পেরেই আমরা লুক্রেজিয়ার দিকে তাকালাম; সে ছলনাপূর্ণভাবে রিনালদোর জামার হাতা ধরে টানছে যাতে সে থামে এবং চলে যায়। এরপর তোওর বললো, 'তুমিও কি পরো নাই অলঙ্কার— ঘড়ি, রিং ব্রেসলেট সবার মতো?' রিনালদো এখন তোওরের উপর চেপেছে, 'কিন্তু আমি জানি, আমি এখন যা করতে যাচ্ছি, সেটা করার সাহস তোমার নেই।' সে চিৎকার করে, 'আমি সব খুলে ফেলতেছি এবং তাকে সব দিয়ে দিতেছি... আসো লুক্রেজিয়া, এসব আমি তোমাকে দিতেছি।' যেমন সে বললো, আঙুল থেকে রিং, কব্জি তেকে হাতঘড়ি, ব্রেসলেট খুলে এবং পকেট থেকে সিগার-কেস বের করে সব ছুঁড়ে দিলো মেয়েটির কোলের উপর। 'এটা করার সাহস তোমাদের কারুরই নেই', সে অবজ্ঞা ভরে বললো। 'জাহান্নামে যাও তুমি'—ক্রোধ প্রকাশ করে তোওর। কিন্তু এখন সে তার আঙুলে পরা রিংগুলোর জন্য লজ্জিত বোধ করছে। 'রিনালদো' লুক্রেজিয়া শান্তভাবে বললো, 'তোমার এসব নিয়া

নেও, চলো আমরা চইলা যাই।’ রিনালদোর দেয়া সবগুলো জিনিস সে একসঙ্গে জড়ো করে তার পকেটে পুরে দেয়। রিনালদো তারপর আমাদের বিরুদ্ধে গিয়ে ক্রোধবশত যথেচ্ছ গালিগালাজ করতে লাগলো, এমন কি লূক্রেজিয়া যখন তাকে টানা-হেঁচড়া করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও ‘শুয়োরের দল, … কিভাবে খাইতে হয় সেটাও জান না তোমরা… শুয়োর।’ ‘নির্বোধ’ তোওর এসময়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে, ‘মূর্খ!… তুমি নিজেই তোমাকে অন্য নির্বোধদের দিয়া চালিত হইতে দিছো, যারা তোমার পাশে এখনো দাঁড়ানো।’ যদি আপনারা দেখতেন তখন রিনালদোকে! সে লাফিয়ে টেবিল পার হয়ে তোওরের শার্টের কলার আঁকড়ে ধরল। টেনে-হিঁচড়ে সরাতে হলো তাকে।

ওই সন্ধ্যায় তারা চলে যাবার পর আমাদের নিশ্বাস ফেলার শব্দটুকুও হতে পারছিল না। ক’মিনিট পর আমরাও চলে গেলাম। পরদিন সন্ধ্যায় আমার আবার দেখা করলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যকার আগের চাঞ্চল্য তখন আর ছিল না। আমরা সেসময়ে লক্ষ করলাম, কিছু অঙ্গুরীয় আমাদের কাছ থেকে উধাও এবং কিছু ঘড়িও। দু’সন্ধ্যা পর তৃতীয় সন্ধ্যায় আমাদের কারুরই আর কোনো অলঙ্কার থাকলো না। সবাই কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেলাম। এক সপ্তাহ পার হলো, একটার পর একটা অজুহাত দেখিয়ে আমরা কেউ কেউ অনুপস্থিত হতে থাকলাম। একসময়ে বিষয়টার ইতি ঘটলো এবং অনেকেই সেটাকে জানে শেষ, আর নয়; কেউই গরম স্যুপ গরম করতে উৎসাহী ছিল না। পরে শুনেছি, রিনালদো লূক্রেজিয়াকে বিয়ে করেছে; কেউ বলেছিল আমাকে, চার্চে লূক্রেজিয়া ম্যাডোনার প্রতিমার থেকেও বেশি পরিমাণে অলঙ্কৃত ছিল। আর তোওর? কিছুক্ষণ আগেও আমি তাকে তার গ্যারেজে দেখেছি। তার হাতের আঙুলে একটা রিং আছে, কিন্তু তা সোনা দিয়ে বানানো না, ডায়মন্ডও বসানো নেই তাতে, ওটা সেরকমই একটা রুপার রিং যা মেকানিকদের পরতে হয়।

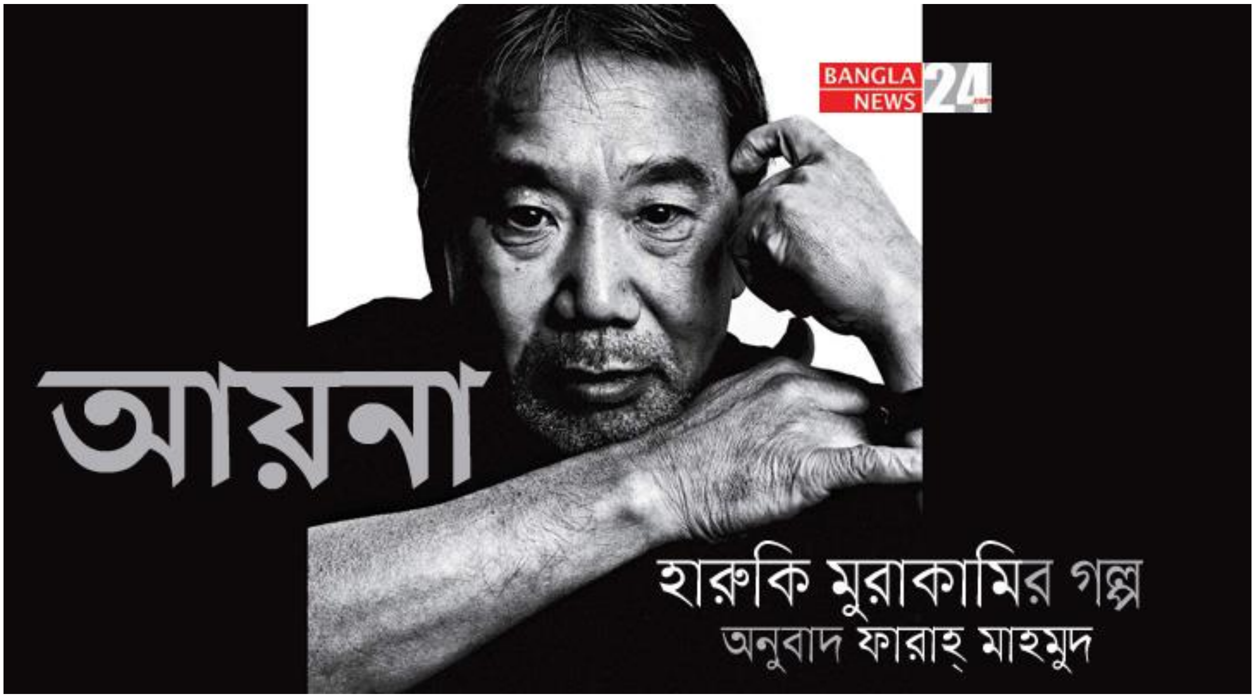

আজ রাতে আপনারা যে গল্পগুলো শুনছেন তার সবগুলোকে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। একটা টাইপে এক দিকে জীবিতদের পৃথিবী আর অন্যদিকের পৃথিবীটা মৃতদের। মাঝে এমন এক শক্তি যারা এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করার ক্ষমতা রাখে। ভূতেরাও এই ক্যাটাগরিতে পড়ে। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে পড়ে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না এমন সব আধিভৌতিক ব্যাপার কিংবা অশুভ কিছুর পূর্বাভাস পাওয়া ও ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারার মতো ক্ষমতা। আজকের সব গল্পই এই দুই ক্যাটাগরির যে কোনো একটায় পড়ে।

সত্যি বলতে, আপনাদের সব অভিজ্ঞতাই হয় প্রথম ক্যাটাগরিতে পড়ে, নয় দ্বিতীয়টায়। আমি বলতে চাইছি—যে সব মানুষেরা ভূত দেখে, তারা কেবল ভূতই দেখে; এর পূর্বাভাস তারা পায় না। আর যারা পূর্বাভাস পায়, তারা ভূত দেখতে পায় না। জানি না কেন এরকম হয়, কিন্তু প্রত্যেকেরই যে কোনো এক ক্যাটাগরির প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে। অন্তত সেরকম ধারণাই আমি পেয়েছি।

অক্টোবরের শুরুর দিকের এক ঝড়ো রাত। আবহাওয়া ছিল ভীষণ গরম ও আর্দ্র। বিকেলের দিকে এক ঝাঁক মশা বেশ জ্বালাতন শুরু করলে ওদের দূর করার জন্যে আমি কয়েকটা মশার কয়েল জ্বালাই। সজোরে বাতাস বইছিল। সুইমিং পুলে যাবার গেটটা ভাঙা হওয়ায় বাতাসের কারণে শব্দ করে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। আমি ওটা ঠিক করার কথা ভেবেছি, কিন্তু বাইরে এত গাঢ় অন্ধকার যে তা অসম্ভব। তাই সারারাত ওটা ওভাবেই শব্দ করে যাচ্ছিল

কিছু মানুষ অবশ্য কোনো ক্যাটাগরিতেই পড়ে না। যেমন ধরুন আমি। আমার এই ত্রিশ বছরের জীবনে আমি কখনোই কোনো ভূত দেখি নাই, কখনো অশুভ কিছু ঘটবে এমন পূর্বাভাস পাই নাই কিংবা ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ কোনো স্বপ্নও দেখি নাই। একবার কয়েকজন বন্ধুর সাথে আমি লিফটে চড়েছিলাম। ওরা শপথ করে বলল আমাদের সাথে এক ভূতও লিফটে চড়েছে কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। ওরা বলছিল ধূসর রঙের পোশাক পরা এক মহিলা ঠিক আমার পাশেই নাকি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমাদের সাথে কোনো মহিলা ছিল না, অন্তত আমার নিজের তাই ধারণা। সেদিন লিফটে শুধু আমরা তিনজন ছিলাম। মজা করছি না। ইচ্ছে করে আমাকে নিয়ে এরকম মজা করবে—আমার দুই বন্ধুও ঠিক এরকম না। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন অদ্ভুত। এতকিছুর পরও আমার কখনোই ভূত দেখা হয় নি।

তবে, একদিনের একটা ঘটনা—শুধু একবারই ঘটেছিল—অভিজ্ঞতাটা এমন যে প্রচণ্ড ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছিলাম। ব্যাপারটা ঘটেছে দশ বছরের বেশি হবে। আমি এখনো কাউকে এটা জানাই নি। এই ব্যাপারে কথা বলতেও আমার ভয় লাগে। মনে হয় গল্পটা বলা মাত্র পুরো ঘটনাটা আবার ঘটতে শুরু করবে। আজকে আপনাদের সবার নিজের নিজের ভূতুড়ে অভিজ্ঞতার গল্প শোনার পর, আয়োজক হয়েও একান্তই নিজের একটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা না করে এই অনুষ্ঠানটা ঠিকভাবে শেষ করা যাচ্ছে না। তাই আমি সেইদিনের গল্পটা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

২.

১৯৬০ সালের শেষের দিকে ছাত্রদের আন্দোলন যখন পুরোদমে চলছে, ঠিক তখন আমি হাই স্কুল পাশ করি। প্রথাবিরোধী ও স্বাধীনচেতা হিপি জেনারেশনের অংশ ছিলাম বলে কলেজে যেতে চাইলাম না। এর বদলে শারীরিক পরিশ্রম লাগে এমন সব কাজ করতে করতে আমি পুরো জাপান ঘুরে বেড়ালাম। আমার কাছে ওটাই ছিল বেঁচে থাকার সবচেয়ে ভালো উপায়। ভীষণ আবেগপ্রবণ এক তরুণ—আপনারা হয়তো তখন এমনটাই ভাবতেন আমাকে। যদিও এখন পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয় আমার সেই জীবনটা দারুণ মজায় কেটেছে। সিদ্ধান্তগুলো ঠিক ছিল নাকি ভুল জানি না, যদি আবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকত, আমি নির্দ্বিধায় তাই করতাম।

গোটা দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ানোর দ্বিতীয় বছরে আমি একটা জুনিয়র হাই স্কুলে রাতের প্রহরীর চাকরি পেলাম কয়েক মাসের জন্যে। স্কুলটা ছিল নিগাতা জেলার ছোট্ট এক শহরে। পুরো গ্রীষ্মে অনেক খেটে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে কিছুদিনের জন্যে আমি সহজ কিছু করতে চাইছিলাম। রাতের প্রহরীর কাজ রকেট সায়েন্স গোছের কিছু না। দিনের বেলা আমি কেয়ারটেকারের অফিসে ঘুমাই আর রাতে পুরো স্কুলে দুইবার রাউন্ড দিয়ে দেখি সব ঠিকঠাক আছে কিনা। বাকিটা সময় গানের রুমে রেকর্ড শুনে,

লাইব্রেরিতে বই পড়ে কিংবা জিমে বাস্কেটবল খেলে কাটিয়ে দেই। সারারাত একা একা স্কুলে থাকাটা তেমন খারাপ কিছু না। আমি কি ভয় পেতাম? আসলে, না। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে কোনো কিছুই আপনাকে তেমন ভীত করতে পারে না।

আমার মনে হয় না আপনাদের মধ্যে কেউ কখনো রাতের প্রহরী হিসেবে কাজ করেছেন, তাই আমি আমার ডিউটি কী ছিল তা বুঝিয়ে বলছি। কাজটা হলো প্রতি রাতে আপনাকে দুটা রাউন্ড দিতে হবে—রাত নটায় এবং রাত তিনটায়। এই হলো শিডিউল। স্কুল ভবনটা ছিল আঠারো থেকে বিশটা ক্লাসরুম নিয়ে একেবারে নতুন একটা তিন তলা বিল্ডিং। স্কুলটা খুব বেশি বড় না। ক্লাসরুম ছাড়াও একটা করে মিউজিক রুম, স্কুল কর্তৃপক্ষের অফিসঘর, আর্ট স্টুডিও, স্টাফ অফিস, প্রিন্সিপালের অফিস আছে। সাথে আলাদা করে আছে ক্যাফেটেরিয়া, সুইমিং পুল, জিম আর অডিটোরিয়াম। আমার কাজ ছিল সবগুলোতে একবার করে ঢুঁ মেরে দেখা সব ঠিক আছে নাকি।

রাউন্ড দেয়ার সময় বিশ পয়েন্টের একটা চেকলিস্ট ফলো করতে হতো। চেক করা হয়ে গেলে পয়েন্টগুলোর পাশে একটা করে দাগ দিতে হতো—স্টাফ অফিস, চেক, সাইন্স ল্যাব, চেক...। আমার মনে হয় পায়ে হেঁটে পুরো স্কুল চক্কর না কেটে, কেয়ারটেকারের রুমের বিছানায় যেখানে আমি ঘুমাই সেখানে শুয়ে শুয়ে সবগুলো পয়েন্টের পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে দিলেও কাজটা হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমি এমন হযবরল না। ঘুমিয়ে আছি এমন সময় কেউ যদি চুরি করে ঢোকে, আমাকেই আক্রমণের শিকার হতে হবে।

যাই হোক, প্রতি রাত ন'টায় আর তিনটায় আমি গোটা স্কুল রাউন্ড দিতে বের হতাম বাঁ হাতে ফ্ল্যাশলাইট আর ডান হাতে কাঠের একটা ক্যান্ডো তলোয়ার নিয়ে। হাই স্কুলে থাকতে আমি ক্যান্ডো প্র্যাকটিস করতাম। হঠাৎ আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। এমন যদি হয় যে আক্রমণকারী বেশ আনাড়ি, এমনকি যদি তার কাছে সত্যিকার তলোয়ারও থাকে, তাতেও আমি ভয় পেতাম না। কারণ আমি ছিলাম যুবক। এখন যদি ওরকম কিছু হয়, আমি শুধু প্রাণটা হাতে নিয়ে জোরে এক দৌড় লাগাব।

অক্টোবরের শুরুর দিকের এক ঝড়ো রাত। আবহাওয়া ছিল ভীষণ গরম ও আর্দ্র। বিকেলের দিকে এক ঝাঁক মশা বেশ জ্বালাতন শুরু করলে ওদের দূর করার জন্যে আমি কয়েকটা মশার কয়েল জ্বালাই। সজোরে বাতাস বইছিল। সুইমিং পুলে যাবার গেটটা ভাঙা হওয়ায় বাতাসের কারণে শব্দ করে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। আমি ওটা ঠিক করার কথা ভেবেছি, কিন্তু বাইরে এত গাঢ় অন্ধকার যে তা অসম্ভব। তাই সারারাত ওটা ওভাবেই শব্দ করে যাচ্ছিল।

রাত ন'টার রাউন্ড বেশ ভালোভাবেই শেষ হলো, চেক লিস্টের বিশটা আইটেমেই ঠিকঠাক আছে। সব দরোজা বন্ধ আর সবকিছুই ছিল জায়গা মতো। চোখে পড়ার মতো কিছুই ঘটে নি। আমি কেয়ারটেকারের রুমে ফিরে এলার্ম ঘড়িতে রাত তিনটার সময় সেট করে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ি।

তিনটার এলার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে আমার বেশ অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল। অনুভূতিটা আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না, কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল। বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছিল না—মনে হচ্ছিল কিছু একটা আমাকে বিছানা ছাড়তে বাধা দিচ্ছে। আলসেমি না করে গা ঝাড়া দিয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠা আমার সবসময়ের অভ্যাস, তাই আমি এরকম লাগার কোনো মানে পাচ্ছিলাম না। রাউন্ড দেয়ার জন্যে অনেকটা জোর করেই নিজেকে বিছানা থেকে টেনে তুললাম। পুলের গেটটা আগের মতোই থেমে থেমে শব্দ করছে, তবে আগের চেয়ে কিছুটা ভিন্নভাবে। অদ্ভুত কিছু একটা হচ্ছে—অনিচ্ছা নিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম। নিজের কাজটা ঠিকভাবে করব বলে মন বানিয়ে নিলাম। দায়িত্বে একবার অবহেলা হয়ে গেলে, ওটা বারবার হতেই থাকে। আমি ওই ট্র্যাপে পড়তে চাচ্ছিলাম না। তাই এক হাতে ফ্ল্যাশলাইট আর অন্য হাতে কাঠের তলোয়ার আঁকড়ে ধরে আমি বেরিয়ে পড়ি।

সবমিলিয়ে রাতটা ছিল বেশ অদ্ভুত। রাত বাড়ার সাথে সাথে, বাতাস আরও জোরে বইতে লাগল, সেইসাথে আরও আর্দ্র হতে থাকল। আমার শরীরে অস্বস্তি হতে থাকলে আমি আর মনোযোগ ধরে রাখতে পারি না। প্রথমে জিম, অডিটোরিয়াম ও সুইমিং পুলে রাউন্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল। প্রচণ্ড বাতাসে সুইমিং পুলের গেটটা এক পাগল মানুষের মতো সমানে তার মাথা ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে। এটা কোনো নিয়ম মেনে হচ্ছে না। প্রথমে কয়েকবার মাথা ঝাঁকানো—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তারপর না, না, না ভঙ্গিতে। তুলনাটা বেশ আজব শোনালেও তখন এরকমই লাগছিল।

স্কুল বিল্ডিংয়ের ভেতরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আমি চারিদিকে তাকিয়ে লিস্টের পয়েন্টগুলো একবার চেক করলাম। আমার সেই অদ্ভুত অনুভূতিটাকে গোনায় না ধরলে, অন্যদিনের চেয়ে আলাদা আর কিছুই ঘটে নাই। আশ্বস্ত হয়ে আমি কেয়ারটেকারের রুমের দিকে এগুলাম। বিল্ডিংয়ের পুব দিকে ক্যাফেটেরিয়ার ঠিক পাশে বয়লার রুমটা আমার চেক লিস্টের একেবারে লাস্ট পয়েন্ট। বয়লার রুমটা আবার কেয়ারটেকারের রুমের একেবারে উল্টা দিকে। তার মানে ফিরে আসার সময় আমাকে দোতলার লম্বা হলওয়ে ঘুরে আসতে হবে। জায়গাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। যেসব রাতে আকাশ জুড়ে চাঁদ থাকে, হলওয়েতেও ছায়া ছায়া আলো থাকে। কিন্তু যখন চাঁদের আলো থাকে না, কিচ্ছু দেখা যায় না। ফ্ল্যাশলাইটের আলো পথে ফেলে দেখে নিতে হচ্ছিল কোথায় যাচ্ছি। সেই রাতে টাইফুন ধেয়ে আসছিল, আর আকাশেও কোনো চাঁদ ছিল না। মাঝে মাঝে মেঘগুলো একটু দূরে সরে ঠিকই, কিন্তু পুরো সময়ই তা ডুবে ছিল গাঢ় অন্ধকারে।

হলওয়ে দিয়ে অন্য সময়ের চেয়ে দ্রুত হেঁটে যাওয়ার সময় আমার বাস্কেটবল খেলার জুতো জোড়ার রাবারের সোল লিনোলিয়ামের মেঝেতে ঘষা খেয়ে জোরে শব্দ করছে। লিনোলিয়ামের মেঝেটা সবুজ রঙের। মসের তৈরি কুয়াশাচ্ছন্ন এক কার্পেটের মতো। চোখ বুজে এখনো আমি সেটার ছবি দেখতে পাই।

হলওয়ের ঠিক মাঝখানে স্কুলের প্রবেশপথের পাশ দিয়ে আসার সময় আমি চমকে উঠলাম—এটা কী! মনে হলো অন্ধকারে ভুলভাল কিছু দেখেছি। আমার সারা শরীর ঘেমে নেয়ে একাকার। কাঠের তলোয়ারটা আরও একটু শক্ত করে চেপে ধরে আমি সেই অস্পষ্ট জিনিসটার দিকে ঘুরলাম। জুতা রাখার আলমারির পাশের দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইটের আলো জ্বলে উঠল।

সেখানে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম! অন্যভাবে বলতে গেলে, একটা আয়না দেখলাম। আর সেই আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব। গত রাতেও এখানে কোনো আয়না ছিল না। হতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষ আজকেই এটা এখানে রেখেছে। আমি তখনো হঠাৎ ভয়ে চমকে আছি। ওটা একটা পূর্ণ দৈর্ঘের লম্বা আয়না। আয়নার মধ্যে ওটা আসলে আমারই প্রতিবিম্ব বুঝতে পেরে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। এত চমকে ওঠার জন্যে নিজেকে আমার বেকুব মনে হচ্ছিল। এই তাহলে ঘটনা—যেন নিজের সাথে কথা বলছি আমি। অনেক বোকামি হয়েছে! ফ্ল্যাশলাইটটা নিচে রেখে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাই আমি। সিগারেটে টান দিতে দিতে আয়নার মাঝে নিজের দিকে তাকালাম। রাস্তা থেকে একটা অস্পষ্ট আলো জানলা দিয়ে এসে আয়নার ওপর পড়ছে। আমার পেছনে সুইমিং পুলের গেটটা এখনো আগের মতোই তালে তালে শব্দ করে যাচ্ছে।

সিগারেটে কয়েক টান দেয়ার পর হঠাৎ অদ্ভুত কিছু একটা খেয়াল করি। আয়নার ভেতরে আমার যে প্রতিবিম্ব সেটা আসলে আমার না। দেখতে পুরোপুরি আমার মতো মনে হলেও ওটা অবশ্যই আমি না। না, এখানেই শেষ নয়। ওটা আমি, তবে অন্য এক আমি। অন্য এক আমি যার কখনোই থাকার কথা না। আমি জানি না এটা কিভাবে বোঝাব। সেই অনুভূতিটা বোঝানো অনেক কঠিন।

এটুকু আমি বুঝতে পারলাম যে ওই অন্য এক আমি কোনো এক বিচিত্র কারণে আমাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। গভীর অন্ধকার সাগরে ভাসমান বিশাল এক বরফ খণ্ডের মতো তীব্র ঘৃণা ওর ভেতরে। এত তীব্র সেই ঘৃণা যে কেউ চাইলেও তা দূর করতে পারবে না।

আমি সেখানে কিচ্ছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম বেআক্কেল হয়ে। আঙুলের মাঝখান থেকে পিছলে মেঝেতে পড়ে গেল আমার সিগারেট। সেই সাথে পড়ে গেল আয়নার ভেতরের সিগারেটটাও। একে অপরের দিকে তাকিয়ে আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নড়তে পারছিলাম না যেন জাদুটোনা করে আটকে দেয়া হয়েছে আমার হাত-পা।

শেষ পর্যন্ত তার হাত নড়ল, ডান হাতের আঙুলের ডগা তার চিবুক ছুঁয়ে ছোট্ট এক পোকার মতো খুব ধীরে তার মুখে উঠে যাচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমিও তাই করছি। মনে হচ্ছিল আয়নার ভেতরের মানুষটার প্রতিবিম্ব আমি আর সে আমার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছে।

শরীরের শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করে ভীষণ জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠতেই, জাদুটোনা থেকে মুক্ত হলাম আমি। ক্যান্ডো তলোয়ারটা তুলে সর্বশক্তি দিয়ে আয়নার ওপর সজোরে আঘাত করে আমার রুমের দিকে দৌড় দিলাম। কাচ ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পেলেও ঘুরে তাকাই নি। রুমে পৌঁছে তাড়াতাড়ি দরোজা আটকে কাঁথার নিচে ঢুকি। মেঝেতে আধখাওয়া সিগারেটের টুকরা ফেলে আসা নিয়ে আমার বেশ চিন্তা হলেও কিছুতেই ওদিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না আমি। সশব্দে বাতাস বইতে থাকল, আর সুইমিং পুলের গেটটাও ভোর পর্যন্ত তার সাথে পাল্লা দিয়ে গেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, না, না, না...

আমার ধারণা গল্পের শেষটা কী হবে সেটা আপনারা সবাই এরই মধ্যে বুঝে গেছেন। আসলে সেখানে কোনো আয়নাই ছিল না।

টাইফুনটা চলে যাওয়ার পর সূর্য উঠল। বাতাসের বেগ কমে গেছে, এখন একটা রোদেলা দিন। আমি প্রবেশপথের দিকে গেলাম। আধখাওয়া সিগারেটের টুকরা আর কাঠের তলোয়ারটা যেখানে থাকার সেখানেই পড়ে আছে। কিন্তু আয়না কেন আয়নার একটা ভাঙা টুকরাও নাই। সেখানে কোনো আয়নাই ছিল না।

আমি ভূত দেখি নি। যা দেখেছি সেটা ছিলাম আমি নিজে। সেই রাতে কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম সেটা আমি কখনোই ভুলতে পারব না। সেই রাতের কথা মনে পড়লেই আমার মনে হয়—এই পৃথিবীতে আমাদের কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার বোধয় আমরা নিজেরাই। আপনার কী মনে হয়?

আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন আমার ঘরে এক টুকরা আয়নাও নাই। বিশ্বাস করুন, আয়না ছাড়া শেভ করার অভ্যাস করাটা তেমন সোজা ছিল না।